Family Development Package - Book 4

শরীরের যে বিষয়গুলো না জানলেই নয়

Q&A

আমির জামান
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 4

নারীদের যে বিষয়গুলো না জানলেই নয়

নারী বিষয়ক ২৫০টি প্রশ্ন ও উত্তর

আমির জামান
নাজমা জামান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

What Women Must Know.

সম্পাদনা পরিষদ

✍
ড. কায়সার মামুন
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍
মেরিনা সুলতানা
আরলি চাইল্ডহুড এডুকেটর
ক্যানাডা

✍
আলী আকবর
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
আমেরিকা

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

নারীদের যে বিষয়গুলো না জানলেই নয়

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email: themessagecanada@gmail.com

© Copyright: IFD Trust

1st Edition: January 2009
2nd Edition: December 2011
3rd Edition: January 2013
4th Edition: December 2015

প্রাপ্তিস্থান

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur	Dhaka	NurJahanRoad	Katabon, Dhaka	Chittagong
Dhaka	01712846164	Dhaka	029673237	01613061653
01710219310	01675865180	01917216350	01913510991	
01682711206		01712177474		

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Centre**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-388-4250
647-350-4262	416-671-6382	647-346-4250

Other Countries:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677		

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম। বাস্তবে আমরা দেখি যে, মহিলাদের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে কিন্তু তা সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না অথবা সব প্রশ্নের সঠিক উত্তরও পান না। আমরা নিজেরাও এর ভুক্তভোগী। তাই কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মহিলা বিষয়ক বেশ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর আমরা এই বইয়ে সংকলন করেছি। এই প্রশ্ন-উত্তর পর্বে মক্কা-মদীনার বিখ্যাত স্কলারদের গবেষণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

নারীদের আসল পরিচয় ও সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন তা অধিকাংশ নারীই ভালভাবে জানেন না। আল্লাহ শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে নারীদের যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তা না জানার কারণে নতুন করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে হচ্ছে। নারীদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন হাদীস অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা (অরাজকতা) আমি রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর বিধান হলো যতক্ষণ না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রাদ ১৩ ঃ ১১)*

আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা সবই নারীদের নিরাপত্তা ও তাদের মান সম্মানের হিফাযত করার জন্যই দিয়েছেন। ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীদের প্রকৃত কল্যাণ। একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করছে নারীদের নিরাপত্তা এবং গ্যারান্টি দিয়েছে তাদের মান মর্যাদা রক্ষার। ইনশাআল্লাহ আমরা খুবই গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় পড়বো এবং এক এক করে অনুধাবন করার চেষ্টা করবো।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে তার খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

জাযাকআল্লাহু খাইরন,

আমির জামান ও নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি।

সূরা আত-তাহরীমের ৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁও।"

আমরা আমাদের বইগুলো প্রকাশ করেছি মূলতঃ আমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পারিবারিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের বইগুলো প্রকাশ এবং প্রচারে সহযোগীতার জন্য আমরা আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা তাদের সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে দু'আ করি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের মেধা, শ্রম ও সকল প্রকার সহযোগীতা কবুল করুন এবং দ্বীন ইসলাম বুঝে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অভিমত

আসসালামু আলাইকুম।

গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে ইসলামী পূর্ণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিমরা এখন ধর্ম সম্পর্কে আগের চাইতে অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন। পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলিমদের ভিতরে দুটো দলের সৃষ্টি হয়েছে, এক দল আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরছেন। অন্যদল, যাঁরা আধুনিকতায় প্রথম দল থেকে কোন অংশে কম নন, ইসলামী মূল্যবোধকে জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ২০১৫ সালে ঢাকায় দেখেছি, তথাকথিত আধুনিক পোশাক পরা তরুণীদের সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি হিজাবধারী বোনদের সংখ্যাও কম নয়।

ইসলামী পূর্ণজাগরণের অন্যতম প্রতীক হলো হিজাব। এটা সলাত বা হাজ্জের মতো একটা প্রকাশ্য ইবাদত। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে সব ধরণের কাজ (যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পাইলট, পুলিশ) হিজাব পরিহীতা নারীরা সাফল্যের সাথে করছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী শেখ লুবনা এর ভালো উদাহরণ, তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সফল অর্থমন্ত্রী।

হিজাব যেহেতু একটি প্রকাশ্য ইবাদত, ফলে এটা পালন করতে গিয়ে বোনদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। একটি মুসলিম প্রধান দেশ তুরস্কের বোনদেরকে হিজাব পরার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেয়া হয় না। ফলে অসংখ্য মুসলিম নারী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অথবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অন্য দেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

অমুসলিম দেশগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট, যা সম্প্রতি চরম আকার ধারণ করেছে। নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকা সফরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে হিজাব পরার অপরাধে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তিনি জানতেন হিজাবের কারণে তাঁকে সমস্যায় পরতে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য দুনিয়াবি বাধা মানতে রাজী না হয়ে তিনি হিজাব পালনে অটল থেকেছেন। আমার চারপাশে মুসলিম নারীদের অপরিসীম তাকওয়া বা আল্লাহভীতির প্রমাণ আমি সবসময় দেখতে পাই। আমেরিকা,

ক্যানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলিম বোনেরা হিজাব পরে আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে ঈমানের যে পরীক্ষা প্রতিদিন দিচ্ছেন, তা আমার মতো অল্প জ্ঞান সম্পন্ন লোকের কাছে দৈহিক জিহাদের মতো মনে হয়। আল্লাহর রাস্তায় মুসলিম বোনদের এই প্রচেষ্টার জন্য তারা আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন।

আল্লাহ বিভিন্ন বিধিবিধান দিয়েছেন যাতে দুনিয়ায় মানুষের জীবন সহজ ও সুন্দর হয়। এটা যখন আমরা বুঝতে পারি তখন খুব ভোরে উঠে ফযরের সলাত আদায় করা বা গ্রীষ্মের দীর্ঘ গরমের দিনে সিয়াম পালন করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। হিজাবও এর ব্যতিক্রম নয়। যখন বোনেরা জানতে পারবেন আল্লাহ কেন হিজাব করতে বলেছেন, এর উদ্দেশ্য কি, তখন তারা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে হিজাব করবেন। এই বইয়ের মাধ্যমে আমার দ্বীনি বোন নাজমা জামান ও দ্বীনি ভাই আমির জামান এই কাজটি করার চেষ্টা করেছেন, আল্লাহ তাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

আমি কোন মাওলানা নই, উপরের কথাগুলো ইসলামের প্রথাগত শিক্ষাবিহীন একজন সাধারণ মুসলিমের ভাবনা, এতে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তবে সেটা আমারই, আমি এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমীন।

ড. কায়সার মামুন
সিংগাপুর

সূচীপত্র

১ ঃ প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব ৯

২ ঃ পর্দার কিছু বাস্তব চিত্র ১৩৬

৩ ঃ নিকাব ও বিশ্লেষণ

নিকাব এবং আমার বিবেক ১৪৭

মুখমণ্ডল খোলা রাখার দলীল ১৪৮

মুখমণ্ডল আবৃত রাখা জরুরী কিনা ১৪৯

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার দলীল ১৪৯

নিকাব নিয়ে কুরআন-হাদীস এর উপর বিশ্লেষণ ১৫২

৪ ঃ নারী অধিকার

ডিকশনারী অনুযায়ী নারীর অধিকার ১৬২

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ১৬২

ক) আত্মিক অধিকার ১৬৪

খ) অর্থনৈতিক অধিকার ১৬৭

গ) সামাজিক অধিকার ১৬৯

ঘ) শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ১৭৩

ঙ) আইনগত অধিকার ১৭৬

চ) রাজনৈতিক অধিকার ১৭৭

নারীর স্বাধীনতা নাকী অসম্মান! ১৭৯

৫ ঃ নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি

মূলনীতি এক ১৮১

মূলনীতি দুই ১৮২

মূলনীতি তিন ১৮৩

মূলনীতি চার ১৮৪

মূলনীতি পাঁচ ১৮৫

মূলনীতি ছয় ১৮৬

৬ ঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ জন নারীর জীবনী

উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) ১৯১

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) ১৯৯

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) ২০৩

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতে উমর (রাদিআল্লাহু আনহা) ২১৮

ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ ﷺ ২২১

প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ ১) পুরুষদের তুলনায় নারীদের জান্নাতে যাওয়া সহজ কেন?

মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ তা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মহিলাদের গ্যারান্টি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের নীচে বর্ণিত শুধু চারটি কাজ করতে হবে। (আবু দাউদ)

ক) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (সময়মত) আদায় করতে হবে।
খ) রমাদান মাসে সিয়াম পালন করতে হবে।
গ) স্বামীর আনুগত্য করতে হবে।
ঘ) পর্দা করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২) ভাইদের তুলনায় নারীগণ পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধেক কেন পায়?

বোনেরা পিতার সম্পদের যে অংশ পায় তা ভাইদের অর্ধেক, কারণ মেয়েদের বিয়ের পর কোন আর্থিক দায়িত্ব নেই, স্ত্রী এই সম্পদ স্বামীর সংসারে খরচ করতে বাধ্য নয়। ফলে, সাধারণভাবে মেয়েদের সম্পত্তির প্রয়োজন কম। তবে কেউ যদি কারো কন্যা সন্তানকে কিছু অতিরিক্ত দিতে চান তবে মোট সম্পত্তির ৩ ভাগের ১ ভাগ দান করতে পারেন। এছাড়া মহিলারা কাজ করে যে সম্পদ অর্জন করেন সেটা তাদের, অন্য কেউ (বাবা, স্বামী, ভাই) তাতে ভাগ বসাতে পারবেন না। কোন মহিলা তার নিজের সম্পদ সংসারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয়, কারণ সংসার চালানোর দায়িত্ব শুধুমাত্র স্বামীর উপর, তবে নিজের ইচ্ছায় করলে সেটা অন্য কথা। পুত্রের অর্ধেক কন্যা সন্তান পাবে এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত, সূরা নিসার ১১ এবং ১৭৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৩) মুসলিম নারীরা কি সৌন্দর্য চর্চা করতে পারে?

ইসলাম এমন একটা দ্বীন বা ধর্ম যা সাজসজ্জা সৌন্দর্য চর্চা শুধু পছন্দই করে না বরং এর তাগিদ দেয়। তবে ভারসাম্যের সাথে সবকিছু করতে হবে। মানুষ অকারণে কদর্য, অসহায়, কুৎসিত-দর্শন আকৃতি ধারণ করবে, ইসলাম এসব পছন্দ করে না। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চা যেন স্বামী ব্যতীত অপরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয়। নারীদের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ইসলাম সৌন্দর্য চর্চার এমন সব জিনিস নারীদের জন্যে জায়িয করেছে, যেসব জিনিস পুরুষদের জন্যে হারাম। যেমন, স্বর্ণ, সিল্ক ইত্যাদি। তবে সেসব সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা হয় না অথবা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে, সেসব বিকৃত সাজসজ্জা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে একই রকম হারাম বা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ ৪) একজন নারীর স্বামী হিসেবে কেমন পাত্র গ্রহণ করা উচিত?

নারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের সূচনা হল স্বামী হিসেবে উপযুক্ত পাত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে বাছাইয়ের জটিল ধাপ বা স্তরটি। যে কেউ তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ করে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেই সে তা গ্রহণ করবে না; বরং রসূল ﷺ গ্রহণযোগ্য স্বামী নির্বাচনের জন্য সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ

"যখন তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার চরিত্র ও দ্বীনদারীতে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে তা পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে।" (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হল তিনটি ঃ ১) দ্বীন; ২) চরিত্র; ৩) জ্ঞান।

যখন এই তিনটি গুণ কোন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে, তখন নারী তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ এর বিপরীত, তারা ধন-সম্পদের আধিক্য, অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অথবা তার বড় চাকরি, অথবা সামাজিক মর্যাদা, অথবা তার চেহারা, অথবা তার যশ-খ্যাতিসহ ইত্যাদি বিষয় আগে বিচার করে। ঐগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু প্রথমে কুরআন-সুন্নাহ বুঝে সঠিকভাবে দ্বীন ইসলাম পালন করাটাকে এক নম্বর

যোগ্যতা বলে গ্রহণ করা জরুরী, অতঃপর আসবে জেনারেল একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন।

ভুল ধারণার অপনোদন ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে জানা এবং পালনকারী মানে বলা হচ্ছে না যে পাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। একজন ডাক্তারও সরাসরি কুরআন-হাদীস পড়াশোনা করে দ্বীন বুঝে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর নির্বুদ্ধিতার কারণে তার স্ত্রী অশান্তি ও দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। আর তার সন্তানগণ হয় অস্থিরতার শিকার। সুতরাং ধার্মিক, চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান পিতা হলেন এমন যিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে প্রতিপালন করবেন ও সুশিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে লালনপালন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন; আর তাদেরকে উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

প্রশ্ন ঃ ৫) আমি চাকরি করি। আমার উর্পাজনের টাকা যদি স্বামীকে না জানিয়ে আমার বাবা-মাকে দিই, তাহলে আমার কি কোনো গুনাহ হবে?

না, কোনো গুনাহ হবে না, তার কারণ এটা আপনার উপার্জন করা টাকা। এই উপার্জন আপনি যথেচ্ছ খরচ করতে পারেন। দান করতে পারেন বা জমা করে রাখতে পারেন। তবে সংসারের প্রয়োজনে স্বামীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করাটা উত্তম এবং উচিত।

প্রশ্ন ঃ ৬) নাবী-রসূলগণ সবাই পুরুষ কেন?

নবুওত একটা পুরুষোচিত সাহস ও শক্তির কাজ এবং কঠিন দায়িত্ব। এটাতে অনেক পরিশ্রম হয়, সংগ্রাম করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়, দেশ ভ্রমণ করতে হয়, অনেক অত্যাচার নির্যাতন ও সইতে হয়। মেয়েদের স্বাভাবিক নরম প্রকৃতির সাথে এটা মেলে না। তাছাড়া প্রতিমাসে কয়েকটা দিন মেয়েদের ইবাদত থেকে দূরে থাকতে হয়, গর্ভবতী হলে, মা হওয়ার পর নারীরা নবুওতের দায়িত্ব, নেতৃত্ব ইত্যাদিতে দিতে পারবে না ফলে নবুওতের কাজে বাধা পড়বে। এজন্য হয়তো আল্লাহ মহিলাদের নাবী করে পাঠান নি। তবে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন ঃ ৭) মেয়েরা কি নিজেদের ছবি ফেইসবুকে আপলোড করতে পারবে?

প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা অবশ্যই ফেইসবুকে তাদের ছবি আপলোড করে দিতে পারবে না। ফেইসবুকে সাধারণত অনেক মেয়েরাই তাদের নানারকম নানা ভঙ্গীর ছবি আপলোড করে দিয়ে থাকে। সবাই সবার ছবি দেখতে পায়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি ঃ আমি আমার ছবি অন্যকে দেখাবো কেন? আমার ছবি দেখে পরপুরুষরা তো খারাপ চিন্তাভাবনা করতে পারে। যেখানে ইসলাম মেয়েদেরকে কোমল স্বরে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছে সেখানে নিজের নানা ভঙ্গীর ছবি তো শেয়ার করার প্রশ্নই উঠে না। এটা গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ঃ ৮) ছেলে ও মেয়েরা কি গার্লফেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক করতে পারে?

গার্লফেন্ড ও বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না। তাই এই বিষয় থেকে দূরে থাকতেই হবে। ছেলে এবং মেয়েদের সবসময় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করতে হবে। ক্লাসেও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। নোট আদান-প্রদানের বিষয়েও কোনভাবেই ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না। 'আর.. ও.. তো.. আমার ভাইয়ের মতো... এরকম মনে করেও ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না। অন্যের বয়ফ্রেন্ড আছে বলে আমারও থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। এই কাজটা অবৈধ এবং গুনাহের কাজ, সেটা সবসময় মনে রাখতে হবে। যারাই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক স্থাপন করেছে তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৯) নারীরা কেন পুরুষদের পিছনে সলাত আদায় করবে?

সলাতে রুকু, সিজদা, তাশাহহুদ ইত্যাদি অনেক কাজ রয়েছে, এই সময়ে মেয়েরা পুরুষদের সামনে বা পাশে থাকলে উভয়েরই সলাতের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হতে পারে, তাই মসজিদে জামাতের সলাতে মহিলাদের পেছনে জায়গা দিয়ে কোন অসম্মান নয়, বরং ভদ্রতা ও রুচিশীলতার পরিচয় ইসলাম দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১০) নারীদের সলাত এবং পুরুষদের সলাতে কোন পার্থক্য আছে?

ইসলামে মহিলা ও পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই। ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা, জলসায় (বৈঠকে) মহিলা ও পুরুষের জন্য একই নিয়ম। বাংলাদেশে

মহিলারা যে নিয়মে রুকু, সিজদা এবং বৈঠক করেন তা রসূল ﷺ -এর দেখানো নিয়ম নয়।

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

যদি আমরা উপরের এই আয়াতটি সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তবে আমাদেরকে নিম্নের হাদীসটি অবশ্যই মানতে হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ। (সহীহ বুখারী)

উপরের এই হাদীসে রসূল ﷺ বলেন নাই যে পুরুষরা আমার মতো করে সলাত আদায় করবে এবং নারীরা আয়িশা (রা.)-র মতো সলাত আদায় করবে। বরং তিনি পুরুষ ও মহিলা সকলকেই বলেছেন তাঁর মতো সলাত আদায় করতে। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল ﷺ -এর একজন স্ত্রী সাওদা (রা.) বলেছেন যে, 'রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতেন আমরাও (অর্থাৎ নারীরাও) ঠিক সেভাবে সলাত আদায় করতাম।'

পুরুষ ও মহিলাদের সলাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। সলাতে নারীরা পুরুষদের অনুগামী। (মির'আত ৩/৫৯, নায়ল ৩/১৯)

মসজিদে নববীতে নারী ও পুরুষ সকলে রসূল ﷺ -এর পিছনে একই নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও জুমু'আ আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মহিলাদের রুকু ঃ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় স্বীয় মেরুদন্ড সোজা করে না, তিনি (রসূলুল্লাহ) ﷺ সেই সলাতকে বাতিল বলে ফায়সালা দিতেন কারণ সেই ব্যক্তি হচ্ছে একজন সলাত চোর। (আহমাদ)

রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির সলাত যথার্থ হবে না যতক্ষণ না সে রুকু ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

মহিলাদের সিজদা ঃ অনেক মহিলা সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবূ দাউদে' বর্ণিত হাদীসটি নিতান্তই 'যঈফ' (দুর্বল)। এর

ফলে সিজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সিজদা হল সলাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সিজদা নষ্ট হলে সলাত বিনষ্ট হবে।

আর মহিলাদের জড়সড় হয়ে সিজদাহ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। (সিলসিলাহ জয়ীফাহ) এ জন্যই ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেছেন, 'সলাতে মহিলা ঐরূপই করবে, যেরূপ পুরুষ করে থাকে।' (সিফাহ স্বালাতিন নাবী সা.)

রসূল ﷺ সিজদার সময় দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌড়ে যেতে পারতো। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

তাই সিজদার সময় বুক হাঁটুর সঙ্গে চেপে রাখা যাবে না। বরং সিজদা লম্বা করে দিতে হবে যাতে পিঠ সোজা হয়ে থাকে এবং পেটের নিচ দিয়ে ছোট ছাগল ছানা পার হয়ে যাওয়ার মতো জায়গা ফাঁকা থাকে।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সিজদা অবস্থায় বাহু দু'টি কুকুরের মত বিছিয়ে রাখবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মহিলাদের বৈঠক/জলসা ঃ উম্মে দারদা (রা.) তাঁর সলাতে পুরুষের মতই বসতেন। তিনি একজন ফীকাহবিদ ছিলেন। (আত-তারীখুস সগীর, সহীহ বুখারী ৯৫ পৃঃ, সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ২/৩৫৫)

প্রশ্ন ঃ ১১) মহিলাদের সলাতে পর্দার নিয়ম কি?

মহিলাদের সলাত আদায় করার সময় হাতের কব্জি থেকে আঙুল এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সবই ঢাকা থাকতে হবে। এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা যাবে না যার ভেতর দিয়ে শরীর দেখা যায়। এমন আঁটসাঁট পোশাকও না পরা যাতে সতরযোগ্য অঙ্গসমূহ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মনে রাখতে হবে যে পা অবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে। সলাতে পা ঢাকার জন্য মোজা পড়া যেতে পারে অথবা একটা লং স্কার্ট বা ম্যাক্সি ব্যবহার করা যেতে পারে যেটা মাটি থেকে আরো এক বা আধা হাত লম্বা হবে। ইউরোপ এবং নর্থ-আমেরিকার অনেক মসজিদেই মহিলাদের সেক্শনে এই ধরনের কাপড়ের ব্যবস্থা থাকে যা সলাতের সময় মহিলারা পরিধেয় কাপড়ের উপর দিয়ে পড়ে নিতে পারেন।

দলিল ১ ঃ আল-কানাবী .... মুহাম্মাদ ইবনে কুনফুয হতে তাঁর মাতার সনদে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে প্রশ্ন করেন যে, নারীরা কী কী কাপড় পরে সলাত আদায় করবে? তিনি বলেন, ওড়না এবং জামা পরে, যদ্দারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

দলিল ২ ঃ মুজাহিদ ইবনে মূসা ... উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন যে, নারীরা পাজামা পরা ছাড়া শুধু ওড়না ও চাদর পরে সলাত আদায় করতে পারে কি? তিনি বলেন ঃ যখন চাদর বা জামা এতটা লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায় – এরূপ কাপড় পরে সলাত আদায় করতে পারবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি ইমাম মালেক আনাস, বকর ইবনে মুদার, হাফস ইবনে গিয়াছ, ইসমাঈল ইবনে জাফর, ইবনে আবূ যের ও ইবনে ইসহাক (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদের সনদে, তিনি তাঁর মায়ের সনদে এবং তিনি উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন (আবূ দাউদ)

দলিল ৩ ঃ রসূল ﷺ বলেন ঃ কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সলাত চাদর ব্যতীত কবুল হয় না। (আবু দাউদ, ইরওয়াউল গালীল হাদীস # ১৯৬)

অতএব সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের পরিহিত সাধারণ পোশাকে যদি পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহলে তার মাথা ঢাকার জন্য এমন একটি চাদর ব্যবহার করতে হবে যাতে তার মাথা এমনভাবে ঢেকে যায় যে কপালের সমস্ত চুল, কান ইত্যাদি আবৃত হয় ও শুধু মুখমন্ডল বের হয়ে থাকে।

দলিল ৪ ঃ আয়িশা (রা.) বলেছেন, রসূল ﷺ ফযরের সলাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর সাথে অনেক মু'মিনা মহিলাকে চাদর দিয়ে গা ঢেকে সলাতের জামা'আতে শরীক হতে দেখেছি। সলাত আদায় শেষে তারা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যেত। তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৩৭২)

প্রশ্ন ঃ ১২) মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে সলাত আদায় না করার বিধান কি?

নারীরা মাসিক সম্পর্কিত মাসলা না জানার কারণে সলাতের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকেন। কেউ যদি শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্ত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ১

রাক'আত আসরের সলাত পায় সে পুরো আসর পেয়ে গেল।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ তাকে বাকি রাক'আতগুলো পড়া অব্যহত রাখতে হবে। তখন সূর্যাস্ত হলেও অসুবিধে নেই। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ১ রাক'আত সলাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তাকে ফযর সলাত আদায় করতে হবে। সলাতের শেষ সময়ে পাক হওয়া সত্ত্বেও গোসল করতে গড়িমসি করায় সলাতের সময় চলে গেলে কবীরা গুনাহ হবে। মাতা-পিতা ও স্বামীর কর্তব্য হলো নারীদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাকিদ দেয়া। নচেৎ তারাও সলাত লঙ্ঘনের কারণে গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৩) পাক হওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিন পর্যন্ত নিফাসের মেয়াদ পূরণ করার বিধান কি?

সন্তান প্রসবের পর যেদিন পাক হবে সেদিন থেকে সলাত ও সিয়াম শুরু করতে হবে। ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। আরো আগে পাক হওয়া সত্ত্বেও সলাত বা সিয়াম পালন না করলে কবীরা গুনাহ হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৪) মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই পর্দার অভ্যাস কীভাবে করানো যায়?

যেসব মেয়েদের এখনও পর্দার বয়স হয়নি তাদেরকেও পর্দা করে চলার অভ্যাস করার জন্য বা পর্দা করতে শিখানোর জন্য ছোট অবস্থা থেকেই পর্দার প্র্যাকটিস করানো উচিত। এতে সে যখন বড় হবে তখন আর পর্দা করতে অসুবিধা হবে না। ছোট মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর সময় সব সময় হিজাব পড়িয়ে স্কুলে পাঠানো উচিত, যখই বাসার বাইরে যাবে তখনই তারা হিজাব ব্যবহার করবে, বাসায় যখন কোন মেহমান আসবে তখনও যেন তারা হিজাব ব্যবহার করে। এভাবেই তারা ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে হিজাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ১৫) ডাক্তারের সঙ্গে কি পর্দা করতে হবে?

বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ যেখানে জীবন যাওয়ার আশংকা রয়েছে সেখানে নারী ডাক্তার পাওয়া না গেলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে কোন অসুবিধা নেই এবং তার নিকট থেকে চিকিৎসা নিতেও কোন অসুবিধা নেই। প্রয়োজনে পুরুষ

ডাক্তার নারী রোগীর অপারেশন করতে পারে, তা যে কোনো অঙ্গেরই হোক না কেন। তবে বর্তমানে একটু খোঁজ করলেই নারীদের জন্য নারী ডাক্তার পাওয়া অসম্ভব নয়। যদি নারী ডাক্তার একান্তই না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পুরুষ ডাক্তার নারী রোগীর দেহের যে কোনো অংশ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১৬) বিদেশে যাওয়ার পথে বা আসার পথে ইমিগ্রেশনে কিভাবে পর্দা রক্ষা করব?

আমরা জানি ২০০১ সনের সেপ্টেম্বর ১১ এর পর থেকে প্রতিটি দেশের এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট সিকিউরিটির ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। তারা অটোস্ক্যানিং এর পাশাপাশি প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে গায়ে হাত দিয়ে অথবা পোর্টেবল স্ক্যানার দিয়ে শরীর চেকআপ করে থাকেন এবং যে সকল মুসলিম নারীরা নিকাব করে থাকেন তাদের নিকাব সরিয়ে পাসপোর্টের ছবির সাথে চেহারা মিলিয়ে দেখেন।

মুসলিম নারী হিসেবে আমাকে যে কোন ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় একটু সচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ যদি দেখি আমার লাইনে পুরুষ অফিসার বডি সার্চ করছেন তাহলে আমাকে ভদ্রভাবে অফিসারকে বলতে হবে যে নারী অফিসার যেন আমার বডি সার্চ করেন এবং নারী অফিসার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। (এই ব্যাপারে আমি যেন কোন সংকোচবোধ না করি। কারণ এটা আমার রিলিজিয়াস রাইট্)। যদি নেহায়াত-ই কোন নারী অফিসার না পাওয়া যায় এবং অপেক্ষা করতে করতে প্লেন ছেড়ে দেয়ার সময় হয়ে যায় তাহলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস্তবতা মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মনের অবস্থা জানেন।

এবার আসি নিকাবের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রেও তাই, যদি সম্ভব হয় তাহলে নারী অফিসারকে নিকাব খুলে আমার চেহারা দেখাবো আর নারী অফিসার যদি না থাকে তাহলে পুরুষ অফিসারকেও দেখাতে পারি। নিকাব না খোলার অযুহাতে ইমিগ্রেশনে কোন প্রকার বিশৃংখলা করা মোটেও উচিত হবে না। মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাকওয়া দেখবেন, আমাদের নিয়্যত দেখবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭) কোন্ ধরনের বেপর্দা আল্লাহ্ মাফ করবেন?

মাথা ঢেকে পথ চলার সময় যদি বাতাসে হঠাৎ মাথার কাপড়টা একটু সরে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে যদি কাপড়টা টেনে আবার মাথাটা ঢেকে দেয়া হয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটু কাপড় সরে যাওয়ার কোনো গুনাহ হবে না। তবে সতর্কতার জন্য বাইরে বের হওয়ার আগে "সেইফটি পিন" বা এজাতীয় কিছু দিয়ে নিজের কাপড় সেঁটে নেয়া উচিত যাতে বাতাসে খুব সহজে সরে না যায়।

প্রশ্ন ঃ ১৮) পুরুষদের কি পর্দা আছে? পুরুষদের পর্দা কেমন হবে?

নারীদের যেমন পর্দা করা ফরয তেমনি পুরুষদেরও পর্দা করা ফরয। তবে পুরুষদের পর্দার নিয়ম নারীদের থেকে আলাদা। পুরুষদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত। তাই বলে তার কাপড় থাকা সত্ত্বেও শুধু সতর ঢেকে শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা রাখাও ঠিক না। যাদের সত্যিই কাপড় নেই তাদের কথা ভিন্ন। নিম্নে পুরুষদের পর্দার কিছু নমুনা দেয়া হলো ঃ

- ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা দিয়ে শরীরের ভিতরের অংশ দেখা যায়।
- ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা শরীর দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু শরীরের গঠন পরিষ্কার ফুটে উঠে।
- ড্রেস এমন প্রসিদ্ধ বা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যা দেখে অন্য মেয়েরা আর্কষণ বোধ করতে পারে।
- দামী ব্র্যান্ডেড ড্রেস পরার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। আবার সামর্থ থাকলে গরিবী হালেও থাকা যাবে না।
- একজন ছেলে অন্য একজন ছেলের সামনে সতর খুলতে বা উলঙ্গ হতে পারবে না।
- একটি ছেলে অন্য একটি ছেলের দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না।
- একজন ছেলে কামুক দৃষ্টিতে অন্য একজন ছেলের পায়ের রানের দিকে তাকাতে পারবে না।
- দু'জন ছেলে এক বিছানাতে ঘুমানো নিষেধ।
- নাভির নিচে প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি পরা যাবে না যদি উপরে কোন জামা না থাকে।
- নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের সামনে খালি গায়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়।

সতর্কতা অবলম্বন ঃ আজকাল অনেকে ফ্যাশনের অংশ হিসেবে খাটো শার্ট বা গেঞ্জি পরে থাকেন। যখন তারা সিজদা বা রুকুতে যান আর শার্ট খাটো হওয়ার কারণে তখন তাদের পিছন দিক থেকে সতর বের হয়ে পড়ে অর্থাৎ পাছার কিছুটা অংশ বের হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে সতর ঢাকা ফরয আর সলাতে তো অবশ্যই ফরয, সতর খুলে সলাত হবে না। তাই এই ব্যাপারে এক ভাই অপর ভাইকে সকলের সামনে লজ্জা না দিয়ে একাকী সতর্ক করে দেয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ ১৯) কত বছর পর্যন্ত শিশুকে বুকের দূধ পান করানো যাবে?

আমাদের দেশের অনেক মায়েরাই জানেন না শিশুকে কত বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন দুই বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ একটি শিশুকে জন্মের পর থেকে দুই বছর বা ২৪ মাস পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে, এরচেয়ে বেশী দিন পান করালে গুনাহগার হতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

"যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৩৩)

প্রশ্ন ঃ ২০) মেয়েদের প্যান্ট, শার্ট বা ফোতুয়া পরে সলাত হবে কি?

সতর্কতা ১ ঃ আজকাল হাইস্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক মেয়েরাই টাইট জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট বা ফোতুয়া পরে এবং পর্দার অংশ হিসেবে মাথায় একটি স্কার্ফ পরে। সর্বপ্রথমে বলতে হবে ইসলামের নিয়ম অনুসারে এই জাতীয় ড্রেসে কোনভাবেই পর্দা হয় না। টাইট প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জি পরে মাথায় শুধু একটি স্কার্ফ বাধলে অবশ্যই পর্দার শর্ত পূরণ হবে না। আরো দুঃখজনক যে এই জাতীয় ড্রেস পরে (শার্ট খাটো হওয়ার কারণে) মেয়েরা যখন রুকু এবং সিজদা দেয় তখন তাদের পিছনের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

সতর্কতা ২ ঃ মহিলারা রফ'উল ইয়াদায়েন করার সময় অর্থাৎ তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতে গিয়ে যেন বুক বা অন্য অঙ্গ দেখা না যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

এবার আসি টাইট ড্রেসে সলাত হবে কিনা? রসূল ﷺ এর নির্দেশের অর্থ হচ্ছে টাইট কাপড়-চোপড় পরে সলাত আদায় হবে না। কারণ সলাতে পর্দা করা ফরয। যদি কারো কাপড় না থাকে তা ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন ঃ ২১) শুধু শাড়ি পরে সলাত হবে কি?

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সলাতে মহিলারা হাতের আঙ্গুল এবং মুখমন্ডল ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশ দেখাতে পারবেন না। তাই শাড়ি পড়লে সতর্ক থাকতে হবে যেন পেট, পিঠ বা কোমর দেখা না যায়, এছাড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকলে চুল যেন বের হয়ে না আসে।

প্রশ্ন ঃ ২২) সালওয়ার-কামিজ পরে সলাত হবে কি ?

সালওয়ার-কামিজ পরে সলাত আদায় হতে পারে তবে ওড়না যথেষ্ট বড় হতে হবে যেন তা দিয়ে মাথা পুরোপুরি ঢাকা যায়, কোনভাবেই যেন চুল বের হয়ে না আসে। তারপর ঐ ওড়না এতোটাই পুরু এবং বড় হতে হবে যে বুকের উপর যথেষ্ট পরিমাণে থাকে যেন কামিজের উপর দিয়ে বুক বোঝা না যায়। মনে রাখতে হবে সালওয়ার পড়লেও পায়ের পাতা ও গোড়ালি যেন দেখা না যায়।

প্রশ্ন ঃ ২৩) মহিলারা কি নিজেরা জামা'আত করে সলাত আদায় করতে পারেন এবং ইমামতি করতে পারেন?

হ্যাঁ, মহিলারা নিজেরা জামা'আত করে সলাত আদায় করতে পারেন এবং ইমামতিও করতে পারেন। তবে মহিলাদের জামা'আতে মহিলারা নিম্নস্বরে আযান ও ইকামাত দিবেন। মহিলা মহিলাদের ইমামতি করলে পুরুষদের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবেন। ফরয ও তারাবীহর জামা'আতে নারীদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলিল রয়েছে। (আবু দাউদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া, নায়ল)

মা আয়িশা (রা.) ও উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখ মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করতেন। (বায়হাকী)

প্রশ্ন ঃ ২৪) মহিলারা কি ঘরে পুরুষদের আগে সলাত আদায় করতে পারে?

হ্যাঁ। অনেক মহিলা আছেন, যারা মসজিদে বা বাড়িতে পুরুষগণের সলাত আদায় না হলে নিজেরা সলাত আদায় করেন না। এটা ভুল। আযান হলে বা সলাতের সময় হলে বা আওয়াল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা পুরুষদের মত মহিলাদেরও কর্তব্য। (মুখালাফাতু ত্বাহারাতি অসসলাহ, আব্দুল আযীয সাদহান ঃ ১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ ২৫) মহিলাদের কি ঈদের সলাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যাওয়া উচিত?

রসূল ﷺ মহিলাদেরকে ঈদের সলাতে নিয়ে যেতে জোড় তাগিদ দিয়েছেন। যদিও তারা ঐ সময়ে পিরিয়ড অবস্থায় থাকে তাও ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তবে অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে যেতে হবে। বেপর্দা হয়ে ঈদের মাঠে গিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা যাবে না। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ২৬) সলাতে মহিলা-পুরুষে ভিন্নতা কোথায়?

প্রামান্য দলিলের ভিত্তিতেই সলাতের কিছু ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের থেকে ভিন্নরূপ আমল করে থাকে। যেমন ঃ

- বেগানা পুরুষ আশেপাশে থাকলে (জেহরী সলাতে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩০৪)
- সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে সলাত আদায় করবে।
- ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মহিলারা পুরুষদের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে তাদের হাতের উপর হাত দিয়ে শব্দ করবে।
- মহিলারা মাথার চুল বেঁধে সলাত আদায় করতে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।
- সলাতের মধ্যে মহিলাদের পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখতে হবে কিন্তু পুরুষদের কাপড় থাকবে টাখনুর উপর পর্যন্ত। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন ঃ ২৭) বিয়েতে কি এনগেজমেন্ট রিং পড়তেই হবে?

ইসলামী শরীয়তে বিয়েতে এনগেজমেন্ট বলতে কিছু নেই এবং কোন রিং আদান-প্রদানেরও কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন ঃ ২৮) ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি বিশেষত সম্পত্তির ক্ষেত্রে?

যেহেতু পুরুষ পরিবারের আর্থিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। একটি উদাহরণ

দেয়া যাক– মনে করি একজন লোক মারা গেলো এবং সে মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার এক ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হলো। যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ইসলামী শরীয়ার মতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ছেলের পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে এখন সংসারের জন্য ব্যয় করতে হবে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ, তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ বা ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু মেয়েটিকে তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য ১ টাকাও খরচ করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৯) নারীর জ্ঞান অর্জন করা ফরয কেন?

জ্ঞান অর্জন করা নরনারী উভয়ের জন্যেই ফরয, যার দ্বারা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, এই জ্ঞান ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আর সেই জ্ঞান হল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ -এর ব্যাপারে জ্ঞান এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত।

ক. ফরযে আইন ঃ এই প্রকারের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরযে আইন তথা আবশ্যকীয় কর্তব্য; আর তা এমন জ্ঞান, যার দ্বারা দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো জানা ও বুঝা যায়; অথবা অন্যভাবে বলা যায়: এটা এমন জ্ঞান, যা ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন ঃ সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত বিধানসমূহ, পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিধানসমূহ, সলাত (নামায) সম্পর্কিত বিধানসমূহ; সুতরাং মুসলিম নারী শিক্ষা লাভ করবে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? কিভাবে সে সলাত (নামায) আদায় করবে? কিভাবে সিয়াম পালন করবে? কিভাবে সে তার স্বামীর হক আদায় করবে? আর কিভাবে সে তার সন্তানদেরকে লালনপালন করবে? এবং এমন প্রত্যেক জ্ঞান, যা তার উপর বাধ্যতামূলক।

খ. ফরযে কিফায়া ঃ আরেক প্রকার জ্ঞান অর্জন করা যা কিছুসংখ্যক মুসলিম ব্যক্তি অর্জন করলে বাকিরা অপরাধমুক্ত হয়ে যায়; মুসলিম নারীর জন্য এই প্রকার জ্ঞান অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেই জ্ঞান অর্জন করে পরিতৃপ্তি লাভ করাটা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। কুরআন ও সুন্নাহ এই জ্ঞান অর্জনের প্রশংসায়, তার ফযিলত বা মর্যাদা বর্ণনায় এবং এ প্রকার জ্ঞান ও জ্ঞানীদের গুরুত্ব বর্ণনায় অনেক বক্তব্য নিয়ে এসেছে। আরও বক্তব্য নিয়ে এসেছে অন্যদের উপর তাদের উচ্চমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়; কারণ, তাঁরা হলেন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উত্তরসূরী।

মুসলিম নারীকে ইসলাম যে সম্মান দান করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ঃ ইসলাম নারীর জন্য শিক্ষাগ্রহণ করা ও শিক্ষা প্রদান করার মর্যাদা পুরুষের মর্যাদার মত করে সমানভাবে নির্ধারণ করেছে এবং নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জন্য কোন বিশেষ মর্যাদা নির্দিষ্ট করেনি। শিক্ষা এবং শিক্ষাগ্রহণের ফযীলত বা মর্যাদা বর্ণনায় বর্ণিত সকল আয়াত ও হাদীস পুরুষ ও নারীকে সমানভাবে মর্যাদাবান বলে অবহিত করে; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালা ঃ ১১)

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?" (সূরা আয-যুমার ঃ ৯)

বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪)

অনুরূপ রসূল ﷺ -এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, এর উসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহ থেকে একটি পথে পরিচালিত করেন। নিশ্চয়ই ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফিরিশতাগণ তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুতরাং একজন আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর আলেমের মর্যাদা তেমনি, যেমন পূর্ণিমার রাতে সকল তারকার উপর চাঁদের মর্যাদা। আর নাবীগণ কোন দিনার এবং দিরহামের উত্তরাধিকারী রেখে যাননি; বরং তাঁরা শুধুমাত্র ইলমকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে পরিপূর্ণ অংশ (উত্তরাধিকার) গ্রহণ করল।" - (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন ঃ ৩০) নির্ভুল জ্ঞানের গুরুত্ব কি?

মানুষ যে সামাজিক পরিবেশে ছোট থেকে বড় হতে থাকে সে পরিবেশ অনুযায়ী তার রুচি ও অভ্যাস গড়ে উঠে। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যখন সে তার আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কার্যকলাপকে বিচার করে তখন কোনটা ভাল, আর কোনটা মন্দ তা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু যে রুচি ও অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছে তা ভাল নয় বলে বুঝলেও তা সংশোধন করা খুব সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা।

কোন মানুষই নিজের অমঙ্গল চায় না। সে যা কিছু করে তা তার মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই করে। তবু কেন সে এত অশান্তি ভোগ করে? এর আসল কারণ হলো মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। সে যেটাকে ভাল মনে করছে আসলেই সেটা হয়তো খারাপ। তাই যত ভাল মনে করেই করুক না কেন এর ফল খারাপ হতে বাধ্য। মানুষ কল্যাণ ও শান্তির যতই কাঙ্গাল হোক সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাব থাকলে সব চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও সে অশান্তিই পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হয়তো তুমি যেটাকে অপছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য ভাল এবং যেটাকে পছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, আর তুমি জান না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

প্রশ্ন ঃ ৩১) আমরা নারীরা নিজেদেরকে কি ঠিক মতো চিনি?

আমরা জানি যে, শিশুদের একটা বয়স এমন থাকে যখন সে নিজের মল-মূত্র বা ছাই-মাটি গায়ে মাখে। এমনকি হাতের কাছে পেলে আগুনেও হাত দেয়। এর কারণ আর কিছুই নয়, সে যে মানুষ সে চেতনা তখনও তার হয়নি। বাঘের বাচ্চা যদি শেয়ালের পরিবেশে থাকে তাহলে বাঘের স্বভাব গড়ে উঠে না- যদিও সে জন্মগতভাবে বাঘই বটে। মুসলিম ঘরে জন্ম হলেও এবং নিজেকে মুসলিম মনে করা সত্ত্বেও অনেকেই মুসলিম চেতনাবোধ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সমাজ-পরিবেশ এমন যে নিজেকে চেনার সুযোগই হয়ত হয় না। আচরণ, অভ্যাস, রুচি হয়ত এমন পরিবেশে গড়ে উঠেছে যেখানে ঐ চেতনা জাগ্রত হতে পারেনি। আমি তো একজন মুসলিম। এবার নিজেকে নিজে কিছু প্রশ্ন করি ঃ

ক) আমার পক্ষে কি এমনভাবে চলা উচিত?
খ) আমার স্বভাব কি এমন হওয়া সংগত?
গ) মুসলিম হিসেবে কি এটা করা আমার সাজে?

আমার বিবেকই আমাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করবে এবং সংশোধন করতে সাহায্য করবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমার বিবেক নিজেকে মুসলিম হিসেবে চিনতে পারবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানই আমাকে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ঃ ৩২) মুসলিম কাকে বলে?

মানব শিশু মানুষই হয়, গরু বা ছাগল হয় না। কিন্তু একজন শিক্ষকের ছেলে কি জন্মগতভাবেই শিক্ষক হতে পারে? শিক্ষকতার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তা অর্জন না করলে শিক্ষক হওয়া যায় না। মুসলিম পরিচয়টাও একটা গুণ। এটা জন্মগত কোন গুণ নয় বরং এটা চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক গুণই অর্জন করতে হয়। নাবীর ঘরে জন্ম নিয়েও নূহ (আলাইহিস সালাম)–এর ছেলে কাফির হয়েছে। কারণ মুসলিম হবার গুণ সে অর্জন করেনি। তাই বুঝতে হবে যে কী কী গুণ থাকলে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়া যায়।

ইসলাম শব্দটি আরবী। আমাদের দেশে মুসলমান শব্দটাই বেশী চালু। এ শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে এসেছে। ইসলাম শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দটি এসেছে। যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকেই মুসলিম বলে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির ইচ্ছা মতো না চলে যে আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারই পরিচয় হলো মুসলিম। এখন চিন্তা করি যে, আমরা যদি মুসলিম হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের কী কী গুণ অর্জন করতে হবে।

প্রথমত ঃ আমাকে জানতে হবে যে, ইসলাম কী ?

দ্বিতীয়ত ঃ আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি ইসলামকে মেনে চলতে প্রস্তুত আছি কিনা।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামকে মেনে চলতে চাইলে সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রসূল ﷺ-এর আদেশ নিষেধ কী তা জানতে হবে এবং তা পালন করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৩) আমরা নারীরা কি এসব করতে বাধ্য?

উপরে যে ৩টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্য করেন না। স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।" (সূরা আল-বালাদ ঃ ১০)*

যদি কেউ ইসলামকে কবুল করতে না চায় তাহলে বুঝা গেল যে, সে নিজেকে মুসলিম বলে গণ্য করতে চায় না এবং সে আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ পালন করতে রাযী নয়। মানুষের এ স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই সে মুসলিম হিসেবে চলার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার পাবে, আর অন্য সিদ্ধান্ত নিলে শাস্তি পাবে। এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেননি।

প্রশ্ন ঃ ৩৪) একজন নারী হিসেবে আমি কী সিদ্ধান্ত নেবো?

গতানুগতিকভাবে আমি নিজেকে যতই মুসলিম বলে মনে করি না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার নিজের। যদি মুসলিম হিসেবেই জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিতে চাই তাহলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। এ মানসিক প্রস্তুতির নামই ঈমান। যখন নিজের মধ্যে ঈমান তৈরি হবে তখন আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা কঠিন মনে হবে না। সুতরাং নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করি যে, এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবো? আমি কি কুরআনের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না? দেখি এ ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন ঃ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? (সূরা আনকাবুত ঃ ২)

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

প্রশ্ন ঃ ৩৫) নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব কি?

ইসলাম শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্যই শিক্ষা প্রয়োজন। দুনিয়ায় যতদিন ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত

ছিলো ততদিন পুরুষ এবং নারী উভয়ই শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

সকল বয়সের মানুষের জন্য একই সিলেবাসভিত্তিক শিক্ষা হতে পারে না। শিশুদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রয়োজন। স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রয়োজন কিশোরীদের শিক্ষার জন্য। তেমনিভাবে যুবতীদের জন্য সিলেবাস হতে হবে ভিন্নতর। উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা সিলেবাস হয়ে থাকে। যিনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন তার সিলেবাস আর যিনি গৃহিণী হবেন তার সিলেবাস হবে ভিন্ন। যিনি আইনবিদ হবেন তার সিলেবাস আর যিনি ডাক্তার হবেন তার সিলেবাস থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ যিনি কর্মজীবনে যেই প্রফেশন গ্রহণ করবেন তিনি সেই প্রফেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নারীদেরকে যেই অংগনে কাজ করার উপযুক্ততা দান করেছেন সেই অংগনের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই তাঁদের জন্য সিলেবাস তৈরী হতে হবে। আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে নারীদের অবশ্যই ইসলামের আদর্শিক জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের জীবনদর্শন ও জীবনবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সেই আলোকে তারা কিভাবে তাদের জীবন গড়ে তুলবেন?

মানবজাতির নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার সুমহান কর্তব্য অর্পিত রয়েছে নারীদের উপর। তারা যাতে এই কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা জরুরী।

নারীদের নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করার কাজ নারীদের দ্বারাই ভালো হওয়ার কথা। নারীরাই পারেন অপরাপর নারীদের সাথে মিশতে, ঘনিষ্ঠ হতে এবং অন্ত রংগ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। নারীগণ অবাধে অপরাপর নারীদের নিকট যেতে পারেন, বসতে পারেন এবং পারেন আলাপ করতে। নারী শ্রোতাগণ একজন নারী আলোচককে নিঃসংকোচে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারেন।

নারী অংগনে ইসলামের জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। সকল যুগেই এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন বিদূষী মুসলিম নারীগণ। এই যুগেও তাঁদেরকে সেই ভূমিকাই পালন

করতে হবে। এইজন্য তাঁদেরকে ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবনবিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৬) নারী ও পুরুষে শিক্ষা ও কর্মে কি কোন পার্থক্য আছে?

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করে আপন কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন করার যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য নারীদের শিক্ষা সিলেবাসে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিশু পরিচর্যা বিজ্ঞান, প্রসূতি পরিচর্যা বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা দান পদ্ধতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তেমনিভাবে, মানব সমাজ ও সভ্যতায় অবদান রাখার বিষয়টির দিকে স্থুল দৃষ্টিতে তাকালে মনে হবে যে মহান স্রষ্টা নারীদেরকে অতি নগণ্য ধরনের কিছু কর্তব্য পালন করতে বলেছেন, আর পুরুষদেরকে বলেছেন বড়ো বড়ো কাজগুলো করতে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে উপলব্ধি হবে ভিন্নতর। গভীর বিশ্লেষণ আমাদেরকে এই কথাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে যে নারীদের উপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেসব কর্তব্য অর্পণ করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে অতি বড়ো। এই কর্তব্য তাঁদের সৃষ্টি-কাঠামো, গুণ-গরিমা, আবেগ-অনুভূতি, মেধা-প্রতিভা এবং শক্তি-সামর্থের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিশীল।

প্রশ্ন ঃ ৩৭) ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা কতটুকু?

ইসলাম যেহেতু আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলে মুসলিমদের বিশ্বাস তাই এই বিধানে মানবজাতির অর্ধেক নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা কতটুকু সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়ের জ্ঞানের পরিসর মুসলিমদের মধ্যেই এত সীমিত যে, অমুসলিমগণ ছাড়াও অনেক আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমের মধ্যেও এ বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে নারী অধিকারের নামে বিভিন্ন সভায় এবং লেখায় মুসলিম কর্তৃকও এমন সব মন্তব্য করা হয় যা কুরআন তথা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অজ্ঞতা। অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে ভুল করতে পারে কিন্তু মুসলিমদের পক্ষে এরূপ করা গর্হিত। আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহ ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করে থাকে। আর না জেনে অনেক মুসলিমও তাদের সঙ্গে সুর মিলায়।

যুগ যুগ তথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীরা সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পাননি। প্রাক ইসলামী সমস্ত ধর্ম পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে নারীর স্থান অতি নিকৃষ্ট ও অনেক সময় অবমাননাকর। কেউ বলেছে 'নারীর আত্মা নেই', কেউ বলেছে 'নারী নরকের দ্বার', কেউ বলেছে 'পথে নারী বিবর্জিতা' ইত্যাদি। এ সমস্ত ধর্মে আজও নারীর স্থান পূর্বের মতই। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও ভারতে নারীর যেসব নতুন অধিকার দেয়া হয়েছে তা অতি সাম্প্রতিক এবং সেগুলো তাদের ধর্মের গন্ডির বাইরে। ইসলাম চৌদ্দশত বৎসর আগে নারীর যে সঠিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা আজও সর্বোচ্চ এবং মহা সম্মানজনক।

প্রশ্ন ঃ ৩৮) মা হিসেবে একজন নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কি কি?

মায়ের জন্য রয়েছে বড় রকমের অধিকার; বরং আল্লাহ তা'আলার অধিকারের পরে সবচেয়ে বড় অধিকার হল মায়ের। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ্' ও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পাখা অবনমিত করবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।" (সূরা আল-ইসরা ঃ ২৩-২৪)

এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর এই অধিকারটি বাস্তবায়িত হয় কথা, কাজ ও সম্পদের মাধ্যমে ইহসানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এই অধিকারের বিনিময়ে তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়ে গুরু দায়িত্ব পালন ও বড় রকমের আমানতের সংরক্ষণ করা। বরং তা এই জীবনে তার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের অন্যতম। আর এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের সূচনা হলো- আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬)

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ... । (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৩৯) স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর দায়িত্বগুলো কি কি?

- স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাকে অসন্তুষ্ট না করা।
- তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার প্রস্তুতের মত বিশেষ কাজসমূহ সম্পাদন বা তদারকি করা।
- তার মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল রাখা।
- বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে তাকে বিব্রত না করা; বিশেষ করে সে যখন স্বল্প আয়ের লোক হয়।
- ভাল কাজে তাকে উৎসাহিত করা।
- তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, যখন সে ত্রুটিবিচ্যুতি করে অথবা ভাল কাজে অবহেলা করে; আর তাকে কোমল ভাষায় উপদেশ দেয়া।
- তাকে তার কর্মকাণ্ডে ও মানসিক অবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।
- প্রত্যেক কল্যাণকর পথে তার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।
- তার নির্দেশসমূহ কাজে পরিণত করা; তবে সেই নির্দেশ অন্যায় কাজের হলে তা বাস্তবায়ন করা যাবে না।
- অন্যায় ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তার অনুগামী না হওয়া।

প্রশ্ন ঃ ৪০) নারীদের কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন?

- একজন মুসলিম নারীর নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের অধীনে আরও যা অন্তর্ভূক্ত হয়, তা হল তার নিজেকে অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা; শয়তানের পথসমূহ বন্ধ করা এবং কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

- প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত ইবাদতের নির্দেশের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা থেকে সতর্ক থাকা; যেমন সলাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে অবহেলা করা; বিশেষ করে সময় মত সলাত আদায় না করা।

- আত্মার দুর্বলতা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আস্থাহীনতা থেকে সতর্ক থাকা; আরও সতর্ক থাকা মাজার, পীর, ভণ্ড হুজুর, জ্যোতিষী, ভবিষ্যতবাণী পাঠকারী, ফাসিক ও পথভ্রষ্টদের থেকে; আর দুঃখের বিষয় হল, ঐসব ব্যক্তিদের নিকট বারবার গমনকারীদের অধিকাংশই হল নারী।

- সামগ্রিকভাবে ছোট-বড় সকল প্রকার অন্যায় ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা এবং তাতে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকা; আর এই ব্যাপারে নির্দেশ সম্বলিত কুরআন ও সুন্নাহর অনেক বক্তব্য রয়েছে; সুতরাং যেই বক্তব্যই আনুগত্যের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে, ঠিক সেই বক্তব্যই আবার প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অন্যায় ও অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করে।

- মুসলিম নারীদের মান-সম্মানের মধ্যে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা থেকে সতর্ক থাকা, যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে; কারণ, গীবত (পরচর্চা) করা, কুৎসা রটনা করা, মিথ্যা কথা বলা এবং অমুক পুরুষ ও অমুক নারীর সমালোচনা করাটা তাদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

- পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাধারণ বাহ্যিক দিকের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বা ছাড় দেয়ার প্রবণতা থেকে সতর্ক থাকা, যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তারা খাটো, হালকা-পাতলা, দৃষ্টি আকর্ষক পোশাক পরিধান করতে শুরু করেছে।

- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বক্ষেত্রে অমুসলিম নারীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা থেকে সতর্ক থাকা; আর সতর্ক থাকা তাদের (অমুসলিম নারীদের) কর্মকাণ্ডে বিমুখ হওয়া থেকে। কারণ, মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নারী চুল, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির আকৃতি ও ধরন-প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক (বহিরাগত ও শরীয়ত গর্হিত) হৈচৈ সৃষ্টিকারী নারী-পুরুষের অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

- যেমনিভাবে শরীয়তের নিয়ম-কানুনের আনুগত্য করলে সওয়াব দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে অন্যায়-অপরাধ পরিত্যাগ করার কারণেও সওয়াব দেয়া

হবে; সুতরাং আনুগত্যের কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে তার যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনিভাবে অন্যায়-অপরাধ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বড় ।

প্রশ্ন ঃ ৪১) সহীহ হাদীস অনুযায়ী নারীদের দু'টি দুর্বলতা কী কী?

ক) "তোমরা সদাকা কর । কারণ, তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন । অতঃপর নারীদের মধ্য থেকে একজন নারী দাঁড়াল, যার উভয় গালে কাল দাগ ছিল; সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! তা কেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা বেশি অভিযোগ করে থাক এবং উপকারকারীর উপকার অস্বীকার কর ।" (সহীহ মুসলিম)

খ) অপর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাইনি' । (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্য ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) গম পেষার চাক্কি ঘুরানোর কারণে ফোস্কা পড়া হাত নিয়ে তার কষ্টের কথা ব্যক্ত করলেন এবং একজন খাদেম দাবি করলেন, যে এসব কাজে তাঁকে সহযোগিতা করবে; তখন নাবী ﷺ স্বীয় কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

আমি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলে দেব না, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম? যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা, "সুবহানাল্লাহ" ৩৩ বার, "আলহামদুলিল্লাহ" ৩৩ বার এবং "আল্লাহু আকবার" ৩৪ বার পড়বে । এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম ।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৪২) একজন আদর্শ বোন হিসেবে একজন নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কি কি?

বোন হল তার ভাইয়ের নিকট সকল আত্মীয়ের মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম ও ঘনিষ্ঠ; আর তাদের উভয়ের জন্য যৌথ অধিকার রয়েছে । বরং তার (বোনের) দায়-দায়িত্ব আরও ব্যাপক । তা পালন করতে হয় ঘরের মধ্যে, যেখানে সে জীবনযাপন করে । কন্যা হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে,

ছোট ও বড় ভাই-বোনদের সাথে বোনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে তাই বলা হয়। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বৃদ্ধি করা যায় ঃ

তার চেয়ে বয়সে বড় ভাই ও বোনদের সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। কারণ, বড় বোন হলেন মায়ের মর্যাদায় এবং বড় ভাই হলেন পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাদের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্কজনিত অধিকার রয়েছে; আর তার উপর কর্তব্য হল সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হলে তাদেরকে সহযোগিতা করা। যেমন ঃ তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা, বিপদ-মুসিবতের সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং তাদের পড়াশুনা ও জ্ঞানের ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করা। বাড়ির মধ্যে সকল প্রকার কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া পাঠের মাধ্যমে, শুনানোর মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার মাধ্যমে ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ ৪৩) মহিলারা কি ঘরের বাইরে বের হতে পারে?

মহিলারা প্রয়োজনে অবশ্যই ঘরের বাইরে যাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে মহিলারা বৈধ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গিয়েছেন, তারা সকল ওয়াক্তের সলাত (সময় ও সুযোগ থাকলে) মসজিদে আদায় করেছেন। তারা জিহাদের ময়দানে পর্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে হিজাবের হুকুম হবার পর তারা সকল প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছেন হিজাব করে। তারা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন, রসূল ﷺ -এর মজলিশে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রয়োজনে খলীফাদের সাথে আলোচনা বিতর্ক করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৪) কর্মক্ষেত্রে একজন নারীর দায়িত্বগুলো কি কি?

এই যুগে নারীরা পুরুষের সাথে অনেক বিষয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে, এখানে রয়েছে নারীদের অনেক কর্মক্ষেত্র। নারীরা এর এক বিরাট অংশ দখল করে আছে; সুতরাং তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। একজন আদর্শ মুসলিম নারী একজন সফল নারী দা'ঈ' (যিনি ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেন)। সে তার কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশাবলী গুরুত্বসহকারে প্রচার করতে পারে। সেজন্য তার কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করা; সুতরাং এই একনিষ্ঠতা ব্যতীত তার আমল বিক্ষিপ্ত ধূলায় পরিণত হবে; আর তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, একজন নারী দা'ঈ'র জন্য আবশ্যক হল, সে নিজেকে তার মধ্যে আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রতিকার করবে ।

দ্বিতীয় ঃ কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করা ।

তৃতীয় ঃ কষ্টসহিষ্ণু হওয়া; কারণ, দাওয়াতী কাজ একটি ভারী দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং তার প্রতিবন্ধকতাও অনেক; সুতরাং তা উত্তরণের জন্য প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু হওয়া;

চতুর্থ ঃ ভাল কাজ, উত্তম চরিত্র এবং চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা; কারণ, দাওয়াতকে ব্যর্থতায় পর্যবেশনকারী এবং দাওয়াত দাতা ইতিবাচক ফলাফল লাভ করতে না পারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল কথার সাথে কাজের গরমিল; আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলাটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মারাত্মক অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-সাফ ঃ ২-৩); আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও, আর তোমাদের নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৪)

পঞ্চম ঃ ধৈর্য ও সহনশীলতা; কোনো ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে মহৎ যে জিনিস দেয়া হয়ে থাকে, তা হল ধৈর্য, সহনশীলতা ও তাড়াহুড়া না করা; কেননা, পথ অনেক লম্বা; আর এমন হয় যে গৃহ নির্মাণকারীই সে গৃহে বসবাস করতে পারে না; হয়ত তেমনি সে ঘর বানাবে, আর বসবাস করবে ভিন্ন অন্য কেউ; সে জ্ঞান অর্জন করবে এবং অন্যের নিকট তা পৌঁছে দেবে । সুতরাং দা'ঈ নারী তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং তার (দাওয়াতের) পথে অবিচল থাকতে এই মহৎ গুণটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে; রসূল ﷺ বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলোকে আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ ধৈর্য ও সহনশীলতা ।" (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং যার মধ্যে সহিষ্ণুতা নেই, তার উপর কর্তব্য হল, সহনশীলতার গুণ অর্জন করা; কারণ, জ্ঞান হয় জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে; আর সহিষ্ণু হয় সহনশীলতার গুণ অর্জন করার মাধ্যমে ।

ষষ্ঠ ঃ প্রত্যেক ব্যাপারে সততার পরিচয় দেয়া ঃ আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে সত্য অবলম্বন করা; মানুষের সাথে সত্য আচরণ করা; নিজের নফসের সাথে সততার পথ অবলম্বন করা এবং কিতাব, কথা ও কাজের ক্ষেত্রে সত্য অবলম্বন করা । সুতরাং সে যেন আল্লাহ অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা না বলে; কারণ, এটা জঘন্য ও ভয়াবহ মিথ্যাচার; আর সাধারণ মানুষের সাথেও মিথ্যা বলো না, এমনকি ছোট বাচ্চা ও জীবজন্তুদের সাথেও নয়; সুতরাং তার জন্য আবশ্যক হল, সে হবে সত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ।

সপ্তম ঃ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানা, যে অবস্থার মধ্যে মুসলিম নারী জীবনযাপন করে; সুতরাং সে ততটুকুই আলোচনা করবে, যতটুকু কোনো মুসলিম নারী বুঝে ও ধারণ করে । অতএব যখন সে মানুষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে, বিশেষ করে নারীর অবস্থা সম্পর্কে, তখন সে তাদের হৃদয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এবং তাদের সমস্যাসমূহ প্রতিকার করতে পারবে; আর তাদের সাথে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারবে ।

অষ্টম ঃ শরীয়তের আদব-কায়দার মাধ্যমে সে নিজে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার সম্পন্না হবে; আরও বিশেষ করে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো অনুসরণের মাধ্যমে; যেমন ঃ শর'য়ী পর্দা, পুরুষদের সাথে মেলামেশা না করা, তাদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে নরম হয়ে কথা না বলা এবং তার আকার-আকৃতি ও বেশভূষা হবে শরীয়তের বিধান মোতাবেক ।

নবম ঃ নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর শরীয়তের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিককে প্রাধান্য দেবে; সুতরাং তার সার্বক্ষণিক চিন্তা থাকবে অন্যদেরকে হিদায়াত করা, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের মধ্যে যারা শত্রুদের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে গেছে তাদেরকে উদ্ধার করা । আর তার অভিপ্রায় এমন হবে না যে, সে খ্যাতিমান অথবা গণমানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং দুনিয়ার কোন বস্তু পাওয়ার প্রত্যাশা করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

দশম ঃ দাওয়াতের সফল পদ্ধতিসমূহের প্রতি মনোযোগ দেয়া । আর এক কথায়, শরীয়ত যেসব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে, সেসব বিষয় দ্বারা

নিজেকে গুণান্বিত করা এবং শরীয়ত যেসব বিষয় থেকে সতর্ক করেছে, সেসব বিষয় থেকে দূরে থাকা।

প্রশ্ন ঃ ৪৫) নারীরা কিভাবে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারে?

এমন কাজে সময় অতিবাহিত করা, যাতে কোন উপকার নেই। যেমন ঃ বিভিন্ন প্রকার মিডিয়া অনুসরণ করা এবং অপরাপর এমন সব যোগাযোগের মাধ্যমের পেছনে আত্মনিয়োগ করা, যার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে বহু সময় অন্যায়-অপরাধে, খেল-তামাশায় ও অনর্থক কাজে নষ্ট হয়। অথচ মানুষকে তার সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। সময়ই তার বয়স ও জীবন, আর তা জগতের সবচেয়ে দামী জিনিস। যখন তা এসব মিডিয়া ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যয় করবে, তখন তা হবে তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খারাপ পরিণতি ও ক্ষতির কারণ। অথচ অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের ব্যাপার হল, অনেক মেয়েদেরই অবসর সময়গুলো নষ্ট হয় টিভিতে আজেবাজে নাচ-গান-সিনেমা-নাটক ইত্যাদি দেখে, বান্ধবীদের সাথে বেহুদা আড্ডা দিয়ে।

অপ্রয়োজনে শপিং মল দিয়ে ঘুরাঘুরি করা ঃ এটি একটি ভয়ানক সমস্যা, যা এই শেষ যামানায় শুষ্ক লতাপাতায় আগুন ছড়ানোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক মুসলিম কন্যারাই বিভিন্ন শপিং মলে অপ্রয়োজনে ঘুরে বেড়ায় যার ফলে তাদেরকে অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এসব বিপদসমূহের অন্যতম হল শয়তানের শিকার হওয়া; কারণ, বাজার শয়তানেরই অবস্থান কেন্দ্র এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জায়গা হল বাজারসমূহ। যখন মেয়েরা কোন প্রয়োজনের কারণে বাধ্য হবে বাজারে যেতে, তখনই শুধু তার অভিভাবককে সাথে নিয়ে তার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বাজারে বের হবে, অতঃপর প্রয়োজন শেষে তারা ঘরে ফিরে আসবে। আর এই বের হওয়াটা অনুপ্রেরণা দেয় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বারবার ঘর থেকে বের হতে। সুতরাং প্রত্যেক মেয়ের উচিত সে যেন তার প্রয়োজনকে হিসাব করে নেয় এবং এই বের হওয়াটা যাতে বেশি না হয়। নারী যখন তার ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়। এটি হাদীস থেকে প্রমাণিত।

নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ নারী হল গোপন বস্তু, সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়। (তিরমিযী)

অপ্রয়োজনে মোবাইলে কথা বলা ঃ ফোনের ভাল-মন্দ দুটোই রয়েছে। মূলতঃ এটি প্রয়োজনেই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হল, টেলিফোনের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। সে যখন ফোন তার কানে নেয়, তখন অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তা ছাড়ে না।

প্রশ্ন ঃ ৪৬) নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী দায়িত্বগুলো কী কী?

প্রথমত ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন বিশেষ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; আর সে থেকেই তিনি তাকে এমন কতগুলো বিধিবিধানের সাথে বিশেষিত করেছেন, যেগুলো ঐ বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ হায়েয (ঋতুস্রাব), ৯/১০ মাস সন্তান ধারণ, নিফাস (সন্তান জন্মের পরবর্তী সময়), উভয় অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন, সন্তানকে দুধ পান করানো এবং সলাত, সিয়াম, হাজ্জ প্রভৃতি ধরনের ইবাদতের কিছু কিছু বিধানের সাথে যা সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত ঃ একজন নারীর উপর কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও মহান আমানত রয়েছে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার উপর ন্যস্ত করেছেন। সে সাধারণভাবে আকীদা-বিশ্বাস, পবিত্রতা অর্জন, সলাত (নামায), সিয়াম (রোযা) প্রভৃতির মত শরীয়তের সকল বিধিবিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর তার জন্য আরও কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে, একাধারে সে লালনপালনকারিণী, মাতা ও স্ত্রী হওয়ার কারণে তাকে সেগুলোর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক অবস্থায় তার উপর আবশ্যক হল সে ঐ নিয়ম-কানুনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন ঃ ৪৭) নারীরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত?

বিজাতীয় সভ্যতার পক্ষ থেকে বিগত যুগে মুসলিম নারীরা ঐ নগ্নতা কালচারের শিকার হয়েছে এবং মুসলিম সন্তানদের কেউ কেউ সেই কালচারকে স্বাদরে গ্রহণ করেছে; ফলে মিডিয়া যা বলছে, তারা তা-ই আওড়াতে থাকে এবং ঐ আওয়াজসমূহের প্রতিধ্বনি-ই করতে থাকে, যাতে নারী তার আপন গৃহ থেকে বেরিয়ে যায়, সে পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে এবং তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরিয়ে দিতে পারে।

উপরোল্লেখিত নগ্ন হামলার সাথে সাথে নারী বিষয় নিয়ে অনেক ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব সাধন করা হয়েছে। যেগুলো ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে সচেতন মুসলিম নারীদের কারও কারও মধ্যেও দেখা যায়। বস্তুত এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে এমন কিছু লোক হাঁকডাক দিচ্ছে, যারা চায় নিজেকে প্রকাশ করতে; আরও চায় তার জন্য এমন একটি রায় বা মত হবে, যা তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নারীর অনেক ব্যাপার নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে দু'ভাগে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৪৮) মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ১ ঃ রক্ষণশীল বুদ্ধিমতি নারী, যিনি তার প্রতিপালকের শিক্ষা ও দর্শনসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং ঈমান ও তুষ্টতা সহকারে সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি এই দ্বীনকে শক্তভাবে বহন ও আঁকড়ে ধরেছেন এবং বিজাতীয় বিনষ্ট বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর তিনি তার প্রতিপালকের দিকে অন্যদেরকে মাথা উঁচু করে দৃঢ়তার সাথে আহ্বান করেন এবং তার ব্যক্তিত্ব, পর্দা ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলেন। তার স্বামীর অধিকার বাস্তবায়নকারিণী হিসেবে এবং তার সন্তানদের লালনপালনকারিণী হিসেবে এই জীবনে তিনি তার প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। এই প্রতিটি অবস্থাই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অন্ধকার দূর করার জন্য, যা মুসলিম নারীর বিষয়ে এই যুগ বা সময়কে প্রভাবিত করেছে; যাতে করে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী মুক্তিকামী পুরুষ অথবা নারীর জন্য পথ স্পষ্ট হয় এবং তার মাইলফলকগুলো পরিস্কারভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠে।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ২ ঃ মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম জাতির পরিপূর্ণতার জন্য এমন রক্ষণশীল আদর্শ নারীর প্রয়োজন, যে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং তার উপর অর্পিত আমানতকে অনুধাবন করে; যে নিজের পথ দেখতে পায় এবং তার নিজের অধিকার ও অন্যের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৩ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যার রয়েছে তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস; সুতরাং তিনি তাঁকে প্রতিপালক, স্রষ্টা ও মাবুদ বা উপাস্য বলে বিশ্বাস করেন; আরও বিশ্বাস করেন তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমষ্টি ও রসূলগণের প্রতি; আর পরকালের প্রতি এবং

তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি। অতঃপর এই ঈমান অনুযায়ী তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন তার এই জীবনের চিন্তাভাবনাগুলোকে; জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৪ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যিনি তার প্রতিপালকের শরীয়ত তথা বিধিবিধানকে সংরক্ষণ করেন, অনুধাবন করেন তাঁর আদেশসমূহকে; অতঃপর সে অনুযায়ী কাজ করেন। আর অনুধাবন করেন তাঁর নিষেধসমূহকে, অতঃপর সেগুলো থেকে দূরে থাকেন। তার নিজের অধিকার এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, অতঃপর এর মাধ্যমে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৫ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যিনি তার প্রকৃত দায়িত্বের বিষয়গুলো এবং তার গৃহরাজ্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন; অতঃপর এই ছোট্ট রাজ্যের অধিকার সংরক্ষণ করেন, যে রাজ্য পুরুষদের প্রস্তুত করে এবং শিশু-কিশোরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ -এর ভালবাসায় ও তাঁর দ্বীনের সেবায় গঠন করে তোলে।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৬ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যার বাহ্যিক দিক তার অভ্যন্তর সম্পর্কে বলে দেয়। কারণ, তিনি প্রাচ্য বা পার্শ্ববর্তী দেশ দ্বারা প্রভাবিত নন, প্রভাবিত নন কোনো প্রবণতা বা ফ্যাশন দ্বারা; যিনি প্রত্যেক ধ্বনি বা চীৎকারের অনুসরণ করেন না। তিনি তার বাহ্যিক ক্ষেত্রে মডেল বা আদর্শ, যেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ দিকেও আদর্শ। তার শরীর সংরক্ষিত; আর তার হৃদয় ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তার পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার দিকটি সুস্পষ্ট; আর তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্তরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাই পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। তিনি ঈমান এনেছেন, শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং আমল করেছেন।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৭ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যিনি আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নারী, যিনি তার কথার পূর্বে কাজের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করেন; তিনি মানুষের জন্য ভাল ও কল্যাণকে পছন্দ করেন, যেমনিভাবে তা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেন; তিনি একে উপদেশ দেন, ওকে নির্দেশনা প্রদান করেন আর আরেকজনের অন্যায় কাজের সমালোচনা করেন; তিনি লালনপালন করেন, গঠন করেন, ভুলত্রুটি সংশোধন করেন, সমস্যা সমাধান করেন, তার সম্পদ দ্বারা দান-সদাকা করেন, তার সাধ্যানুসারে কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেন, দাওয়াতী কাজ নিয়েই তিনি জীবনযাপন করেন, কি দাঁড়ানো

অবস্থায়, কি তার কাজের মধ্যে এক কথায় যে কোন স্থানে, যে অবস্থায়ই থাকেন।

মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য ৮ ঃ মুসলিম মু'মিন নারী যিনি তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতন থাকেন, অতঃপর তাদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের আনুগত্য হওয়া থেকে, তাদের আহ্বানসমূহে সাড়া দেয়া থেকে এবং তাদের জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ থেকে সতর্ক থাকেন। তিনি সদা-সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং ঐসব প্রচার-প্রপাগান্ডা থেকে সতর্ক করেন, যেগুলো নারীকে তাদের প্রপাগান্ডার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে যার বিবরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৪৯) পুরুষ ও নারীদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র কেমন হওয়া উচিত?

পুরুষ ও নারী উভয়ই মানুষ। মানুষ হিসেবে তাঁরা অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের একজন পুরুষ মানুষ এবং অপরজন মেয়ে মানুষ সেহেতু তাঁদের মাঝে ভিন্নতাও আছে। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষগণ সবল, নারীগণ দুর্বল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ সবল, পুরুষগণ দুর্বল। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে কঠোরতা-নির্মমতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষগণই যোগ্য বলে প্রমাণিত। আবার যেসব ক্ষেত্রে নম্রতা-কোমলতা প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে নারীদের উপযুক্ততা অনস্বীকার্য।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পুরুষদের দেহকে পেশীবহুল ও শক্তিশালীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের দেহ কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী। তাঁদের মাঝে কষ্ট সহিষ্ণুতার মাত্রা বেশি। দুর্ধর্ষতা, সাহসিকতা, ক্ষিপ্রতা, দৃঢ়তা এবং কঠোরতা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা প্রবল। এইসব গুণ পুরুষদেরকে বাইরের কাজের উপযুক্ততা দান করেছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নারীদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের দেহ কঠোর পরিশ্রম করার এবং ভারী বোঝা বহনের উপযোগী নয়। নম্রতা, বিনয়, মায়া-মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। তাঁদের মাঝে প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা বেশি। ঘরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা এবং পরিবার-পরিসরকে মায়াময় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের জুড়ি নেই। মানব বংশকে গর্ভে ধারণ, প্রসব, স্তন্য দান এবং লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাদের কোন বিকল্প নেই। দৈহিক ও মানসিক এইসব বিশিষ্ট্যতার কারণে মহান আল্লাহ গৃহকেন্দ্রিক কাজগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব দিয়েছেন নারীদেরকে। অর্থাৎ

সৃষ্টিগত ভিন্নতার ভিত্তিতেই জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পুরুষ মানুষ এবং মেয়ে মানুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৫০) নারীর কাছে তার পরিবার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কতটুকু?

পরিবারও একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার প্রথম বুনিয়াদ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়ার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলো প্রথম পরিবার। পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানব সন্তানকে মনস্তাত্বিকভাবে সুস্থরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন মাতৃস্নেহ। আবার তাকে দৈহিকভাবে সবলরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন মাতৃদুগ্ধ। একটি সুখী ও দায়িত্বশীল পরিবারের সন্তানেরাই কেবল সুস্থমনা ও সবলদেহী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। মাতৃদুগ্ধ পান না করে যারা বেড়ে উঠে তাদের মাঝে রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা কম থাকে। আবার মাতৃস্নেহের উষ্ণতা বঞ্চিত হয়ে যারা গড়ে ওঠে তাদের থাকে অসুস্থ মন। আর এই অসুস্থ মনই হচ্ছে অপরাধ প্রবণতার প্রধান উৎস।

একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ছাড়া যেমন একটি অফিস, স্কুল কিংবা কলেজ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না, তেমনি একজন সার্বক্ষণিক পরিচালিকা ছাড়া একটি পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া পরিবার নামের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে সুখ, শান্তি ও কল্যাণের কেন্দ্রে পরিণত করে। স্বামী বাইরে কাজ করে ঘরে ফেরেন। আবার, সারাদিন পরিবারের বহুবিধ ঝামেলা পোহাতে গিয়ে স্ত্রীও ক্লান্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু পরিবার পরিসরে স্বামী এবং স্ত্রী যখন একে অপরের মুখোমুখি হন তখন উভয়ের ক্লান্তি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রশান্তির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মনে। একটা সুখানুভূতি খেলে যায় তাঁদের অস্তিত্বের পরতে পরতে। এমন অনাবিল সুখ লাভের আর কোন বিকল্প স্থান নেই।

পুরুষের মতো নারীগণও যদি বাইরের কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে পরিবার প্রতিষ্ঠানে শান্তি টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। আর পরিবার প্রতিষ্ঠানের ভাংগন একটি জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। বাস্তবে দেখা গেছে যে স্বামী এবং কয়েকটি সন্তান রেখে স্ত্রী মারা গেছেন। সেই পরিবারের দুঃখ কষ্টের আর শেষ থাকে না। পরিবারটির এক করুণ চিত্র ফুটে উঠে। আর এই সমস্যা যে সকল পরিবার ভুক্তভুগি তারাই আরো ভাল উপলব্ধি করতে পারেন। মনে হয় মা-ই যেন এই সংসারটিকে বুকে আগলে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ৫১) নারীদের উপর অর্পিত কাজের বড়ত্ব কতটুকু?

সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা তখনই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যখন নারীগণ তাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। গর্ভে সন্তান ধারণ, ভূমিষ্ঠ সন্তানকে স্তন্যদান, শিশুর লালনপালন, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাহচর্য দান এবং সন্তানদেরকে সমাজ ও সভ্যতার কর্ণধাররূপে সমাজ অংগনে প্রেরণ করে নারীগণ সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের পূর্বশর্ত পূরণ করে থাকেন।

জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ নারীদের জন্য এই মহান কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারীদের উপর অর্পিত কর্তব্যকে ছোট মনে করে যাঁরা তাঁদেরকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনতে চান তাঁরা নারীদের উপর মহামহিম আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অর্পিত কর্তব্যের বড়ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সূক্ষদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এবং আবেগ বিবর্জিত গভীর চিন্তা নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করলেই কেবল এর কল্যাণময়তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ ৫২) নারীদের উপর বাইরের কাজ চাপানো এক প্রকারের যুলুম নয় কি?

মানব সন্তান স্নেহ-মমতার কাঙাল। যেসব সন্তান স্নেহ-মমতার উষ্ণতায় বেড়ে উঠে তারা মানসিক ভারসাম্য অর্জন করে। সন্তানকে এই স্নেহ-মমতা দেয়ার জন্য প্রয়োজন মায়ের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য। মাতৃত্বের দাবি পূরণ করা সহজ কোন ব্যাপার নয়। এটি নারীদের নিকট অনেক সময়, চিন্তা-ভাবনা ও পরিশ্রম দাবি করে। মাতৃত্বের দাবি পূরণ এবং পরিবার পরিসরের বহুবিধ কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সময়, শ্রম এবং মেধা নিয়োজিত করার পরও নারীদের উপর বাইরের কাজের বোঝা চাপানো ইনসাফ নয়, বরং যুলুম। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা এই যুলুম থেকে নারীদেরকে বাঁচাবার জন্যই গৃহকেন্দ্রিক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আপন প্রতিভা বিকাশের দিকে আগ্রহী হতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এটা আরো যুলুম যে, যে সকল নারীরা চাকুরী করেন তারা আসলে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করেন। তারা সারাদিন বাইরে চাকরি করেন আবার বাসায় ফিরে নিজ সংসার দেখাশোনা ঠিকই করেন। কোন কোন পরিবারে স্বামী হয়ত ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করেন তারপরও সংসারের মূল কাজ কিন্তু দেখা যায় স্ত্রীই করেন।

প্রশ্ন ঃ ৫৩) নারীদের জন্য কী উত্তম?

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারী অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকার যোগ্য। যখন সে ঘরের বাইরে যায় শয়তান তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী তখনই হতে পারে যখন সে আপন গৃহে অবস্থান করতে থাকে। (জামে আত তিরমিযী)

আল্লাহর রসূল ﷺ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বললেন, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অবস্থান করা। এটাই তোমাদের জিহাদ। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, নারী তার স্বামীর গৃহের লোকদের এবং তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। তাদের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিতা হবে। (সহীহ বুখারী)

গৃহকেন্দ্রিক কাজের জন্য সৃষ্টিগত বৈশিষ্টতা ও উপযুক্ততার কারণেই মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ নারীদেরকে গৃহে অবস্থান করে তাঁদের উপর অর্পিত কর্তব্যসমূহ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। নারীগণ যাতে গৃহকেন্দ্রিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন এবং এই কাজগুলোতে বেশি বেশি সময় দিতে পারেন সেইজন্য ইসলাম তাঁদেরকে বাইরের অনেক কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। যেমন ঃ

- নিজেদের রুজি রোযগারের পেরেশানি থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।
- প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে পুরুষদের উপর। নারীদের উপর এই বাধ্যবাধকতা নেই।
- জুম্মাবারে সলাতুল জুমু'আ পুরুষদের জন্য ফরয। কিন্তু নারীদের জন্য তা ফরয করা হয়নি।
- সলাতুল জানাযাতে শরীক হওয়া, মৃতব্যক্তির কবর খনন, কাফন-দাফন ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব নেই নারীদের। কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে পুরুষদের উপর।
- পরিবার সদস্যদের জন্য অর্থোপার্জনের গুরু দায়িত্ব পুরুষদের উপর অর্পিত। এই কঠিন বোঝা চাপানো হয়নি নারীদের কাঁধে।

- রাষ্ট্রপরিচালনার জটিল কাজ পুরুষদের উপর চাপানো হয়েছে। নারীদেরকে দেয়া হয়েছে অব্যাহতি।
- দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। আর যুদ্ধ খুবই কঠিন এক কাজ। এটি একদিকে দাবি করে কঠিন পরিশ্রম, অন্যদিকে দাবি করে রক্ত। মহান আল্লাহ এই কঠিন কাজ পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছেন। অব্যাহতি দিয়েছেন নারীদেরকে।

প্রশ্ন ঃ ৫৪) পুরুষ ও নারীদের অবাধ মেলামেশা কেন নিষেধ?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা (পর) নারীদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক। (সহীহ বুখারী)

আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী ﷺ স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে নারীদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (তাবারানী)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, যেই পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর বিছানায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুহাররাম সংগী ছাড়া কোন নারী সফর করবে না এবং কোন মুহাররামকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন নারীর কাছে যাবে না। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন নারীর নিকট বসবে না যদি সেই নারীর কোন মুহাররাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শয়তান। (আহমাদ)

আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) কোন প্রয়োজনে আলী ইবনু আবী তালিবের (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বাড়িতে যান। তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। তিনি ফিরে গিয়ে আবার এলেন। এবারও আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। ফিরে গিয়ে তৃতীয়বার এসে তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "আপনার প্রয়োজন যখন ফাতিমার সাথে সম্পর্কিত ছিলো আপনি ফিরে না গিয়ে তার কাছে গেলেন না কেন?" জবাবে তিনি বললেন, "নারীদের স্বামীদের

অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ৫৫) পুরুষ ও নারীদের সম্মিলিত অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব কেন পুরুষদের?

আল কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, *"পুরুষগণ নারীদের পরিচালক এই কারণে যে আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এই জন্যও যে পুরুষ তাদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)*

'পরিচালক' তাঁকেই বলা হয় যিনি কোন ব্যক্তি, সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবেই এই ধরনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। এই বিশিষ্টতার কারণেই পরিবার সংগঠনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র-সংগঠনের বৃহৎ পরিসর পর্যন্ত নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পুরুষদের উপরই অর্পিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে নারী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহা) মসজিদে গিয়ে সলাতের জামাআতে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ঈদের ময়দানে যেতে চাইতেন। যুদ্ধের ময়দানে যাবার আগ্রহও তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ রাষ্ট্র প্রধান হতে চাননি বা মসজিদের ইমাম হতে চাননি বা খলিফা হতে চাননি বা কোন এলাকার গর্ভনর হতে চাননি। যদি তা আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ চাইতেন তাহলে রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর তার মেয়ে বা তার বিচক্ষণ স্ত্রীরা এসব দায়িত্ব পেতেন।

আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, ইরানীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর সম্রাট-কন্যাকে সিংহাসনে বসায়। এই খবর শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে জাতি কোন নারীর উপর তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব অর্পণ করে সে জাতি কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী)

নারীদেরকে পুরুষ ও নারীদের যৌথ ফোরামের নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ না দেয়াটাকে কেউ কেউ তাঁদের জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করে থাকেন। আসলে এটা তাঁদের জন্যে মোটেই মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা নয়। তাঁদের সৃষ্টিগত শারীরিক

ও মানসিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখেই মহান স্রষ্টা তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস রাখা উচিত যে জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীদের জন্য যেই কর্মবিভাজন করেছেন এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ।

প্রশ্ন ঃ ৫৬) ইসলাম মানে কী?

প্রত্যেক সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিধানই স্রষ্টা দিয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সকলেরই জন্য রচিত বিধান মেনে চলা বা না চলার কোনো অধিকার তাদেরকে দেননি। তিনি নিজেই সব বিধান সব সৃষ্টির উপর চালু করে দিয়েছেন। ঐসব বিধান নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি, আল্লাহ তা'আলা নিজেই জারী করেছেন।

মানুষের দেহের জন্যও যেসব বিধান দরকার তাও নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিধি এবং অন্যান্য যাবতীয় বিধান আল্লাহ তা'আলা নিজেই চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনের সকল বিধি-বিধান, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য যে জীবনবিধান প্রয়োজন তা-ই নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এসব মেনে চলার জন্য বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমরা কী আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

সুতরাং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। মানুষের উপযোগী যে বিধান তা-ই মানুষের ইসলাম। মানুষের দেহসহ সকল সৃষ্টির ইসলামই বাধ্যতামূলক এবং তার জন্য নাবীর দরকার হয়নি। কিন্তু ভাল-মন্দ পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করা মানুষের জন্য যে ইসলাম তা নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং তা পালন

করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। এমন কি নাবীকেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি মানুষকে বাধ্য করতে। যখন কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দেয়া বিধানই তার জন্য ভাল তখন বুঝা গেল যে, সে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ সে ইসলামকে মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন জানা দরকার যে, এ সিদ্ধান্ত যে নিয়েছে তার করণীয় কী?

প্রশ্ন ঃ ৫৭) আমি আল্লাহর আদেশ মানতে রাজি আছি কি?

"আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭২)

- ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন জুবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রমুখ বলেন ঃ আমানত হল ফরযসমূহ।
- কাতাদা (র.) বলেন ঃ আমানত হল দ্বীন, ফরযসমূহ এবং শরীয়তের সীমারেখা বা দণ্ডবিধিসমূহ।
- উবাই ইবন কা'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আমানতের মধ্যে অন্যতম হল নারীকে তার লজ্জাস্থানের ব্যাপারে আমানত রাখা হয়েছে।
- ইবনু কাছীর (র.) বলেন ঃ এসব কথার মধ্যে কেনো বিরোধ নেই। বরং এগুলো একই কথা প্রমাণ করছে যে, সেই আমানতটি হচ্ছে তাকলীফ তথা (ইসলামের বিধিবিধানের) দায়িত্ব-প্রদান।

"অবশ্যই আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৫)

নারীর উপর আবশ্যক হল এই দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। সে তা উপলব্ধি করবে পূর্ণ অনুভূতিসহকারে, সে তা জেনে ও বুঝে উপলব্ধি করবে, সে তা প্রতিষ্ঠিত করে ও কাজে পরিণত করার মাধ্যমে স্মরণ রাখবে এবং সে অন্য নারীদের মাঝে তা প্রচার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার হিফাযত করবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৮) আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ কিভাবে আদায় করা যায়?

একজন মুসলিম বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ এত বেশি যে, দুনিয়ার কোন হিসাব-নিকাশ তা আয়ত্ত করতে পারবে না এবং হিসাব করে শেষও করা যাবে না। বিশেষ করে, আল্লাহ তা'আলা একজন মুসলিমকে এ মহান দ্বীনের প্রতি যে হিদায়াত দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত দুনিয়াতে আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন এবং তিনি তার বান্দাদের জন্য এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং পছন্দ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার বান্দাদের থেকে এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন আর কিছুই তিনি কবুল করবেন না। কারণ, এ দ্বীনের কোন বিকল্প নেই, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য এ দ্বীনকেই বাছাই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ *নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ *আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮৫)*

দুনিয়াতে একজন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা হল এ মহান দ্বীনের প্রতি হিদায়াত লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যাকে এ দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও এ দ্বীনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলার তাওফিক দিয়েছেন, তার চেয়ে

সৌভাগ্যবান ও সফল ব্যক্তি দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। সেই দুনিয়া ও আখিরাতে একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

আর এ দ্বীনের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য হল, মুসলিম নারী ও নারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। যারা এ দ্বীনের অনুসারী তাদের দায়িত্ব হল, নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রমের হিফাযত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং তাদের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য না করা। কোন মুসলিম ব্যক্তি যেন কোন নারীর সাথে এমন কোন কাজ না করে, যাতে তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার অবমাননা হয়। এ ধরনের যে কোন কাজকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ যাতে তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম-অত্যাচার করতে না পারে, তার প্রতি ইসলাম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যে সব কাজে বা কর্মে এ ধরনের অবকাশ থাকে, ইসলাম সে ধরনের কাজকর্ম থেকে মুসলিমদের দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার অর্থ হল, তার বিধানকে আঁকড়ে ধরা এবং তার দেয়া আদেশ ও নিষেধের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের আনুগত্য করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। আর যে এ বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিশ্বাস তার অন্তরে লালন করে, তার চেয়ে হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ হতেই পারে না। দুনিয়া ও আখিরাতে সেই অপমান অপদস্থের জন্য একমাত্র ব্যক্তি।

প্রশ্ন ঃ ৫৯) ইসলামের বিধানে কি নারীর প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হয়েছে?

একজন নারীকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, ইসলামের বিধানগুলো সসম্পূর্ণ নিখুঁত, তাতে কোন প্রকার খুঁত নেই। বিশেষ করে নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের বিধানগুলো আরও বেশি নিখুঁত ও সঠিক। তার মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্র ও ফাঁক নাই, যাতে কেউ আপত্তি তুলতে পারে এবং অবজ্ঞা করার বিন্দু-পরিমাণও সুযোগ নেই, যাতে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে। ইসলাম নারীদের জন্য যে বিধান দিয়েছে, তা নারীদের স্বভাব ও মানসিকতার সাথে একেবারেই অভিন্ন। ইসলামের বিধানে তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম, নির্যাতন ও অবিচার করা হয়নি এবং তাদের প্রতি কোন বৈষম্যও করা হয়নি।

আর তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? যেহেতু এ সব বিধানগুলো হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনিই এ জগতকে পরিচালনা করেন এবং পরিচালনায় তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় মাখলুক-বান্দাদের বিষয়েও অভিজ্ঞ। কোন কাজে তার বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা সে বিষয়ে তিনিই সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি এমন কোন বিধান মানবজাতির জন্য দেবেন না, যাতে তাদের কোন অকল্যাণ থাকতে পারে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় অপরাধ ও অন্যায় হল, নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বা অন্য যে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর দেয়া শরীয়তের কোন বিধান সম্পর্কে এ মন্তব্য করা যে, আল্লাহর এ বিধানে তার বান্দাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে অথবা এ বিধানে দুর্বলতা রয়েছে অথবা এ বিধানটি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়, ইত্যাদি। এ ধরনের কথা যেই বলবে, মনে রাখতে হবে, অবশ্যই সে আল্লাহ তা'আলার সম্মান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আল্লাহর কুদরাত ও ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোন কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছুই নেই। সে আল্লাহকে যথাযথ সম্মান দেয়নি। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না?" (সূরা নুহ ঃ ১৩)*

প্রশ্ন ঃ ৬০) ইসলাম নারীর সম্মান কিভাবে দিয়েছে?

একমাত্র ইসলামই মুসলিম নারীদেরকে ইসলামের নির্ভুল দিকনির্দেশনা ও বাস্তব-ধর্মী নীতি মালার মাধ্যমে তাদের যাবতীয় অসম্মান ও অবমাননা থেকে রক্ষা করেছে। ইসলাম তাদের নিরাপত্তা বিধান করেছে, তাদের সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের যাবতীয় কল্যাণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের জন্য সব ধরনের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। ইসলামই তাদের জন্য সুন্দর ও আনন্দদায়ক জীবন নিশ্চিত করেছে। সব ধরনের ফিতনা, ফ্যাসাদ, অন্যায় ও অনাচার থেকে ইসলাম নারীদের হিফাযত করেছে। ইসলাম তাদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য, যুলুম ও নির্যাতন করার সব পথকে রুদ্ধ করেছে। আর এগুলো সবই হল, তার বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অপার অনুগ্রহ, বিশেষ করে নারী জাতির প্রতি।

কারণ, তিনি তাদের জন্য এমন এক শরীয়ত নাযিল করেছেন, যা তাদের কল্যাণকে নিশ্চিত করে, ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে তাদের হিফাযত করে, তাদের হঠকারিতা দূর ও তাদের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা

ইসলামকে আমাদের জন্য এক বিশাল নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। বিশেষ করে, ইসলামই আমাদের- এক কথায় আমাদের নারীদের জন্য নিরাপত্তা-স্থল ও আশ্রয় কেন্দ্র। যারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নেবে, তারাই নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবে। বরং ইসলাম সমাজকে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার হতে রক্ষা করে। সমাজে যাতে কোন প্রকার বিপদ-আপদ, ঝগড়া-বিবাদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য ইসলামই একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলাম এ সব থেকে সমাজকে রক্ষা করে এবং একটি উন্নত সমাজ জাতির জন্য নিশ্চিত করে। আর যখন সমাজ থেকে নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বিধানগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন সমাজে অন্যায়, অনাচার, ঝগড়া, বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। নারীদের কোন নিরাপত্তা সে সমাজে অবশিষ্ট থাকে না।

প্রশ্ন ঃ ৬১) নারীদের অধিকারের বিষয়ে কুরআনের দিক নির্দেশনাগুলো কি কি?

কুরআন, যাকে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত ও অনুপম আদর্শ হিসেবে দুনিয়াতে নাযিল করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে, সে অবশ্যই দেখতে পাবে, আল্লাহ নারীদের বিষয়ে কতই না সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন এবং নারীদের অধিকারকে তিনি কতই না গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমুন্নত রেখেছেন। আল্লাহ নারীদের অধিকারকে সংরক্ষণ করার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর যারা নারীদের অধিকার নষ্ট করে এবং তাদের উপর যুলুম, অত্যাচার ও তাদের সাথে বিমাতা-সুলভ আচরণ করে, তাদের বিষয়ে তিনি কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। নারীদের অধিকার বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। এমনকি নারীদের নামে একটি সূরাও তিনি নাযিল করেন, যার নাম সূরা আন-নিসা। যার মধ্যে এমন সব আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, তাদের সামাজিক মর্যাদা, পুরুষদের প্রতি তাদের করণীয়, নারী অধিকার, বিবাহ, ঘর-সংসার, তালাক ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬২) একজন নারী হিসেবে আমার চারিত্রিক ভালমন্দের বিচার করবো কীভাবে?

ইসলাম একদিকে যেমন আমাদের চরিত্রের ভালমন্দের মাপকাঠি দিয়েছে, অন্যদিকে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কীয় ধারণা এবং আমাদের চরিত্রের

ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ উপায় দান করেছে। আমাদের চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য শুধু মানব-বুদ্ধি কিংবা প্রবৃত্তি কিংবা নিছক অভিজ্ঞতা অথবা মানুষের অর্জিত বিদ্যার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে বলে নাই। কারণ তা হলে এই সবের পরিবর্তনশীল সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের নৈতিক বিধি-নিষেধগুলিও চিরদিনই পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং কোন একটি কেন্দ্রে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ানো উহার পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না।

বস্তুতঃ ইসলাম আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট 'উৎস' দান করেছে, এটা হতে আমরা প্রত্যেক যুগেই এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় নৈতিক বিধান লাভ করতে পারি - সেই উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন এবং রসূল ﷺ -এর হাদীস। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা আমরা এমন একটা ব্যাপক বিধান লাভ করতে পারি, যা মানুষের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় বিরাট বিরাট সমস্যা পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও প্রত্যেকটা শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে। মানব-জীবনের বিপুল কাজকর্মের ব্যাপারে ইসলামের এই নৈতিক বিধান এমন সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে যে, কোন অবস্থায়ই এবং কোন কাজের নির্দেশ লাভ করার জন্য আমাদের অন্য কোন 'উৎস'রই মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

প্রশ্ন ঃ ৬৩) একজন মুসলিম নারী হিসেবে আমার করণীয়গুলো কি কি?

প্রথমত ঃ সর্বপ্রথমে আমাকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, শিক্ষা-চরিত্র সবক্ষেত্রেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার অন্যান্য কাজকর্মের পাশাপাশি আমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ (তাফসীর) পড়ে নিতে হবে। কারণ, হিদায়াতের এই মহাগ্রন্থটিকে তার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পড়া না হলে তা আমার জীবনে কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

কুরআন অধ্যয়নের পাশাপাশি আমাকে হাদীসের চর্চাও শুরু করতে হবে। কারণ, হাদীস হচ্ছে মূলতঃ কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই, ইসলামকে সঠিক অর্থে অনুধাবনের জন্যে আমাকে হাদীসের অধ্যয়ন অবশ্যই চালু রাখতে হবে। একটি রুটিন করে নিয়ে সপ্তাহে অন্ততপক্ষে ১৫টি আয়াত ব্যাখ্যাসহ পড়া উচিত এবং ১৫টি হাদীস। দয়া করে আমরা কুরআনকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না রাখি, তাকে বুঝতে চেষ্টা করি।

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের সাথে সাথে ইসলামকে এ যুগের জীবনে জিজ্ঞাসার আলোকে বুঝার জন্যে আমাকে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। আমাকে বুঝে নিতে হবে যে ইসলামই হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবনবিধান। মানুষের চলার জন্যে যতোগুলো মত ও পথ আছে তারমধ্যে ইসলামই হচ্ছে চির আধুনিক ও চির প্রগতিশীল। তাই কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, ইসলামের পারিবারিক জীবন, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, ইসলামী শিক্ষা, নারী শিক্ষা, তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত ইত্যাদির উপর অথেন্টিক বই সংগ্রহ করে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। রুটিন করে নিয়ে সপ্তাহে অন্ত তপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা ইসলামী সাহিত্য পড়া উচিত।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আমার তৃতীয় কাজ হবে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করা। শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আদায় করা। সাথে সাথে কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও শরীয়তের হুকুম আহকাম মেনে চলার মাধ্যমে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। এতে আমার মনে বাহ্যিক জীবনে এমন এক তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও দায়িত্বানুভূতির মনোভাব গঠন হবে, যার আলোকে আমি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থত ঃ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সে মোতাবেক আমলের কর্মসূচী শুরু করার পর আমার কাজ হবে আমার নিজের ভাই-বোন, আমার স্বামীর ভাই-বোন, আমার পিতা-মাতা, আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী এবং অন্যান্য আপন আত্মীয়-স্বজনদের সত্যের পথে আনার চেষ্টা করা। আমি যে সত্যের সন্ধান নিজে লাভ করেছি, যে সত্য আমার জীবনে এতো বড়ো বিপ্লব সাধন করলো তাকে অন্যদের জীবনেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য আমি নিয়মিত বই ও ডিভিডি বিতরণ করতে পারি এবং প্রতি সপ্তাহে অথবা অন্তত পক্ষে প্রতি মাসে একবার তাদেরকে নিয়ে ইসলামিক স্টাডী সার্কেল করতে পারি, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গ্রুপ স্টাডি করতে পারি।

পঞ্চমত ঃ এরপর আসে আমার বান্ধবী, সহকর্মী, দূরের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা। এদের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেভাবে যাকে পারা যায় সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। নিজে যে সত্যের সন্ধান লাভ করেছি তা

তাদের কাছেও পৌঁছানো আমার নৈতিক দায়িত্ব। কেউ আমার কথা শুনুক আর নাই শুনুক - এদের সামনে আমার নৈতিক চরিত্রের নমুনা তুলে ধরতে হবে। এভাবে দিনে দিনে তাদের জীবনে ইসলাম সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা ও এর পথের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। তবে কুরআনের আদেশ অনুযায়ী পরপুরুষের সাথে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে যদি সে আমার আত্মীয় বা সহকর্মীও হয়।

ষষ্ঠত ঃ প্রতিনিয়তই আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ অন্যে কী করল না করল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সমালোচনা নিজে করতে হবে। যেমন, ধরি আমার নিজের মধ্যে কী কী সমস্যা আছে? কীভাবে এই সকল সমস্যাগুলো দূর করা যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায় ইত্যাদি। এতে দেখা যাবে দিন দিন আমার নিজের চারিত্রিক মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি নিজেও সকল কাজ করে তৃপ্তি পাচ্ছি। আমার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের নিকটও আমি ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠেছি।

প্রশ্ন ঃ ৬৪) একজন নারী হিসেবে আখিরাতে আমার মুক্তির উপায়গুলো কি কি?

উকবা ইবন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে উপস্থিত হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে, মুক্তির উপায় কী, তা বলে দিন। উত্তরে তিনি বললেন তোমার জিহবা তোমার আয়ত্তে রাখ, তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর এবং নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কান্নাকাটি কর। (জামে আত তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মুক্তির উপায় কী, জিজ্ঞাসা করা হলে রসূলে কারীম ﷺ যে তিনটি উপায় ঘোষণা করলেন তার ব্যাখ্যা হলো --

১ম - নিজের জিহবা সংযত রাখা ঃ জিহবাকে নিজ আয়ত্বে রাখা এবং সঠিক আদর্শানুযায়ী উহাকে ব্যবহার করা। অন্য কথায় মুখে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন কথা উচ্চারণ না করা। বস্তুত জিহবা নিজের কন্ট্রোলে না থাকার দরুন মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত যে বিপর্যয় ও ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়েছে, তার কোন শেষ নেই; পক্ষান্তরে একে সংযত রাখলে, সঠিক আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় একে ব্যবহার করলে কত যে বিপদ, গণ্ডগোল ও তিক্ততা হতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় তারও হিসাব নেই। জিহবা

সংযত না থাকলে, তিক্ত কথা বলার অভ্যাস থাকলে কত মানুষের হৃদয় তার জিহবা-তরবারির বিষাক্ত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় তা বলে শেষ করা যায় না। এজন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ নানাভাবে ও নানা প্রসঙ্গে জিহবাকে সংযত করার নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। বিশেষত সভ্য সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই এটা বিশেষ কর্তব্য -- এটাই ইসলামী জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য।

২য় - নিজের ঘর সব সময় উদার, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রাখা ঃ যখনই কোন মেহমান আসবে, সে যেন ইসলামী সমাজের কোন ব্যক্তিরই ঘরের দ্বারদেশ হতে প্রতিহত ও বঞ্চিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য না হয়। বরং যেন সেই ঘরের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করতে পারে। মুসলিম মুসলিমের নিকট যাবে এটা স্বাভাবিক; কিন্তু একজন মুসলিম অপর একজনের কাছে গিয়ে যদি সম্বর্ধনা না পায় তাহলে সামাজিক জীবনে নিবিড় ঐক্য, বন্ধুত্ব, ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে না।

তবে সতর্কতা - অবশ্যই আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দার কথা এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। মেহমানদারী বা family get-together-এর নামে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করা যাবে না। প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার সময় নারী পুরুষ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। স্বামী বাসায় না থাকলে স্বামীর কোন বন্ধু বা কোন পরপুরুষকে বাসায় মেহমানদারী করার কোন প্রয়োজন নেই এবং ইসলাম এটা কোনভাবে অনুমোদন দেয় না। ঠিক একইভাবে স্ত্রী বাসায় না থাকলে স্ত্রীর বান্ধবী বা কোন পরনারীকে বাসায় মেহমানদারী করারও কোন প্রয়োজন নেই। তবে একজন আরেক জনের বাসায় যাওয়ার আগে অবশ্যই ফোনে যোগাযোগ করে appointment করে যাওয়া উচিত।

৩য় - নিজ কৃতকর্মের জন্য চোখের পানি ঝরানো ঃ নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি, দোষ, অধঃপতন মানুষেরই হয়ে থাকে এবং মানুষ যদি অনুতপ্ত হয় তবে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু কেউ যদি পাপ করে কিন্তু সেজন্য অনুতপ্ত না হয়, অন্যায়কে অন্যায় মনে না করে, পাপ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে তবে তা চরম অপরাধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর নিকট শিরক ছাড়া সব অপরাধেরই ক্ষমা আছে; কিন্তু হয়ত ক্ষমা নেই এই ধরনের অপরাধের। কাজেই প্রত্যেক ঈমানদার মানুষেরই উচিত নিজ অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, নিজ গুনাহের জন্য

আল্লাহর নিকট সর্বক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই ক্ষমা প্রার্থনাও কৃত্রিম হওয়া উচিত নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করা ও চোখের পানি ঝরানো অপরিহার্য।

প্রশ্ন ঃ ৬৫) নারীদের অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কথা ও কাজ পরিহার করা উচিত কেন?

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামী জীবনযাপনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ইহাই হতে পারে যে, সে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কথা ও কাজ পরিহার করে চলবে। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যে কাজ বা কথার কোন অর্থ হয় না, যার কোন সার্থকতা নেই, ফল নেই, ফায়দা নেই, দুনিয়া আখিরাতে কোন দিক দিয়েই যার কোন উপকারিতা নেই, এমন কাজ করা ঈমানদার মুসলিমের উচিত নয়। এ ধরনের সকল কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখাই কর্তব্য। কেননা মুসলিমদের জীবনযাপনের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা নিষ্ফল ও বেকার কাজে অতিবাহিত করা একেবারেই অনুচিত। কাজেই প্রতিটি মুসলিমের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সুফলদায়ক কাজে ও কথায় কাটানো কর্তব্য। মানুষকে আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার মধ্যে মানুষের জীবনকালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত কীভাবে কাটানো হয়েছে তা অন্যতম। অতএব প্রত্যেকটি মুহূর্তই যাতে আল্লাহর সন্তোষ এবং কোন না কোন সুফলজনক কাজে ব্যয়িত হয়, সেজন্য সচেতন ও সর্তক হয়ে থাকাই প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ ৬৬) নারীর প্রটেকশন বলতে কি বুঝায়?

ঘর আর বাহির নিয়ে সংসার। কুরআন পুরুষকে দিয়েছে বাইরের কাজের দায়িত্ব আর স্ত্রীদেরকে দিয়েছে ঘরের কাজের দায়িত্ব। তাই পরিবারের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাদ্য ও সম্পদ আহরণ ইত্যাদির দায়িত্ব পুরুষের। ঘরের কাজ বলতে গৃহিনীর দায়িত্ব সন্তান জন্ম, লালনপালন এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ। শারীরিক বৈশিষ্ট্য মানসিক দিক দিয়ে পুরুষ বাইরের কাজের জন্য আর নারী ঘরের কাজের জন্য উপযোগী, এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ঘরের কাজ বড় না বাইরের কাজ বড় এ তর্ক অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয়। ঘরের কাজকে ছোট মনে করা ঠিক নয় আর স্ত্রীদের কাজ করার অর্থ দাসীবৃত্তি নয় বরং পরিবার তথা স্বামী সন্তানের কল্যাণে

নিজেকে নিযুক্ত করা। বলতে গেলে বাইরের কাজ থেকে ঘরের কাজে বেশী অধ্যাবসায় ও মনোযোগ দিতে হয়। বিভিন্ন সমাজে স্ত্রীকে দাসী মনে করা হয় তা সত্য কিন্তু ইসলামের বেলায় এ কথা মিথ্যা। মুসলিম পুরুষদের স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার অত্যন্ত গুনাহের কাজ বলে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

পর্দা মেয়েদেরকে ছোট করার জন্য নয় বরং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। মেয়েদের গোটা শরীরটাই আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কামনার বস্তু করে গড়েছেন তাই তাদের পর্দার সীমানা ব্যাপক। মেয়েরা সাধারণতঃ পুরুষদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় না বা চেয়ে থাকে না বরং পুরুষরাই তা করে থাকে তাই মেয়েদেরকেই পর্দা করতে হয় এটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ঃ ৬৭) মা-বোনদের পর্দা সম্পর্কে কী ভাবনা হওয়া উচিত?

মা-বোনেরা কী পোশাক পরে বাড়ীর বাইরে আসবেন সেটা তাদের ভাবতে হবে। একথা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং এটা শুধু সে সকল মা-বোনদের জন্য প্রযোজ্য যারা নিজেদের মুসলিম মনে করেন। যারা মুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন এবং যাদের ভাল নাম কুরআন হাদীসের ভাষায়ই রাখা হয়েছে (ডাক নামটা যতই অনৈসলামী হোক) তারা সবাই নিজেকে মুসলিমই মনে করেন। কিন্তু নামে ও মনে মুসলিম হলেও হয়তো মুসলিম জীবন গড়ে তুলবার সুযোগ সবাই পাননি। যদি কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি মুসলিম না হিন্দু বা খৃষ্টান, তাহলে তারা রীতিমতো ক্ষেপে যাবেন। কারণ, তারা নিজেকে মুসলিম বলেই বিশ্বাস করেন এবং এ জাতীয় প্রশ্ন করাটাকেই অপমানজনক মনে করেন। এরা সত্যি মনে-প্রাণে মুসলিম।

প্রশ্ন ঃ ৬৮) ইসলাম নারীদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং নারীদের আলাদা রাখতে চায়?

কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেন পুরুষ এবং নারীদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দু'টি সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সে দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র। এফ.বি. আই (FBI) ১৯৯০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হল

কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হল ৬,৪০,০০০ নারী যারা ধর্ষিতা হয়েছে। সংখ্যাটিতে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিদিন ১,৭৫৬ জন নারী আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ধর্ষিতা হয়। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) ১.৩ জন প্রতি মিনিটে ধর্ষিতা হয়। আমরা কি জানি, কেন? আমেরিকা নারীদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যার ৫০% কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হল ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন একশত বিশটি ধর্ষণ করলে ধরা পড়ার আকাঙ্খা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে একবার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না চেষ্টা করবে। আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আছে–"ধর্ষণের জন্যে যাবতজীবন কারাদণ্ড, যদি ১ম বার ধরা পড়ে তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।"

যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসাব করা হয়, তাহলে প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি হয়ে দাঁড়াবে। একটি সহজ প্রশ্ন যদি করা হয় ঃ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সকল নারী হিজাব পড়েন তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝা উচিত। যেখানে নারীরা হিজাব পড়তে এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডকে কি আমরা বর্বর আইন বলতে পারি?

প্রশ্ন ঃ ৬৯) পর্দার উদ্দেশ্য কি?

ইসলামে যে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, তা সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা তার তিনটি উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারি ঃ

প্রথমত ঃ নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত করা এবং নরনারীর অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সবের প্রতিরোধ করা।

দ্বিতীয়ত ঃ নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাঙ্গনে বা যে কোন চলার পথে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা, যেন প্রকৃতি নারীর উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা সে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করা। কারণ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যত ব্যবস্থাই রয়েছে, তার ভেতর পারিবারিক ব্যবস্থা শুধু অন্যতমই নয়; বরং এ হচ্ছে গোটা জীবন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ।

প্রশ্ন ঃ ৭০) পর্দার মূল লক্ষ্য কি?

পর্দার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে পুরুষের অনভিপ্রেত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। এ কারণেই আল-কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বৃদ্ধাদের প্রতি কারো আকর্ষণ থাকে না বরং তাদের প্রতি মা, দাদী ও নানীদের মতো শ্রদ্ধাবোধ এমনিতেই এসে যায়। নারীদের চেহারা সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

পুরুষদের থেকে মেয়েদেরকে যেমন পর্দা করতে বলা হয়েছে অনুরূপভাবে মেয়েদের থেকেও পুরুষদেরকে পর্দা করতে বলা হয়েছে। কারণ কোনো নারীকে দেখে যেমন কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে তেমনি কোনো নারীও কোনো পুরুষকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে। একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ তেমনি একজন নারীর জন্য আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখাও পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ নিয়ে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। একজন নারীর জন্য একজন পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া যেমন পাপ, নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমের সামনেও বেপর্দা হওয়া তেমনি পাপ।

যেমন আজকাল আমাদের দেশে দেবর, ভাশুর, ভগ্নিপতি, খালাতো, চাচাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইদের সামনে মেয়েরা বেপর্দা হওয়াকে পাপ মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সাথে আরও বেশি পর্দা করা উচিত। কারণ এ ধরনের নিকটাত্মীয় গায়ের মুহররমদের দ্বারা আরও বেশি বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের সমাজে কতিপয় পর্দানশীন পরিবারেও পর্দার মূল লক্ষ্য অনুধাবন করতে না পেরে পর্দার কার্যক্রমে উল্টাপাল্টা করে ফেলেন। অনেক পরিবারের নারীরা নিজেরা বোরকা পরে পর্দা করে বের হন অথচ তাদের যুবতী মেয়েরা তাদেরই সাথে আকর্ষণীয় পোশাকে বেপর্দায় বের হয়। অনেকের ভুল ধারণা এমন যে, বয়স হলেই শুধু পর্দা করতে হয়। যেমন ঃ

পুরুষদের মধ্যে ভুল ধারণা যে, বয়স হলে দাড়ি রাখতে হয়, যুবক বয়সে প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ ৭১) মুসলিম নারীদের পর্দা করার নির্দেশ কোথায় এসেছে?

ইসলাম নারীদের জন্য এমন সব নিয়মনীতি ও বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, যা পালন করলে একজন নারী তার পবিত্রতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়, সতীত্ব ঠিক থাকে এবং ইজ্জত সম্মান রক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা নারীদের পর্দা করার নির্দেশ দেন, তাদের ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তাদের নগ্ন-পর্দাহীন, সুগন্ধি লাগিয়ে ও সেজেগুজে ঘর থেকে বের হতে ও কোথাও সফর করতে নিষেধ করেন। এছাড়াও নারী পুরুষের এক সাথে মেলামেশা, তাদের সাথে পর্দাহীন কথাবার্তা থেকে নিষেধ করেন। আর এসব আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে নারীরা তাদের নিজেদেরকে ফিতনা-ফ্যাসাদ, অশ্লীল কার্যকলাপ ও দুষ্ট লোকের কবল হতে রক্ষা করতে পারে। তাদের সতীত্বের উপর যাতে কোন প্রকার আঘাত না আসে। আর এভাবেই ইসলাম দিয়েছে নারীর প্রকৃত নিরাপত্তা।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েরা নিজেদের কাপড়কে (পোশাক বা বোরকা) কতটুকু নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিবে? তার উত্তরে রসূল ﷺ বলেছেন, 'তারা স্বীয় পদতালুর সামনে অর্থাৎ গোড়ালীর নিচে রেখে কাপড় পরবে। 'উম্মুল মু'মিনীন পুনঃ প্রশ্ন করলেন যে, যখন তারা লম্বা কদমে হাঁটবে? (তখন কাপড় তো উঠে যাবে, সে সময় কি করবে?) উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, 'তারা কখনও এক হাতের বেশী লম্বা কদমে হাঁটবে না।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

পর্দা তথা হিজাবের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের পর আমরা যারা নিজস্ব জ্ঞান প্রকাশ করতে চাই, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের নির্দেশ কিংবা ফায়সালা করে দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার নেই। আর যে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য (নাফরমানী) করবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৬)

প্রশ্ন ঃ ৭২) পর্দা নারীদের জন্য কেন পবিত্রতা?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পর্দা করাকে পবিত্রতার শিরোনাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"হে নাবী, আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের জিলবাবের এক অংশ তাদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। এটাই বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান"। (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)*

আর বৃদ্ধ নারী যাদের যৌবনের হ্রাস পেয়েছে এবং তারা বিবাহের আশা করে না, তাদের জিলবাব ব্যবহার না করা, চেহারা ও কবজি-দ্বয় খোলা রাখা দ্বারা ফিতনার আশংকা থাকে না তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন পর্দা করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, *আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্যে কোন অপরাধ (গুনাহ) নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর ঃ ৬০)*

প্রশ্ন ঃ ৭৩) মুসলিম নারীদের পোশাক কেমন হবে?

যদি নিজেকে মুসলিম মনে করি এবং মুসলিম পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ না করি তা হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, আল্লাহ ও রসূল ﷺ মুসলিম নারীদের পোশাকের জন্য কী কী বিধান দিয়েছেন। যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের সামনে যে পোশাক পরে চলাফেরা করা যায় সে পোশাক পরে অন্যদের সামনে যাওয়া যাবে না। যেমন পিতা, শ্বশুর, আপন ভাই, আপন চাচা, মামা প্রমুখ আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম। তাই তাদের সামনে শুধু সতর ঢেকে চলাই যথেষ্ট। অন্য সবার সামনে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৭৪) সতর কী?

সতর একটি ইসলামী পরিভাষা। এ শব্দটির অর্থই হলো -- গোপন করা বা ঢেকে রাখা। শরীরের যে অংশটুকু পুরুষ বা নারীর উভয়েরই সবসময়ের জন্য ঢেকে রাখতে হয় তাকে সতর বলে।

প্রশ্ন ঃ ৭৫) পুরুষের সতর কতটুকু?

পুরুষের সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা। স্ত্রী ছাড়া আর সব লোকের দৃষ্টি থেকে এটুকু ঢেকে রাখা ফরয। এটুকু ঢাকা না হলে পুরুষের সলাতই হবে না।

প্রশ্ন ঃ ৭৬) মেয়েদের সতর কতটুকু?

রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হাত দিয়ে সতরের সীমা দেখিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের পুরো চেহারা (চুলের গোড়া থেকে থুতনী এবং এক কানের লতী থেকে অন্য কানের লতী পর্যন্ত যেটুকু ওযূ করার সময় ধোয়া ফরয), দু'হাতের আংগুল থেকে কবজির উপর পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু থেকে আংগুল পর্যন্ত - এ তিনটি অংশ ছাড়া বাকী সমস্ত শরীরই সতরের অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের সতর না ঢাকলে সলাত শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ ও রসূল ﷺ নারীদের জন্য সতরের যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন তা জানার পর আমাদেরকে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৭৭) পর্দার যুক্তি কি?

যৌন বিজ্ঞান একথা বলে যে পুরুষের যৌন ক্ষুধা নারীদের তুলনায় অনেক বেশী। শুধু তাই নয় পুরুষের যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত ত্বরিত। নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই পুরুষের মধ্যে যৌন চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু নারীদের বেলায় অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছাড়া সাধারণতঃ নারীদের যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। নারী দেহের প্রতিটি অংগ পুরুষের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলেই বেপর্দা নারী দেখলে পুরুষকে তার যৌন চেতনা দমন করতে বেগ পেতে হয়। স্রষ্টা নারীকে এতটা আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন বলেই তার সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭৮) পর্দার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিগুলো কি কি?

সূরা আল জারিয়ার ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ *"এবং প্রত্যেকটি জিনিসকে আমি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা স্মরণ করো।"*

অর্থাৎ তোমরা যেন এর উপর চিন্তা-গবেষণা করে আল্লাহর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার কথা তোমাদের স্মরণে সদা জাগ্রত রাখতে পারো। আল্লাহ প্রাণীকুল, গাছপালা,

ফল-ফলাদিসহ সবকিছুকেই যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন তা বলতে গিয়ে আল-কুরআনে মোট ৭৬ টি আয়াত নাযিল করেছেন।

মানুষ বা প্রাণীকুল ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মধ্যে আল্লাহ যে জোড়া সৃষ্টির কথা বলেছেন তার থেকে পর্দার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় কি না একটু খুঁজে দেখি। আল্লাহর কথা অনুযায়ী যখন সবকিছুর মধ্যেই জোড়া আছে তখন তড়িৎ বা বিদ্যুতের মধ্যে জোড়া আছে। এই জোড়ার একটাকে আমরা বলি 'পজিটিভ' ও অন্যটাকে বলি 'নেগেটিভ' যার একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীর ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখবো এদের মধ্যে কোনো পর্দা সিস্টেম আছে কী নেই।

আজ যেহেতু ইলেক্ট্রনিকসের যুগ তাই প্রায়ই দেখি কখনো কোথাও যদি কোনো নেগেটিভ ও পজিটিভ তার কোনোভাবে একটা আরেকটাকে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুন ধরে যায়। অর্থাৎ বিদ্যুতের মধ্যে যে পর্দাপ্রথা চালু রয়েছে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হলেই তাতে আগুন লেগে যায়।

আমরা সাধারণতঃ মাইকে কথা বলার সময় দেখি এমপ্লিফায়ার থেকে দু'টি তার এসে মাইক্রোফোনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ঐ দুইটা তারের গায়ে রাবারের কটিং (পর্দা) দেয়া রয়েছে। যদি পথিমধ্যে দু'টি তারের কটিং (পর্দা) ছিঁড়ে যায় কিংবা যদি রাবারের কটিং (পর্দা) ফেলে দিয়ে দু'টিকে একত্র করে দেয়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাল্ব কেটে যায় এবং মাইক নষ্ট হয়ে যায়। মাইকের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কিন্তু মাইক্রোফোন নামক ছোট্ট অন্ধকার ঘরটির মধ্যে যখন দু'টি তারই প্রবেশ করে তখন দু'টি তারের মাথা একত্রে সংযোগ প্রয়োজন হয়, আর সেটা না হলেও মাইকের মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই ছোট উদাহরণ থেকেও আমরা দেখলাম পর্দা ছাড়া বিজ্ঞানের থিওরী অচল। অর্থাৎ যে পর্দা বিজ্ঞানে সেই পর্দাই ইসলামে।

প্রশ্ন ঃ ৭৯) পর্দার সংজ্ঞা কি?

পর্দা (হিজাব বা জিলবাব) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবরণ বা অন্তরাল যাকে ইংরেজীতে বলে Cloak covering the whole body. আর ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই হিজাব বা পর্দা। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই পর্দা করা ফরয। পর্দা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

"যারা চায়, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াক, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।" (সূরা আন নূর ঃ ১৯)

প্রশ্ন ঃ ৮০) অনেকে বলে থাকেন মনের পর্দাই বড় পর্দা, মন ঠিক থাকলে সব ঠিক, বাহ্যিক পর্দার প্রয়োজন নেই। এই উক্তি কতটুকু যুক্তি সঙ্গত?

মনের পর্দা অবশ্যই বড় পর্দা। সবার আগে মন পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। তবে মনের পর্দার পাশাপাশি দৈহিক পর্দারও প্রয়োজন আছে আর এটি আল্লাহর তরফ থেকে নারীদের জন্য বিশেষ নিয়ামত এবং সেই সাথে ফরয হুকুম। কেউ কেউ খুব গভীরভাবে ভেবে না দেখেই অনেক সময় বলে থাকেন যে মন পবিত্র থাকলে সব ঠিক, বাহ্যিক পর্দার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় মনের পবিত্রতাই পবিত্রতা সেহেতু ওযূ করার প্রয়োজন নেই, তাতে কী সলাত হবে? হবে না। আসুন একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি আমার মন পবিত্র, আমি কোন পরপুরুষের দিকে তাকাচ্ছি না কিন্তু পরপুরুষরা তো আমার রূপ-সৌন্দর্য প্রাণভরে দেখছে। এতে তারা আমার কারণে কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হচ্ছে সেই সাথে আমিও গুনাহগার হচ্ছি। কেউ হয়তো বলতে পারে যে কুরআনে আল্লাহ *"মু'মিনদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে"*, কিন্তু এই দুনিয়ায় কয়জন মু'মিন! এবং অমুসলিমরাও তো আমাকে দেখছে, তারাতো আর কুরআন-হাদীস মানে না।

প্রশ্ন ঃ ৮১) আমি সলাত আদায় করি, সিয়াম পালন করি, যাকাত দেই, হাজ্জ করেছি, দান-সদাকা করি, সৎভাবে জীবনযাপন করি, অন্যের অনিষ্ট করি না। তারপরও কি পর্দা করাটা জরুরী?

উপরের যে কাজগুলো আমি নিয়মিত করছি আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো সবই ভাল কাজ এবং এই কাজগুলো আমি বুঝে করি আর না বুঝে করি তা সবই আল্লাহর ফরয হুকুম। ঠিক তেমনি সলাত-সিয়ামের মতো পর্দাও আল্লাহর একটি ফরয হুকুম। আর আমরা জানি যে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর ফরয হুকুম কোনটাই অবহেলা করা যাবে না। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ প্রতিটি ফরয কাজের হিসাব আলাদা আলাদা করে নিবেন, কোনটা থেকেই মাফ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ ৮২) আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর ভালবাসাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ঠ, তাই বলে কি পর্দার প্রয়োজন আছে?

আগের প্রশ্নের উত্তরেই আমরা জেনেছি যে সলাত-সিয়ামের মতো পর্দাও আল্লাহর একটি ফরয হুকুম। আর আমরা জানি যে মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ফরয হুকুম কোনটাই অবহেলা করার কোন উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ যেমন ঃ কোন একজন কর্মচারী যদি বলেন, আমি আমার বসকে খুব ভালোবাসি, বসের কথার উপর আমল করার দরকার নেই, বরং বিনা আমলেই বসের সন্তুষ্টি মিলে যাবে! অবশ্যই না, বরং চাকুরী চলে যেতে পারে, শাস্তিও হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর হুকুম পর্দা করতেই হবে, আর তা লংঘন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কোনভাবেই পাওয়া যাওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ ৮৩) কোন কোন বোনেরা বলেন যে, গরমের জন্য পর্দা করা যায় না। গরম কি পর্দা করার জন্য অন্তরায়?

এটা অবশ্যই শিকার করতে হবে যে গরমের দিনে বা গরমের দেশে পর্দা করাটা খুবই কষ্টকর। গরমের মধ্যে যে মা-বোনরা পর্দা করেন তারা এটার মর্ম বুঝেন। আর আলহামদুলিল্লাহ মা-বোনদের এটা যে কত বড় sacrifice তার জন্য তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদাবান। মা-বোনদের সান্ত্বনার জন্য বলছি, দেখুন পুলিশ বা আর্মিরা চাকুরীর জন্য মোটা পোশাক পরিধান করে রোদে কর্মরত থাকে। এভাবে পুলিশ-আর্মিরা যদি দুনিয়ার চাকুরীর খাতিরে তা পারে, তাহলে আমি তো করছি আমার মহান প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে, আর এর জন্য রয়েছে আখিরাতে মহাপুরষ্কার। তাই ধৈর্যধারণ করি। পুলিশ-আর্মির যেমন মোটা পোশাক গরমে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি আমার পোশাকটিও একদিন অভ্যেসে পরিণত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

প্রশ্ন ঃ ৮৪) কেউ কেউ একথা বলেন যে, পর্দা করলে মাথা ব্যাথা করে। এটি কতটুকু যুক্তি সংগত?

এটা সত্যি যে অনেকের প্রচন্ড গরম থেকে মাথা ব্যাথা শুরু হয় আর পর্দা করলে হয়তো সেটা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। যাহোক, যাদের এমন অবস্থা হয় তাদের জন্য আমরা দু'আ করি এবং তারা নিজেরাও যেন এই সমস্যার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। কারণ পর্দা আল্লাহর ফরয হুকুম, আর

প্রত্যেকের আমলের হিসাব প্রত্যেককেই দিতে হবে, এর জন্য কোন প্রকার ছাড় নেই। তাই এই ফরয কীভাবে পালন করা যায় তার জন্য নিজেদেরকেই একটি সুন্দর সমাধান বের করে আনতে হবে। তবে যাদের মাথা ব্যাথার সমস্যা আছে তাদের অবশ্যই উচিত এ ব্যাপারে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা। মনে রাখতে হবে আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হচ্ছে আমি আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা পালন করে ইবাদতের মধ্যে শামিল আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন ঃ ৮৫) কেউ পর্দা করেন না লজ্জায় এবং মানুষের উপহাসের ভয়ে। কারণ পর্দা করলে অন্যেরা আনস্মার্ট বা ব্যাকডেটেট ভাবতে পারে। এ থেকে উত্তরণের উপায় কি?

আল্লাহ নারীকে যে সৌন্দর্য দান করেছেন, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং তা কেবল তার নিজের জন্য এবং স্বামীর জন্যই সু-নির্দিষ্ট। সেই অমূল্য সম্পদ (সৌন্দর্য) লোকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ না করাইতো প্রকৃত স্মার্টের কাজ। তাই এই অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ করতে লজ্জা কোথায়? পর্দা করার কারণে প্রথম প্রথম আমার কাছে আনস্মার্ট বা ক্ষেত মনে হতে পারে কিন্তু এক সময় দেখা যাবে আমার মনে প্রকৃত শান্তি ফিরে এসেছে কারণ আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করছি। আসলে যারা পর্দা করেন তাদেরকে সবাই খুবই সম্মানের চোখে দেখেন। যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে পর্দানশীনদের এখন আর কেউ আনস্মার্ট বা ক্ষেত ভাবেন না।

প্রশ্ন ঃ ৮৬) কেউ কেউ বলেন, যখন বৃদ্ধা হবো তখন পর্দা করবো। এর যুক্তি কি?

যারা এমন বলেন তারা হয়তো খুব গভীরভাবে চিন্তা করে বলেন না। আমরা এই বইয়ের উপরের প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকি তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে পর্দার আসল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী? মহান আল্লাহ তা'আলা কাদের উপর এই পর্দা ফরয করেছেন আর কেনই বা ফরয করেছেন? একজন কম বয়সী নারীর রূপসৌন্দর্য দেখে একজন পরপুরুষের যে ক্ষতি হবে তা কোন বৃদ্ধাকে দেখে হবে না। আর এতে সকল পরপুরুষ রক্ষা পাবে সেই সাথে সমাজও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক পুনরায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তা হলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যে মঙ্গলময়। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন।" (সূরা নূর ঃ ৬০)

প্রশ্ন ঃ ৮৭) আবার কোন কোন অবিবাহিতাগণ বলেন পর্দা করবো বিবাহের পরে, এখন না। এর যুক্তি কি?

আসলে এটা আমাদের দেশের একটা কালচার, আমরা ছোটবেলা থেকে পর্দা করার পরিবেশ স্কুল বা নিজ বাড়ি থেকে পাই না এবং যখন বুঝতে শিখি তখন একা একা পর্দা করতেও লজ্জাবোধ করি। তাই বিয়ের পর স্বামী যদি চান তখন অনেকে পর্দা করা শুরু করি। আসলে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে পর্দা প্রাপ্তবয়স্কা হলেই করতে হয়। তাই পারিবারিকভাবে প্রতিটি বাড়িতে পর্দার পরিবেশ গড়ে উঠা উচিত এবং প্রতিটি বাবা-মাকে এজন্য সচেতন হওয়া উচিত। যদি কেউ এমন ভাবেন যে এখন মোটামুটি এভাবে চলি বিয়ের পর না হয় পুরোদমে পর্দা শুরু করব। কিন্তু আমি এখন বেঁচে আছি, আর আমার কি এক মিনিটেরও ভরসা আছে? এক মিনিট তো দূরের কথা এক সেকেন্ডেরও ভরসা নেই! তাহলে বিবাহের পরে পর্দা করার কী নিশ্চয়তা আছে? তাই পর্দা সলাত-সিয়ামের মতোই ফরয, যখন থেকে পর্দা ফরয হয়েছে তখন থেকে পর্দা না করার কারণে গুনাহগার হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৮৮) কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ পুরুষের উপর পর্দা ফরয না করে, কেবল নারীদের উপরে করে যুলুম করেছেন। একথার যুক্তি কতটুকু?

পর্দা কেবল নারীর উপরেই ফরয নয়, বরং পুরুষের উপরেও ফরয- তাই তো আল্লাহ সূরা আন নূরের ৩০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

"হে নাবী! মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন ....।" (সূরা আন-নূর ঃ ৩০)

প্রশ্ন ঃ ৮৯) কেউ কেউ হয়তো বলেন যে, পর্দানশীন মেয়েদের চরিত্র খারাপ, অতএব পর্দার দরকার নেই, এভাবেই ভাল আছি। এটি কি আদৌও সত্য?

এটা ঠিক যে আমাদের দেশে কিছু অসাধু নারী পর্দার নাম করে নানা রকম অন্যায় কাজ করেন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আসলে তারা পর্দাটাকে ব্যবহার করে অবৈধ কাজ করার জন্য, সেই জন্য পর্দার কোন দোষ নেই। পর্দাতো আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধান। ধরুণ কেউ 'মোবাইল ফোন' ব্যবহার করে ছিনতাই করার কাজে আর কেউ ব্যবহার করে ব্যবসায়িক কাজে। তাই বলে তো 'মোবাইল ফোনকে' দোষ দেয়া যাবে না। একজন অন্যায় করেছে বলে সবাইকে এক পাল্লায় না মাপাই উচিত। যার যার আমল তার তার কাছে। অনুরূপ যার যার হিসাবও তার তার নিকট।

প্রশ্ন ঃ ৯০) আবার অনেকে সাধারণত পর্দা করেই চলেন কিন্তু যখন কোন পার্টিতে বা অনুষ্ঠানে যান তখন পর্দা ছেড়ে দেন। এই কাজটা কি ঠিক?

এই চিত্র খুবই কম দেখা যায়। তিনি হয়তো মনে করেন এই অনুষ্ঠানে কেউ পর্দা করে আসবে না, আমি একা করলে কেমন দেখায় এবং আমার হাজবেন্ডের বন্ধুরাই বা কী ভাববেন! এছাড়া তিনি নিজের অজান্তে এসব অনুষ্ঠানে পর্দা ছেড়ে দিয়ে সাজসজ্জার মাধ্যমে একধরণের ইনডাইরেক্ট প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পরেন এবং পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ হন। আসলে সবকিছুর মূলে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। আমি পর্দা কেন করবো বা কার ভয়ে করবো সেটা যদি আমার কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলে আর কোথাও পর্দা করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না। তাই মহান আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয করে দিয়েছেন।

বিশেষ অনুরোধ ঃ ইসলামকে বুঝতে হলে অবশ্যই কিছু পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে, রসূল ﷺ -এর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে হবে, এবং Islamic way of life সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৯১) নারীদের পর্দার শর্তগুলো কি কি?

ক) হিজাব (পর্দা) হবে এমন লম্বা কাপড় যা পুরো শরীরটাকে ঢেকে দিবে।
খ) হিজাব হবে মোটা কাপড়ের যার মধ্যদিয়ে মেয়েলি শরীরের কোন কিছু দেখার বা বুঝার কোন আশঙ্কা থাকবে না।
গ) কাপড় হবে সাধারণ, কারুকার্য বিহীন।
ঘ) সংকীর্ণ বা চিকন হবে না বরং প্রশস্ত ও মোটা হবে যাতে করে হিজাব পরিহিতার শরীরের গঠন আকৃতি পরিলক্ষিত না হয়।
ঙ) পোশাকটি প্রসিদ্ধ হবে না।
চ) সুগন্ধিময় হতে পারবে না।
ছ) রঙিন হবে না (আকর্ষণীয় রংয়ের হবে না)।
জ) পুরুষদের ব্যবহৃত পোশাকের অনুরূপ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ৯২) নারীদের পর্দা কি আকর্ষণীয় হতে পারবে?

উপরের কুরআনের শর্তানুযায়ী পর্দা আকর্ষণীয় বা প্রসিদ্ধ হওয়া যাবে না। যেমন বোরকা বা স্কার্ফ আকর্ষণীয় কারুকার্য খচিত বা ডিজাইনের হওয়া যাবে না যাতে করে কোন পুরুষের দৃষ্টি কোন নারীর দিকে পরতে পারে এবং তার মনে কোন প্রকার চিন্তার সুযোগ দেয়া যাবে না, কেউ যেন মনে মনে বলতে না পারে "ওয়াও খুব সুন্দর লাগছে তো !"

প্রশ্ন ঃ ৯৩) বুকের উপর কি মোটা ওড়না বা চাদর দিতেই হবে? কেন?

কুরআনে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বলা হয়েছে নারীদের বুকের উপর সাধারণ ওড়না ছাড়াও অতিরিক্ত মোটা চাদর জাতীয় ওড়না ব্যবহার করতে হবে যেন কোনভাবেই তার বুক বোঝা না যায়।

"আর মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে চলে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর যেন তারা নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়না ফেলে রাখে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

"হে নাবী, আপন বিবি, কন্যা ও মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমন্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এতে করে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তাদের উত্যক্তও করা হবে না।" (সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৯)

প্রশ্ন ঃ ৯৪) নারীরা কি সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যেতে পারবে?

এমন কোন আকর্ষণীয় পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহার করা উচিত নয় যার কারণে (মিষ্টি ঘ্রানে) পরপুরুষের দৃষ্টি কোন নারীর দিকে গিয়ে পরতে পারে এবং তাকে নিয়ে মনে মনে কোন চিন্তা করতে পারে। তবে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধও যেন না বের হয়। তাই সতর্কতাস্বরূপ কম ঘ্রানের ডিউডেরন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নারী বান্দাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে না আসে।" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, "যেই নারী সুগন্ধি লাগিয়ে ঘরের বাইরে লোকদের কাছে যাবে এই উদ্দেশ্যে যে লোকেরা সেই সুগন্ধি পাবে, সেই নারী যিনাকারিণী বলে গণ্য হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

প্রশ্ন ঃ ৯৫) নারীরা কি পরচুলা বা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করতে পারবে?

ঐ নারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুরা লাগায়। ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা প্রস্তুত করে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

জনৈক নারী রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি মেয়ের বসন্ত উঠেছিল। এতে ওর চুল ঝরে পড়ে গেছে। এখন সে বধূ হতে যাচ্ছে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা জুড়ে দেবো? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে নিজে পরচুলা লাগায় এবং যে তা লাগিয়ে দেয় তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ সেসব নারীদের উপর লানত করেছেন, যারা হাত অথবা দেহের অন্য কোনো অংশে ছিদ্র করে অথবা দাঁত কেটে কেটে ধারালো করে। অথবা আসল চুলের সাথে নকল চুল লাগায়। এর দ্বারাই উইগ ব্যবহারের বিষয়টি জানা যায় যে, এই কাজ হারাম। কারণ উইগ প্রকৃতপক্ষে আসল চুলের সাথে নকল চুল মিশ্রিত করা এবং চুল ফাঁপিয়ে তোলার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। এ কথাও কারও অজানা নয় যে, উইগ সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এই উইগ হচ্ছে ধোকা এবং প্রতারণার একটি বিষয়। ইসলাম ধোকা, প্রতারণাকে নাজায়িয বলে আখ্যায়িত করেছে। (সহীহ্ বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ৯৬) মেয়েদের ভ্রুর লোম উঠানো বা ভ্রু প্লাক করা কি জায়িয?

রসূল ﷺ সেসব নারীদের উপর লানত করেছেন, যারা ভ্রুর লোম পরিষ্কার করে দৃষ্টিনন্দন করে (সহীহ্ বুখারী) । তাই ভ্রুর লোম তুলে চেহারার সৌন্দর্য বাড়ানো নাজায়িয ।

আলকামা (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) লানত করলেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে (ভ্রু উপড়ে ফেলে) এবং যারা সৌন্দর্য্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয় । তখন উম্মু ইয়াকুব বলল, এটা কেন? আবদুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি কেন তাকে লানত করব না, যাকে রসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন এবং আল কুরআনেও । উম্মু ইয়াকুব বলল, আল্লাহর কসম! আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি কিন্তু এ কথা তো কোথাও পাইনি । আবদুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি তা পড়তে তবে অবশ্যই পেতে যে, *"রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা আকঁড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক" (সূরা হাশর ঃ ৭)* । (সহীহ বুখারী)

http://www.youtube.com/watch?v=9gNevpKwKGs
http://www.youtube.com/watch?v=S9WckQxRwN8&feature=related

প্রশ্ন ঃ ৯৭) মেয়েরা কি মাথার চুলের খোপা উপরের দিকে খাড়া করে বাঁধতে পারবে? বা, সৌন্দয্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগিয়ে কি খোপা বড় করতে পারবে?

না, চুলের সাথে অন্য কিছু জড়িয়ে চুলকে খাড়া করে বেঁধে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাবে না । নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন ঃ

দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী হবে, যাদের আমি আমার যুগে দেখতে পাব না । এক শ্রেণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মত এক ধরনের লাঠি যা দ্বারা তারা মানুষকে পিটাবে । অপর শ্রেণী হল, কাপড় পরিহিতা নারী, অথচ নগ্ন, তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারিণী ও নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট । তাদের মাথা হবে উটের চোটের মত বাঁকা । তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না । এমনকি জান্নাতের সু-ঘ্রাণও তারা পাবে না । অথচ জান্নাতের সু-ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে । (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৯৮) বিনা প্রয়োজনে নারীদের কণ্ঠস্বর পরপুরুষকে কি শুনানো যাবে?

প্রয়োজনে নারীদেরকে পরপুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনই দিয়েছেন। রসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁদের কথার মাধ্যমে লোকদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু যেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই, দ্বীনি কোন উপকার নেই সেই ক্ষেত্রে পরপুরুষের সাথে নারীদের অযথা কথা বলা ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন ঃ নারীদের কণ্ঠস্বর পরপুরুষের কানে যাওয়াকে পছন্দ করা হয়নি বলেই-

- ইসলাম নারীদেরকে আযান দেয়ার কাজে লাগায়নি।
- জামাতে সলাত আদায় করা কালে ইমাম ভুল করলে একজন পুরুষকে 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দিতে বলা হয়েছে এবং একজন নারীকে বলা হয়েছে মুখে কোন শব্দ না করে হাতের উপর হাত রেখে শব্দ করতে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রয়োজনে একজন পরপুরুষের সাথে নারীদের কথা বলতে দোষ নেই। কিন্তু এইক্ষেত্রে কথা বলার ভংগি কেমন হবে তাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় কথা সোজা ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই টেলিফোনে কোন পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- নারীদের চেহারার সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে।
- তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ *"কোমল স্বরে (বা মিষ্টি কণ্ঠে) কথা বলো না, নতুবা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা প্রলুব্ধ হবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)*

প্রশ্ন ঃ ৯৯) মেয়েরা কি সজোরে চলাফেরা ও অলংকার প্রদর্শন করতে পারবে?

মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ *"তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে।"* তাই,

- হাইহিল পরলে সাবধান থাকতে হবে যেন হাঁটার সময় শব্দ না হয়। কারণ এর শব্দ পরপুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে।
- অলংকার ব্যবহার করা যাবে কিন্তু বাইরে প্রদর্শন করা যাবে না এবং অলংকারের কোন ঝনঝনানী শব্দ পরপুরুষের কানে না যায়।

প্রশ্ন ঃ ১০০) পর্দা সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো কি কি?

হিজাব আরবি শব্দ, এর উর্দু অর্থ পর্দা। সঠিক না জানার কারণে আমরা অনেকে হিজাব মানে বুঝে থাকি শুধু মাথার স্কার্ফ, অর্থাৎ মাথাটাকে একটুকরো বিশেষ সুন্দর কাপড় বা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখার নামই হিজাব, আসলে এটা ভুল ধারণা। পর্দার পুরোপুরি অর্থ হচ্ছে উপরের শর্তগুলো। একটা চিত্র অহরহ দেখা যায় যে কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ পরেছে খুব সুন্দর করে কিন্তু নিজের অজান্তে শরীরের গঠন প্রকাশ করে ফেলছে। যেমন-

- ছেলেদের মতো টাইট প্যান্ট পরিধান করেছে যা পাছা, উড়ু এবং পায়ের গঠন সুস্পষ্ট ও আর্কষণীয়ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে;
- এমন শার্ট বা গেঞ্জি পরেছে যা বুকের, পেটের এবং কোমড়ের গঠন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে;
- এমন কাপড় পরেছে যা শরীরের অন্যান্য অংশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে;
- এমন প্যান্ট, জামা বা কামিজ পরেছে যা পিছনের দিক দিয়ে under garment কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ১০১) মেয়েরা কি প্যান্ট শার্ট পড়তে পারবে?

প্যান্ট-শার্ট বা ট্রাওজার-গেঞ্জি অবশ্যই ভেতরে পরা যেতে পারে কিন্তু তার উপরে অবশ্যই বোরখা বা ওভার কোট জাতীয় ঢিলেঢালা কিছু একটা পরতে হবে যাতে করে শরীরের কোন অংগ প্রত্যংগ বাইরে থেকে বোঝা না যায়। কিন্তু

ছেলেদের মতো শুধু প্যান্ট-শার্ট বা টি-শার্ট পরে চলাফেরা করা যাবে না। কারণ ছেলেদের মতো জামা-কাপড় পড়া কুরআনের নিষেধ।

প্রশ্ন ঃ ১০২) ওড়নার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

আমাদের দেশে একটা দৃশ্য অহরহ দেখা যায় যে, মেয়েরা ওড়না মাফলারের মতো গলায় পেচিয়ে রাখে আর বুকটা খোলা রাখে। আবার দেখা গেল যে শীতকালে ওভার কোট বা জ্যাকেট পরে কোন বাসায় বেড়াতে গেলাম এবং সেই বাসায় ঢুকে যখন ওভার কোট বা জ্যাকেট খুলে রাখলাম তখন যেন ভেতরের সর্ট জামা-কাপড় বের হয়ে না পরে, তখন কিন্তু সবার সামনে লজ্জা পেতে হবে। তাই ওভার কোর্টের ভেতরেও বড় ঢিলেঢালা কাপড় পরতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১০৩) শাড়ি পড়লে কি সঠিকভাবে পর্দা রক্ষা হয়?

শাড়ি আমাদের দেশের একটি কমন পোশাক যা হয়তো হিন্দু কালচার থেকে এদেশে এসেছে। শাড়ি পরলে পেট বের হয়ে থাকে এবং শরীরের অন্যান্য অংশ কোন না কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাই শাড়ি-ব্লাউজে সত্যিকার পর্দা টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন যদি তার উপরে কোন বোরকা বা ওভার কোট জাতীয় কিছু না পরিধান করা হয়।

প্রশ্ন ঃ ১০৪) বোরকার নীচে পাতলা শাড়ি পড়া যাবে কি?

বোরকার নীচে যে কোন পোশাকই পড়া যাবে। তবে বোরকার নীচে যদি পাতলা বা কোন সংক্ষিপ্ত পোশাক পড়া হয় তাহলে সমস্যা হচ্ছে যদি কোন প্রয়োজনে বোরকা খুলতে হয় তখন সেই সংক্ষিপ্ত পোশাক বের হয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ ১০৫) পর্দা করেও কি রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে?

অনেকে পর্দা করেন ঠিকই কিন্তু অজ্ঞতার কারণে নিজেদের গোপন সৌন্দর্য পরপুরুষের নিকট প্রকাশ করে ফেলেন। তাদের ধারণা যে শুধু কাপড়-চোপড় হচ্ছে পর্দা। যেমন মাথায় হিজাব করেছেন ঠিকই এমনকি বোরকা বা ওভার কোট পরিধান করেছেন। কিন্তু নিজেদের গোপন সৌন্দর্য পরপুরুষের নিকট প্রকাশ করে ফেলছেন। যেমন ঃ

- লিপিস্টিক দিয়ে ঠোটকে আরো আকর্ষণীয় করে;

- কসমেটিকস ব্যবহার করে মুখমন্ডলকে আরো সুন্দর করে;
- ভ্রু প্লাক করে ভ্রুকে আরো সুন্দর করে;
- আই-ভ্রু বা আই লাইনারের মাধ্যমে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে;
- হাতে সুন্দর সুন্দর চুরি বা ব্রেসলেইট পরে;
- আঙুলে নানা ডিজাইনের আংটি পড়ে;
- হাত-পা-এর নখে নেইল-পলিশ ব্যবহার করে;
- পায়ে নুপুর বা ব্রেসলেইট পরে;

অনেকের হয়তো এগুলো অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে থাকে না বা প্রকাশের নিয়তও থাকে না। কিন্তু সে যখন ঘরের বাইরে যাচ্ছে তখন এই সকল কারণে পরপুরুষের দৃষ্টি কিন্তু আপনা-আপনি তার উপর গিয়ে পরছে। সাজগোজ, রূপচর্চা অবশ্যই করা যেতে পারে এবং অলংকারও অবশ্যই পরতে পারবে কিন্তু তা হতে হবে শুধু নারী অঙ্গনে অর্থাৎ তা যেন পরপুরুষের নিকট কোনভাবেই প্রকাশ হয়ে না পরে। আর যেসকল নূপুর পরে হাটলে শব্দ করে তা তো অবশ্যই বাইরে পরে যেতে পারবে না। তাই মহান আল্লাহ আমাদের ভালোর জন্যই সূরা আন নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

"*তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে।*"

প্রশ্ন ঃ ১০৬) নারীরা কি কপালে টিপ ব্যবহার করতে পারবে?

ইসলামে কপালে টিপের ব্যাপারে কিছু নেই। নারীরা স্বামীর সামনে সাজসজ্জা করতে পারবে পরপুরুষের সামনে নয়। হিন্দু বিবাহিতা নারীরা ধর্মীয় কারণে কপালে সিঁদুরের টিপ ব্যবহার করে থাকে। মুসলিম নারীদের এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে যেন অন্য জাতির অনুকরণ না হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ১০৭) সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতিগুলো কি কি?

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা আল্লাহর নাফরমানি ও আল্লাহর রসূল ﷺ -এর অবাধ্যতা। এই অবাধ্যতা নিজেদেরই ক্ষতি। নাবী ﷺ বলেন ঃ

আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া। সাহাবী এ কথা শুনে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যারা অস্বীকার করে তারা কারা?

রসূল ﷺ বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার নাফরমানি করল, সে অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী)

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সূরা নূর ঃ ১৯)

শয়তান বনী আদমের চির শত্রু। পৃথিবীর শুরু থেকেই শয়তান মানুষকে বিপদে ফেলে আসছে। রসূল ﷺ বলেন, আমি আমার পরপুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে বড় ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ আরো বলেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীকে ভয় কর, কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীর ফিতনা। (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ উম্মতকে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে তিনি উম্মতে মুসলিমাহকে অধিক সতর্ক করেন। কিন্তু তারপর দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নারী ও পুরুষ রসূল ﷺ -এর সতর্ক করণের বিরোধিতা করেন। রসূল ﷺ উম্মতকে যে ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে গেছেন, তার প্রতিফলনই আমরা আজ লক্ষ্য করছি।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের আচার-আচরণ সর্বোতভাবে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন হে রসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইহুদী খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে? রসূলুলাহ ﷺ বললেন ঃ তারা ছাড়া আর কারা? (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)

হিদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কেউ গোমরাহির পথ অবলম্বন করে, এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন কঠিন আযাব রেখেছেন। আখিরাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। আর আখিরাতের শাস্তি কত কঠিন হবে তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ১০৮) কাপড় পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা ও অন্যদের আকর্ষণকারিণী হওয়া বলতে হাদীসে কি বলা হয়েছে?

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসী দু'ধরনের লোক, যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টাকারিণী, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত দূর থেকে তার সুগন্ধি পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ১০৯) বাড়ীর ভেতরে থাকলেও কি পর্দা করতে হবে? বাড়ির ভেতরে পর্দার নিয়ম কি?

বাড়ীর ভেতরে নারীদের কর্মব্যস্ত থাকাকালে সবসময় সতর ঢেকে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর অন্দর মহলে পুরুষদের অবাধ যাতায়াত থাকা উচিত নয়। সেখানে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এর পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে পর্দার সমস্যা নেই। কিন্তু একান্নবর্তি বা যৌথ পরিবারে এটা রীতিমতো সমস্যা। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যেসব পুরুষের সাথে দেখা দেয়া শরীয়তে নিষেধ তাদের অন্দর মহলে যেতে দেয়া মোটেই উচিত নয়। তাহলে মেয়েরা সতর না ঢেকে অবাধে নিজেদের কাজকর্ম করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ১১০) বাড়ীর ভেতরে নিজেদের মধ্যে কাদের সামনে শুধু সতর ঢেকে পর্দা করতে হবে?

"হে নাবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে। এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশী

পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। আর হে নাবী! মু'মিন নারীদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হিফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া ঃ

স্বামী, বাবা, স্বামীর বাবা, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, অতি বৃদ্ধ, নিজের খরিদকৃত গোলাম, নিজের মেলামেশার মেয়েদের, এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।

হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আন্ নূর ঃ ৩০-৩১)

প্রশ্ন ঃ ১১১) সাবালক ছেলেদের সামনে পর্দার নিয়ম কি?

বাড়ির সাবালক ছেলেদেরও ঘরে ঢোকার সময়ে অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে করে ঘরে অবস্থানকালে অসতর্ক অবস্থায় যেন সতর কারও দৃষ্টিগোচর না হয়। সূরা আন নূর এর ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন তারা অবশ্যই যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে।"

প্রশ্ন ঃ ১১২) দেবর এবং ভাসুরের সামনেও কি পর্দা করতে হবে?

হ্যাঁ, দেবর ও ভাসুরের সামনেও পর্দা করতে হবে। মেয়েদের এটুকু সচেতন থাকা দরকার যে তাদের শরীরের কোন অংশ খোলা থাকা অবস্থায় এবং ভালভাবে না ঢেকে স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে যাওয়া শালীনতার বিরোধী। অথচ রসূল ﷺ দেবরকে 'যম' মনে করে সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্বামী ও শাশুড়ীর সহযোগীতা পেলে সমস্যা থাকে না। তাছাড়া এক বাড়ীতে বসবাস করে দেবরকে মোটেই দেখা না দিয়ে থাকা সবচেয়ে কঠিন। তাইতো স্বামী ও শাশুড়ীর সহযোগীতা না পাওয়া পর্যন্ত দেখা দিতে হলে ভালভাবে সতর ঢাকা থাকা দরকার অর্থাৎ সম্পুর্ণরূপে পর্দা করেই দেবরের বা

ভাসুরের সামনে যেতে হবে। বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে কথা বলা যাবে না, হাসি-ঠাট্টা, খোস-গল্প করা যাবে না।

রসূল ﷺ বলেছেন সাবধান! নিভৃত নারীদের নিকটে যেওনা, জনৈক আনসার বললেন হে আল্লাহর রসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? নাবী কারীম ﷺ বললেন, সেতো মৃত্যুর সমান। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী)

প্রশ্ন ঃ ১১৩) দুলাভাইয়ের সামনেও কি পর্দা করতে হবে?

হ্যাঁ, দুলাভাইয়ের সামনেও পর্দা করতে হবে। আমাদের সমাজে শ্যালিকা-দুলাভাই সম্পর্ক খুবই বিপদজনক! সাধারণত দেখা যায় বিয়ের দিন থেকেই শ্যালিকা-দুলাভাই একটি হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং এতে পরিবারের কেউ কিছু মনে করেন না। কারণ এটা আমাদের কালচারের একটা অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন-হাদীসের আলোকে এই সম্পর্ক হারাম। তাই শ্যালিকাকে অবশ্যই দুলাভাই এর সামনে ১০০% পর্দা মেইনটেইন করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১১৪) নিজ কাজিনদের সামনেও কি পর্দা করতে হবে?

অবশ্যই এদের সামনে পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে। চাচাত, মামাত, খালাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে পর্দা না করার কুফল সমাজে কারো অজানা নয়। আল্লাহ তা'আলা অনর্থক পর্দার হুকুম দেননি। বাড়ীর মুরুব্বীরা যদি নিজেদের বাড়ীতে পর্দার বিধান চালু রাখার চেষ্টা করেন তাহলে মেয়েদের কোনো সমস্যা পোহাতে হয় না। মেয়েদের বেপর্দা হওয়ার জন্য পিতা-মাতাই আসলে দায়ী। আল্লাহর কাছে তারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন বলে যদি অন্তরে ভয় থাকে তাহলে কোনো পিতা-মাতা এ বিষয়ে অবহেলা করতে পারেন না।

প্রশ্ন ঃ ১১৫) গৃহ শিক্ষক বা প্রাইভেট শিক্ষকের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

অবশ্যই প্রাইভেট শিক্ষকের সাথে পর্দা করতে হবে। আর গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে নানা অঘটন তো রয়েছেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একসময় ছাত্রী শিক্ষকের প্রেমে পরে যায় এবং একদিন শিক্ষক ছাত্রীকে নিয়ে উধাও। এমনও দেখা গেছে যে ঠিকমতো পর্দা রক্ষা না করার কারণে সন্তানের শিক্ষকের সাথে সন্তানের মায়ের অবৈধ সম্পর্ক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ১১৬) ড্রাইভার-দারোয়ান এবং চাকরের সামনেও কি পর্দা করার প্রয়োজন আছে?

আবার অনেকেই বাড়ির ড্রাইভার, দারোয়ান, কেয়ারটেকার বা চাকরের সামনে পর্দা করেন না, মনে করেন এরা তো আমাদের নিজেদেরই লোক। মনে রাখতে হবে এদের সামনেও অবশ্যই পর্দা করতে হবে, এরা সম্পূর্ণরূপে পরপুরুষ, এদের সামনে পর্দা করা ফরয। আসলে পর্দা মেনে চলা প্রধানতঃ মেয়েদের মনোবলের উপরই নির্ভর করে। যে মেয়ে পর্দা পালন করে তাকে বেপর্দা হবার জন্য কেউ চাপ দেয় না। স্বামী যদি শরীয়তের ব্যাপারে অমনোযোগী হয় তাহলে সে-ই শুধু চাপ দিয়ে স্ত্রীকে বেপর্দা করার চেষ্টা করে। তা না হলে দেবর ও চাচাত মামাত ভাইয়েরা কিছু সময় অসন্তুষ্ট থাকলেও পর্দা পালনের কারণে দোষ দেয় না, বরং অন্তরে শ্রদ্ধাই করে।

প্রশ্ন ঃ ১১৭) বাড়ীর বাইরে পর্দার নিয়ম কি?

মুসলিম নারীকেও স্বাভাবিক প্রয়োজনেই বাড়ীর বাইরে যেতে হয়। বাড়ীর ভেতরে থাকাকালে বাপ ভাইয়ের সামনে যেখানে সতর ঢাকা প্রয়োজন, সেখানে ঘরের বাইরে তো নিশ্চয়ই আরও বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। আজকাল পার্টিতে, অফিসে, শপিং মলে, পার্কে, রেস্টুরেন্টে, ইউনিভার্সিটিতে যে ধরনের পোশাক পরে নারীরা চলাফেরা করেন তা মুসলিম নারীর কোনো পরিচয় বহন করে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত! নারীদের দেহের যে তিনটি অংশ সতরের বাইরে রাখা হয়েছে সেটুকু সহ গোটা শরীর ঢেকে রাখার নামই হলো পর্দা। বিশেষ করে বাড়ীর বাইরে পরপুরুষদের সামনে যেতে হলে চেহারা অবশ্যই ঢেকে রাখা প্রয়োজন। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো হিজাব বা পর্দা। পর্দা সম্পর্কে কুরআনে সূরা নূর ও সূরা আহযাবে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয় এমন ঘনিষ্ট আত্মীয়দের সাথেও পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে। কারণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত ও মেলামেশার পরিণামে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠার আশংকা রয়েছে। আজকাল সমাজে ব্যাপকভাবেই যে এসব হচ্ছে তা কারোই অজানা নয়।

প্রশ্ন ঃ ১১৮) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে পর্দা করবো?

বিশেষ করে যেসকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-এডুকেশন সেখানে তো অবশ্যই ছাত্রীদের ১০০% পর্দা মেইন্টেন করে চলতে হবে। ছাত্রদের সাথে

বিনা প্রয়োজনে গল্প-আড্ডা দেয়া যাবে না। গ্রুপ স্টাডি বা এসাইনমেন্ট করতে গিয়ে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে একাকার হওয়া যাবে না। এবং পুরুষ শিক্ষকের সাথেও অবশ্যই পর্দা করতে হবে যদিও সে পিতার বয়সী হন। এছাড়া কোন শিক্ষকের কাছে গ্রুপে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে বা কোন কোচিং সেন্টারে কোচিং করতে গিয়েও অবশ্যই পর্দা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১১৯) বেপর্দা মেয়েদের মনের অবস্থা কি হওয়া উচিত?

কোনো সুস্থ মনের নারী কখনও এটা কামনা করতে পারেন না যে, তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। তাই এ মনোভাবের নারীর পক্ষে নিজেকে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করে পরপুরুষের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করার মতো মানসিকতা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। আসলে যারা সাধারণত পর্দা করেন না তারা কেউ-ই এ ব্যাপারটা এতোটা গভীরভাবে কখনও চিন্তা করে দেখেন নাই। একটু ভেবে দেখি যে, যাদের দৃষ্টি আমাদের সৌন্দর্য উপভোগ করছে তারা নিশ্চয়ই পবিত্র মন নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই। যে দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় সে দৃষ্টিতে কি কেউ আমাদেরকে দেখে?

প্রশ্ন ঃ ১২০) নারীদের বাইরে বের হবার সময় কী ভাবা উচিত?

বাড়ীর বাইরে যাবার পূর্বে সাজগোজ করার সময় এ কয়টি কথা ঠান্ডা মাথায় ও সুস্থ মনে বিবেচনা করা উচিত ঃ

ক) আমি কাদের সামনে আমার রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চাচ্ছি? আমার সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার একমাত্র আমার স্বামীর। আমি কী তার জন্য এভাবে কখনো সাজগোজ করি?

খ) সাজগোজ করে রাস্তায় চলার সময় যখন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তখন আমার মনে কেমন বোধ হয়?

গ) এভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে আমি দুনিয়ায় কী উপকার পাচ্ছি? এটা না করলে আমার কী ক্ষতি হতো?

ঘ) যারা আমাকে দেখে চোখ ও মনের জিনায় লিপ্ত হলো তাদের এ কবীরা গুনাহের জন্য আখিরাতে আমি দায়ী হবো কিনা?

ঙ) আমার এ আচরণ থেকে আমার কন্যারা কী শিক্ষাগ্রহণ করছে? তাদের বিবেক কি এটা ভাল কাজ বলে মনে করছে?

আমি এভাবে হয়তো এতদিন চিন্তা করিনি। অনেকেই যা করছে আমিও ফ্যাশন বা আধুনিকতা হিসেবে তা করে যাচ্ছি। যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও নৈতিকতাবোধের বিচারে আমার এ অভ্যাস সঠিক বলে আমার মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না। সাজসজ্জা কোন দোষণীয় নয়। নারী মহলে সেজেগোজে যেতে ইসলাম আপত্তি করে না। শুধু পরপুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ তাও মানবজাতির কল্যাণে।

প্রশ্ন ঃ ১২১) নারীদের কর্মক্ষেত্রে কেমন পর্দা হওয়া উচিত?

কর্মজীবি নারীদেরও কর্মক্ষেত্রে পর্দা করা ফরয। পুরুষ কলিগ, কো-ওয়ার্কার, বস, কোম্পানির মালিক এবং অন্যান্য পুরুষদের সামনে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে লাঞ্চের সময় অনেক সময় দেখা যায় সবাই মিলে একসাথে আড্ডা দেয়া হয় বা সময় কাটানো হয় এবং এই ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না। পুরুষ-নারী মিলেমিশে একাকার হওয়া যাবে না অর্থাৎ ফ্রী মিক্সিং হওয়া যাবে না। যদি চাকুরী করার সার্থে কর্মক্ষেত্রে পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে আখিরাতের ময়দানে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন ফরয তেমনি পর্দা করাও ফরয।

যে সকল নারীরা চাকুরী করেন তাদেরকে সাধারণত পুরুষদের সাথে মিলেমিশেই কাজ করতে হয়। কোন কোন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদেরকে ছেলেদের পোশাক পড়তে হয়। কোন কোন কাজে তাদের দেয়া নির্দিষ্ট ইউনিফর্মও পড়তে হয়। এই বেপর্দা পোশাকেই একজন নারীকে প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা অন্যান্য পুরুষদের সাথে পাশাপাশি কাজ করতে হয় এবং অনেক কর্মক্ষেত্রে কাষ্টমার সার্ভিস দিতে হয়। মনে রাখতে হবে এইসকল পুরুষ কাষ্টমার বা সহকর্মীরা সবাই পরপুরুষ। আমাকে এই বিষয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবারে অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করতে হবে, প্রয়োজন হলে ইসলামিক স্কলারদের সাথে কথা বলতে হবে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ ঃ *আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)*

একজন মু'মিনের প্রতিটি কাজ ইবাদত যদি তা আল্লাহর হুকুমের মধ্যে থেকে হয় এবং রসূল ﷺ -এর দেখিয়ে দেয়া উপায়ে হয়। অর্থ উপার্জন একটি ইবাদত যদি তা হালাল উপায়ে হয় এবং পর্দার মধ্যে থেকে হয়। এই বইয়ের

আগাগোড়াই আমরা কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে দলিল পেয়েছি যে সলাত-সিয়ামের মতো পর্দাও একটি ফরয ইবাদত। তাই অর্থ উপার্জনের ইবাদত করতে গিয়ে অন্য ফরয ইবাদত পর্দা অমান্য করাও যাবে না। আরেকটি বিশেষ দিক তা হচ্ছে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ লোভ কন্ট্রোল করতে হবে। আমার কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থ উপার্জনে প্রতিযোগীতা পরিবারে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি। তাই অর্থ উপার্জনেও লিমিট থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন ঃ

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (সূরা আত তাকাসুর ঃ ১-২)

- বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা কামনা করবে, তার পেট মাটি ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে ভরবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা আছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে সম্পদ। (তিরমিযী)

- মানুষ বৃদ্ধ হলেও তার দু'টি জিনিস বৃদ্ধ হয় না - ধনসম্পত্তি অর্জনের লালসা ও দীর্ঘ জীবনের আশা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

- রসূল ﷺ বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না। (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ১২২) নারীরা কি চাকুরী করে সংসার চালাতে বাধ্য?

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে পুরুষের দায়িত্ব হলো সংসারের সকল খরচ বহন করা। অর্থাৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বামীর (সহীহ

বুখারী) । স্ত্রী চাকুরী করতে বাধ্য না বা তাকে আয়-রোজগার করার জন্য স্বামী কোন প্রকার চাপ প্রয়োগও করতে পারবেন না । হ্যাঁ যদি স্ত্রী চাকুরী করার কারণে সংসারে অতিরিক্ত কিছু আসে তাহলে তা আলহামদুলিল্লাহ তবে স্ত্রী অবশ্যই পর্দার মধ্যে থেকে আয়-রোজগার করবেন । এবং অতিরিক্ত আয় করতে গিয়ে যদি স্ত্রীকে বেপর্দা হতে হয় বা ঠিক মতো পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব নিজের আমলনামা ছাড়াও স্বামীর আমলনামায় এসে পরবে । অর্থাৎ এই কবীরা গুনাহর জন্য এবং ফরয হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'জনকেই জবাবদিহি করতে হবে । তবে স্বামী যদি স্ত্রীর চাকুরী করা পছন্দ না করেন তাহলে জোর করে পরিবারে আশান্তি সৃষ্টি করে চাকুরী করা যাবে না ।

প্রশ্ন ঃ ১২৩) স্বামী যদি আয়-রোজগার করতে সামর্থ না হন তাহলে কি স্ত্রী চাকুরী করতে পারবে?

যদি পরিবারের অবস্থা এমন হয় যে স্বামী চাকুরী করতে শারীরিকভাবে অক্ষম (disable) এবং স্ত্রী-ই একমাত্র কাজের জন্য যোগ্য তাহলে তো কোন উপায়ই নেই । তবে এক্ষেত্রেও স্ত্রীকে যতদূর সম্ভব পর্দার মধ্যে থেকে চাকুরী করতে হবে । এবং জীবন বাঁচানোর জন্য পর্দা কিছুটা ভঙ্গ হলেও আর একটি ভাল চাকুরীর সন্ধানে থাকতে হবে এবং পর্দা বজায় রেখে কাজ করা যায় এমন চাকুরীতে যত দ্রুত সম্ভব পরিবর্তন করতে হবে ।

প্রশ্ন ঃ ১২৪) স্বামী যদি তার পছন্দসই চাকুরী না পান তাহলে কি স্ত্রী চাকুরী করতে পারবে?

এমন যদি হয় যে স্বামী তার প্রফেশন অনুযায়ী চাকুরী পাচ্ছেন না এবং তিনি তার এডুকেশন অনুযায়ী প্রফেশন ছাড়া চাকুরীও করবেন না বা ভাল অন্য কোন প্রফেশন ছাড়াও চাকুরী করবেন না এবং তিনি হয়তো আরো পড়াশোনা করবেন । আর তাই স্ত্রীকে যদি বেপর্দা হয়ে চাকুরী করতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে । আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে । স্বামীকে আল্লাহর উপর ভরসা করে যে কোন হালাল কাজ বেছে নিতে হবে একটু কষ্ট হলেও নিজ প্রফেশনে চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত । মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ্য করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (সূরা তালাক ঃ ৩)

ইসলামী নৈতিকতার দিক থেকে কোন বৈধ পেশাই ছোট নয় আবার কোনটি বড়ও নয়। আসল হলো আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে হারাম হালাল বাছবিচার করে উপার্জন করা। আল্লাহর নাবীগণ ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচাইতে সম্মানীত মানুষ। তাঁরা সবাই নিজ হস্তে জীবিকা উপার্জন করতেন। অতএব সর্বপ্রথম আমাদেরকে এ মূলনীতি ঠিক করতে হবে যে, কাজ বা পেশা যাই হোক না কেন কোনটিই ছোট নয় আবার কোনটি বড়ও নয়। বরং আদর্শভিত্তিক জীবন ও আদর্শের জন্য সমস্ত ত্যাগই আল্লাহর কাছে প্রিয়।

প্রশ্ন ঃ ১২৫) অফিসে একজন নারী এবং একজন পুরুষ (শুধুমাত্র দু'জন) কর্মকর্তা কি একই রুমে বসে কাজ করতে পারবে?

ইসলাম বলে কোন স্থানে শুধুমাত্র একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন একাকী থাকে তখন সেখানে তৃতীয় একজন উপস্থিত থাকে আর সে হচ্ছে ইবলিস শয়তান, তার কাজ হচ্ছে ফিতনা সৃষ্টি করা। তাই একটি রুমে একজন পরনারী এবং একজন পরপুরুষ একাকী কিছুতেই বসা ঠিক না, এতে দূর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১২৬) কোন মেয়ে উচ্চ শিক্ষিতা হলেই কি চাকুরী করতে হবে?

আলহামদুলিল্লাহ আজকাল বেশিরভাগ নারীরাই শিক্ষিতা, শুধু তাই নয় অনেকেই উচ্চ শিক্ষিতা। আমরা শিক্ষিতারা অনেকেই মনে করি যে এত পড়াশোনা করেছি, কীভাবে ঘরে বসে থাকি? একটা কিছু করা প্রয়োজন, শিক্ষাটাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। শিক্ষাকে অবশ্যই কাজে লাগানো প্রয়োজন, আর এই শিক্ষাকে কীভাবে কাজে লাগাবো, কোন্ ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো সেদিকে ভেবে চিন্তে এগুতে হবে। সবকিছুর মূলে হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি), কারণ আমি যত উচ্চ শিক্ষিতাই হই না কেন আমাকে একদিন আখিরাতের ময়দানে মহান বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এক এক করে দিতে হবে। তাই আমরা যা কিছু করব তা অবশ্যই তাকওয়ার সীমার মধ্যে থেকে করব এবং কোন ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘন করব না, আল্লাহর কোন হুকুমকেই অমান্য

করব না। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ।

তাই আমাকে যদি চাকরি করতেই হয় তাহলে বাছবিচার না করে এবং অতিরিক্ত পয়সার প্রতি না ঝুকে দেখেশুনে এমন কাজ নেয়া উচিত যেন পর্দা করে চলতে পারি। একটু কম পয়সার চাকরি হলেও আল্লাহর উপর ভরসা রাখি, ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে অন্যদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বরকত দিয়ে দিবেন কারণ আমি মহান আল্লাহর ফরয নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

প্রশ্ন ঃ ১২৭) মুসলিম নারীর পর্দা হচ্ছে তার নারী অধিকার, এর অর্থ কি?

আমরা যেন কেউ কাউকে ভুল না বুঝি। উপরের কয়েকটি প্রশ্ন-উত্তরে এ কথা বলা হচ্ছে না যে নারীরা চাকুরী করবেন না বা চাকুরী করতে পারবেন না। নারীরা অবশ্যই চাকরি করতে পারবেন কিন্তু আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা মেন্‌টেন্ করে। মুসলিমদের dress code হচ্ছে Women rights অর্থাৎ একজন নারী যেমন ইচ্ছা তেমন ড্রেস পরতে পারবেন এক্ষেত্রে কারো কিছু বলার নেই। আর মুসলিম নারীদের পর্দা হচ্ছে তাদের religious rights এবং সেই সাথে Women rights। তাই আমরা যেন পর্দা করতে কিছুতেই সংকোচ বোধ না করি। আমি পর্দা করার কারণে আমার কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তা-ঘাটে কেউ আমাকে কোন নেগেটিভ মন্তব্য করলে আমি অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে পারবো, তাই ভয়ের কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ ১২৮) নারীদের কো-এডুকেশন বা সহ-শিক্ষা কতটা ক্ষতিকারক?

দেশে হোক আর প্রবাসে হোক আমাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণত ছেলেমেয়ে মিশ্রিত (কম্বাইন্ড) স্কুল, কলেজ বা ইউনির্ভাসিটিতে পড়াশোনা করে থাকে। আমরা কী কখনও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি? কী ড্রেসে আমাদের মেয়েদেরকে স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছি? আমার মেয়ে যদি পর্দা করে না থাকে তাহলে এর জন্য কে দায়ী হবে? কারণ আমার মেয়ে পর্দা না করার কারণে সে নিজে, আমি (অভিভাবক) এবং অন্যান্য ছেলেরাও গুনাহগার হচ্ছে! তাই আমার সতর্ক হওয়া উচিত নয় কী?

প্রশ্ন ঃ ১২৯) ছেলেমেয়ে একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করা কি জায়িয?

আজকাল ছেলেমেয়ে একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করে থাকে, এটা বিদেশী কালচার। আজকাল বাংলাদেশেও হরহামেসাই এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু আমি একজন মুসলিম, ইসলাম হচ্ছে আমার কালচার। ইসলাম যেখানে অবৈধভাবে একে অপরের দিকে তাকানোটাই অনুমোদন করে না সেখানে হ্যান্ডশেক বা হাত মেলানো তো প্রশ্নই উঠে না। হ্যাঁ অনেক সময় আমাদেরকে বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়।

যেমন কোন অমুসলিম যদি হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যান্ডশেক করার জন্যে তখন আমি ভদ্রতার খাতিরে কী করবো? এর উত্তর কিন্তু আমার কাছেই আছে। যেমন ধরি কেউ যদি আমাকে ওয়াইন বা বিয়ার অফার করে তখন আমি ভদ্রতার খাতিরে কী করি? অবশ্যই সেটা পান করি না! তবে এই সকল বিষয়গুলো অমুসলিমদের সাথে খুব সুন্দর উপায়ে (হিকমতের সাথে) সামলিয়ে নিতে হবে। যাতে আমার সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সে ইসলামের প্রকৃত ম্যাসেজ বা দাওয়াত পেয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ১৩০) যিনা কী?

যিনা আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো বিয়ে বর্হিভুত নরনারীর মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক। বিভিন্ন উপায়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যিনা সংগঠিত হয়ে থাকে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদ অনুযায়ী জানা যাকঃ

ক) কামভাবে কারো দিকে তাকানো চোখের যিনা (জীবন্ত মানুষ বা পর্ণগ্রাফী)।
খ) কামভাবে কারো কণ্ঠস্বর শোনা কানের যিনা।
গ) কামভাবে কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যিনা।
ঘ) কামভাবে কারো দিকে দুই পা অগ্রসর হওয়া পায়ের যিনা।
ঙ) কামভাবে কারো সঙ্গে কথা বলা জিহবার যিনা।
চ) কামভাবে কারো কথা মনে মনে চিন্তা করা মনের যিনা।
ছ) কামভাব মনে রেখে email/chatting করা হাতের ও মনের যিনা।
জ) কামভাব মনে রেখে কাউকে text/sms পাঠানো হাতের ও মনের যিনা।

প্রকৃত যিনার পূর্বে এত ধরনের আনুষঙ্গিক যিনা হয়ে থাকে তাই আল্লাহ বলেছেন- *"তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হইও না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)*

প্রশ্ন ঃ ১৩১) রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ কেন?

আমাদের কাছে যখন কোন দামী সম্পদ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি থাকে তা আমরা লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখি, লকারে রাখি বা ব্যাংকে রাখি যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে না পারে। এই সম্পদ দেখে কারো লোভও হতে পারে, হিংসাও জাগতে পারে। ঠিক তেমনি নারীর মহামূল্যবান রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাকে আমানত স্বরূপ। এই রূপ আল্লাহ তা'আলা চাইলে যেকোন সময় আবার ফেরত নিয়েও নিতে পারেন। তাই মহান আল্লাহর দেয়া এই রূপ-সম্পদ নারীর উচিত পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আড়াল করে রাখা, আর এতেই রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। এতে সে দুই দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে – এক, আল্লাহর হুকুম পালন করছে আর অন্যদিকে তার মহামূল্যবান সম্পদ পরপুরুষের কু-দৃষ্টি হতে রক্ষা পাচ্ছে। আসলে নারীর রূপ-সৌন্দর্য্য শুধু তার স্বামীর জন্য। এই রূপ অন্য কাউকে প্রদর্শন করলে অকল্যাণ ছাড়া জীবনে কোন প্রকার কল্যাণ নেই।

প্রশ্ন ঃ ১৩২) জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি কি ঠিক? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কি?

জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি ঠিক। কেননা নাবী ﷺ একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী বেশী করে সদাকা কর। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে- এই প্রশ্ন নাবী ﷺ -কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশী পরিমাণে মানুষের উপর অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার কর। (সহীহ বুখারী) নাবী ﷺ এই হাদীসে নারীদের বেশী হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশী পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে, এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৩৩) স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কখনোই ওযূ ভঙ্গ হবে না। একথার দলীল হচ্ছে, নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করে সলাত আদায় করতে বের হয়েছেন কিন্তু ওযূ করেন নি। কেননা দলীল না থাকলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। যদি বলা হয়, আল্লাহ তো বলেছেন, "অথবা যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর।"

উত্তরে বলা হবে ঃ আয়াতে স্ত্রীদের স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে তাহারাত বা পবিত্রতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ প্রকৃতরূপ ও বদলীরূপ এবং পবিত্রতাকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ ছোট পবিত্রতা ও বড় পবিত্রতা। অনুরূপভাবে ছোট পবিত্রতার কারণ ও বড় পবিত্রতার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত ছোট পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত বড় পবিত্রতা অর্জনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ আবার বলেন, " তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করে অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা তায়াম্মুম কর।" এখানে (তায়াম্মুম কর) কথাটি পানি দ্বারা প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করার বদলীরূপ (পরিবর্তীত পদ্ধতি) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করে' একথা দ্বারা অপবিত্রতার ছোট একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা অপবিত্রতার বড় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ করা হয়, তবে তো আল্লাহ এই আয়াতে অপবিত্রতার দু'টিই ছোট কারণ উল্লেখ করলেন এবং বড় কারণ উল্লেখ করা ছেড়ে দিলেন। অথচ তিনি এর আগে বলেছেন, "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" এটা কুরআনের বালাগাতের বা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের পরিপন্থী। তাই আয়াতে 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা। তাহলেই তো আয়াতে দু'টি তাহারাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বড় কারণ এবং ছোট কারণ। ছোট পবিত্রতা হচ্ছে, শরীরের চারটি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। আর বড় পবিত্রতা সমস্ত শরীরের সাথে সম্পর্কিত। আর বদলী পবিত্রতা তায়াম্মুম শুধুমাত্র দু'টি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত চাই তা বড় পবিত্রতার ক্ষেত্রে হোক বা ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে। এই ভিত্তিতে আমরা বলব, স্ত্রীকে স্পর্শ করা কখনই ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। চাই স্পর্শ উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনার সাথে না হোক। তবে স্পর্শ করার কারণে যদি কোন কিছু নির্গত হয় তবে তা বিধান

ভিন্ন। যদি বীর্য বের হয়, তবে গোসল করা ফরয আর মযী নির্গত হলে অন্ডোকোষসহ লিঙ্গ ধৌত করে ওযূ করা আবশ্যক।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন অতঃপর সলাত আদায় করতেন কিন্তু ওযূ করতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

প্রশ্ন ঃ ১৩৪) মেয়েদের আওরা অর্থাৎ পর্দার সীমা পুরুষদের তুলনায় বেশী কেন?

আওরার পরিমাণ আল্লাহ ঠিক করেছেন, তিনি মেয়ে বা পুরুষ কোনোটাই নন। অতএব এখানে কোন ডিসক্রিমিনেশনের প্রশ্ন আসে না। তবে কোন কোন স্কলার বলেন যেহেতু মহিলারা বেশী সুন্দর তাই তাদের আওরা বেশী।

প্রশ্ন ঃ ১৩৫) শুধু মেয়েদের কেন হিজাব করতে হয়?

এটা একটা ভুল ধারণা, পোশাক সম্পর্কে আইন পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, উভয়কেই চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ ইসলামী আইন মেনে চলতে হয়। এ সংক্রান্ত যে আইন আল্লাহ দিয়েছেন তাতে তিনি ছেলেদের তুলনায় মহিলাদের আওরা বেশী নির্ধারণ করেছেন, যেমন মেয়েদের মাথা ঢাকতে হয় যেটা ছেলেদের করতে হয় না। তবে মোয়ামেলাত বা সামাজিক মেলামেশার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য সাধারণ নিয়ম একই।

প্রশ্ন ঃ ১৩৬) ইসলামে মহিলা নেতৃত্ব কি নিষিদ্ধ? হলে কেন?

কিছু আলেম মনে করেন রাষ্ট্রপতি, বিচারক ও সেনাপ্রধান এই তিনটি পদে মহিলাদের আসা উচিত নয়। কুরআনে রাষ্ট্রের শীর্ষপদে মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু নেই। তবে আলেমরা যে হাদীসটি উল্লেখ করেন যে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে জাতি উন্নতি করতে পারে না যারা তাদের নেতা হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করে।" রসূল ﷺ পারস্যের শাহজাদী "পুরান" এর রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মনোনীত হওয়া প্রসংগে এ মন্তব্য করেন বলে জানা যায়। (এ হাদীসের যথার্থতা ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে)।

রাষ্ট্রপ্রধান ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে সকল কাজে নেতৃত্ব দিতে হয়, প্রধান সলাতের জামাতের ইমামতিও করতে হয়, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের

দায়িত্বও পালন করতে হয়। যেহেতু মেয়েরা সলাতে পুরুষদের ইমামতি করতে পারেন না, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বও তারা পালন করতে পারেন না। এছাড়া এটা একটা ফুলটাইম জব, এধরনের টাইম কমিটমেন্ট মুসলিম মেয়েদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

বিচারক ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে, মেয়েরা যেহেতু আদালতে স্বাক্ষী দিতে পারেন, তাই তারা বিচারকও হতে কোন বাঁধা নেই।

সেনাপ্রধান ঃ মহিলারা সেনাপ্রধান হতে পারবেন না এসম্পর্কে অনেক আলেম দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রশ্ন ঃ ১৩৭) মহিলাদের সাক্ষী ছেলেদের তুলনায় অর্ধেক কেন? অনেক সময় বলা হয় ১জন ছেলে সাক্ষীর সমান হলো দু'জন মেয়ে সাক্ষী, এতে কি মহিলাদের খাটো করা হলো না?

এটা শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদির সাক্ষী হবার সময় প্রযোজ্য, ক্রিমিনাল কেসে এটা প্রযোজ্য নয় (ডঃ জামাল বাদাবি)। মেয়েরা সাধারণত ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন ও এধরনের চুক্তিতে সাক্ষ্য কম দেন বলে তারা যদি চুক্তি সংক্রান্ত কোন কিছু ভুলে যান তাই দু'জন সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে যাতে একজন আরেকজনকে চুক্তির শর্ত মনে করিয়ে দিতে পারেন। বরং এই ব্যবস্থার ফলে মেয়েরা যাতে এধরনের চুক্তির সাক্ষী হতে পারেন তার বাঁধা দূর করা হয়েছে। কুরআনে ৭ জায়গায় সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মাত্র ১ জায়গায় আর্থিক বিষয়ে ২জন পুরুষ না পেলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন নারী সাক্ষী নিতে বলা হয়েছে (সূরা বাকারা ঃ ২৮২)

প্রশ্ন ঃ ১৩৮) স্বামীকে অধিকার দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে প্রহার করার, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর ব্যাখ্যা কি?

সূরা আন নিসার ৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে "আর যখন কোন নারীর অবাধ্যতার আশংকা করো তা হলে তোমরা তাদের (ভালো কথার মাধ্যমে) উপদেশ দাও, (তাতে ফল না হলে) তাদের থেকে বিছানা আলাদা করো, (তাতেও সংশোধন না হলে চুড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, যদি তারা এমনিতেই সংশোধিত হয়, তবে (কষ্ট দেয়ার জন্য) তাদের কোন অজুহাত খুঁজে বেড়িয়োনা।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট ঃ যায়িদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর কন্যা হাবিবা (রা.)-এর বিয়ে হয় সাদ ইবনে রাবী (রা.)-র সাথে। একদিন স্বামী চড় দিলে হাবিবা (রা.) এসে পিতার কাছে অভিযোগ করলে তিনি মেয়েসহ রসূল ﷺ -এর কাছে আসেন মিমাংসার জন্য। রসূল ﷺ হাবিবাকে বলেন স্বামীর উপর কিসাস নেয়ার জন্য। একথা শুনে তারা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন এই আয়াত নাযিল হয় যাতে স্বামীর উপর কিসাস নিষিদ্ধ হয়। এর কিছুদিন পরে মদিনার মহিলারা এসে রসূল ﷺ -এর স্ত্রীদের কাছে স্বামীদের মারধরের অভিযোগ করলে রসূল ﷺ বলেন, দেখা যাচ্ছে বহু মহিলা মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করছে, ওরা (মারধরকারী স্বামীরা) মোটেই তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জীবনে শুধু প্রথম ২টা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তিনি জীবনে কোন স্ত্রীকে প্রহার করেন নি, এমনকি বকাও দেন নি। রসূল ﷺ বলেছেন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে ভালো লোক হলো সেই সে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো। রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ভালো লোক হলো সে, যে তার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য ভালো। আর আমি নিজের পরিবারের জন্য তোমাদের তুলনায় অনেক ভালো। এরপরে কারো পক্ষে স্ত্রীকে প্রহার করা কিভাবে সম্ভব?

প্রশ্ন ঃ ১৩৯) মেয়েদের কি উচ্চ স্বরে কুরআন পড়া জায়িয আছে?

ঘরে যদি কোনো লোক না থাকে আর এ আওয়াজ যদি ঘরের বাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তা হলে ঘরের মধ্যে আওয়াজ সীমাবদ্ধ রেখে পড়া যাবে। কিন্তু ক্বারী সাহেবরা যেভাবে কানে আংগুল দিযে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন, সেভাবে পড়া উচিত নয়। এছাড়া বড় মেয়েদের প্রকাশ্যে পরপুরুষদের সামনে কোন কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগীতায়ও অংশগ্রহণ করা যাবে না, কুরআন তিলাওয়াত করে তা ফেইসবুকে বা ইউটিউবে ছেড়ে দেয়াও যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৪০) স্বামীর খারাপ আচরণের কারণে স্ত্রী যদি বদ দু'আ করে তাহলে স্ত্রী কি আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে?

স্বামীকে কখনও বদ দু'আ করা উচিত নয়, শধু স্বামী নয় কোন মুসলিমকেই বদ দু'আ করা ঠিক নয়। রসূলে কারীম ﷺ কখনও কোন মুসলিমকে বদ দু'আ করেন নি। যদি স্বামীর কোনো বদ অভ্যাসের কারণে মন খারাপ হয় তাহলে

তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করাটাই শ্রেয়। বদ দু'আ যদি লেগেই যায় তাহলে তো স্ত্রীরই ক্ষতি হবে। (আল্লাহ না করুক) যদি মারা যায় তাহলে তো স্ত্রীই বিধবা হবেন। যদি পঙ্গু হয় তাহলে তো স্ত্রীরই ক্ষতি হবে। সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসা এবং একে অপরের জন্য দু'আ করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ১৪১) গান-বাজনা শ্রবণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

যে সমস্ত গানে মিউজিক আছে বা মিউজিক দিয়ে যে সমস্ত গান করা হয় সে সমস্ত গান শোনা জায়িয নয়। যেহেতু রসূলে কারীম ﷺ বলেছেন গান মানুষের মধ্যে মুনাফিকি সৃষ্টি করে। এগুলো মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে, ঈমান থেকে, ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেজন্য এগুলো শুনা বা দেখা বৈধ নয়। মিউজিক ছাড়া গান হতে পারে, আজকাল সুন্দর সুন্দর ইসলামী সঙ্গীত বেরিয়েছে, এগুলো শুনা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১৪২) স্ত্রী তার আয় থেকে কিছু অংশ স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজনকে কি দিতে পারে?

হ্যাঁ অবশ্যই দিতে পারবে। স্ত্রীর যদি নিজের আয় হয়, নিজে উর্পাজন করে তাহলে সেটা স্বামীর অজান্তে নিজের মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন ও আল্লাহর ওয়াস্তে যাকে খুশি তাকে দিতে পারবে। আর রোযগার যদি স্বামীর হয় তাহলেও দিতে পারবে তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৩) কালো মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না, ছেলেরা সব সময় সুন্দরী মেয়ে খোঁজ করে থাকে। তাহলে কেউ কি কালো মেয়েকে বিয়ে করবে না? কালো মেয়ে হয়ে জন্ম হওয়া কি অন্যায়?

এধরনের মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। কালো মেয়ে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সুতরাং এ ধরনের মনোবৃত্তি পরিহার করা উচিত।

একবার উমর (রা.)-এর আমলে তিনি নিজে এলাকায় এলাকায় হাঁটতেন আর দেখতেন কারও কোনো অভাব আছে কিনা? একদিন গভীর রাতে ঘরের ভিতর থেকে এক মেয়েকে তার মা বলছে, মা! উঠো গাভীর দুধ দোহন করে, পানি

মিশ্রিত করে বাজারে বিক্রি করে এসো। মেয়ে তখন বললো মা এটা আমি করতে পারবো না, কারণ উমর (রা.) আমীরুল মু'মিনীন এ ব্যাপারে কঠিন আইন জারী করেছেন। তখন মা বললেন মেয়ে, এখন গভীর রাত আমীরুল মু'মিনীন নিজে এবং তাঁর সমস্ত সৈন্য বাহিনী এখন ঘুমন্ত অবস্থায় সুতরাং কেউ দেখতে পাবে না। মেয়ে বললো, মা উমর (রা.)-কে ও তাঁর বাহিনীকে ফাঁকি দেয়া যাবে কিন্তু এমন একজন দেখছেন যাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। আর তিনি হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন। উমর (রা.) একথা শুনে, বাড়িতে গিয়ে তার নিজের ছেলের জন্য ঐ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। এখানে কালো না সুন্দর সেটা দেখা হয়নি। দেখা হল ঐ মেয়ের তাকওয়া ও আমল। হাশরের ময়দানে আমল দিয়েই বিচার হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৪) এক মাস ফরয সিয়াম (রোযা) পালন করার পর ঈদের পরের দিন সাক্ষী সিয়াম রাখলে হবে কি? কেউ কেউ বলে ঈদের পরের দিন সিয়াম রাখা হারাম এটা কি ঠিক?

ইসলামে সিয়ামের মধ্যে সাক্ষী (রোযা) সিয়াম বলতে কিছু নেই। ফরয শেষ হয়ে যাওয়ার পর রসূলে কারীম ﷺ বলেছেন শাওয়াল মাসে একটার পর একটা করে ছয়টি নফল সিয়াম যদি কেউ রাখে তাহলে সে যেনো সারা বছর সিয়ামই পালন করলো। ঈদের পরের দিন সিয়াম পালন করা হারাম নয়। এটা মানুষের বানানো কথা। এতে কুরআন হাদীসের কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন ঃ ১৪৫) স্বামীকে কি নাম ধরে ডাকা যাবে? স্বামীকে নাম ধরে ডাকলে গুনাহ হবে কি?

স্বামীকে নাম ধরে ডাকলে গুনাহ হবে এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীসে নেই। স্বামীর নাম ধরে ডাকা যায়। স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৬) যদি কোনো কাযা সিয়াম থাকে সে মুহূর্তে যদি নফল সিয়াম রাখা হয় তখন সেটা কি কাযা সিয়াম হবে না নফল সিয়াম হবে?

এটা নিয়তের উপর নির্ভর করে। যদি নফল সিয়ামের নিয়ত করা হয় তাহলে নফল সিয়ামই হবে। আর যদি কাযা সিয়ামের নিয়ত করি তাহলে কাযা সিয়ামই হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৭) নফল সিয়ামের গুরুত্ব বেশি না, কাযা সিয়ামের গুরুত্ব বেশি?

কাযা সিয়ামের গুরুত্ব বেশি দিবো। আগে কাযা সিয়াম রেখে তারপর নফল সিয়াম রাখা উচিত। কাযা সিয়ামকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ ১৪৮) প্রথম স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এখন দ্বিতীয় স্বামী থাকাকালীন কি প্রথম স্বামীর জন্য দু'আ চাইতে পারি?

অবশ্যই প্রথম স্বামীর জন্য দু'আ চাওয়া যাবে। এবং সমস্ত মুসলিমদের জন্য দু'আ চাইতে পারবো।

প্রশ্ন ঃ ১৪৯) নিজের সুস্থতা লাভের জন্য তাবিজ বা এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা কুরআন ও হাদীস কী বলে?

তাবিজ বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করা শরীয়তে কোনো বিধান নেই। বরং এগুলোর অনেক কিছুই শিরকের অন্তর্ভূক্ত। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন- "আর যদি তোমাকে কোন খারাবী স্পর্শ করে তবে তা দূর করার ক্ষমতা তিনি ছাড়া অন্য কারও নেই।" (সূরা আন'আম ঃ ১৭)

প্রশ্ন ঃ ১৫০) দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে কি ফরয সলাত কাযা করা যায়? এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস কি বলে?

নিশ্চয়ই নয়, কারণ দ্বীন তো হবে সলাত প্রতিষ্ঠার জন্য। দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি সলাতই না আদায় করি তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দাওয়াতের কোনো দাম নেই। আগে সলাত তারপর সংগঠন। কোনো অবস্থাতেই সলাত ছেড়ে দেয়া যাবে না। পুরুষ দুই অবস্থায় সলাত ছেড়ে দিতে পারে। ১) পাগল হয়ে গেলে এবং ২) বেহুস হয়ে গেলে। (৩) আর মহিলাদের পিরিয়ডের সময় মাফ আছে। এ ছাড়া আর কোনো অবস্থাতেই সলাত ছাড়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে সর্বপ্রথমই সলাতের হিসাব নিবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫১) স্বামী-স্ত্রী রাগারাগি করে কথা বন্ধ করলে এভাবে করে কতদিন পর্যন্ত শরীয়াতে বন্ধ রাখা জায়িয আছে?

এক জায়গায় থাকলে এটা হওয়াটা স্বাভাবিক। তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা জায়িয নেই। যদি একজনের রাগ বেশি থাকে তাহলে আরেক জনে এটার

অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রী যদি ঘরের মধ্যে আনন্দে থাকে তাহলে ঘরটা সুখে শান্তিতে ভরে যায়।

প্রশ্ন ঃ ১৫২) মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে 'কসম' কেটে থাকে এটা কি জায়িয আছে?

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নামে কসম খাওয়া জায়িয নয়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে নাবী! আপনি বলুন ঃ আর আমার রবের কসম অবশ্যই তোমাদের পুনর্জীবিত করা হবে।' (সূরা তাগাবুন ঃ ৭)

প্রশ্ন ঃ ১৫৩) যদি কোন মেয়ে বিয়ে করতে না চায়, তাহলে সে কিভাবে জীবন কাটাবে?

বিয়ে করতে না চাওয়া, যদি তার দৈহিক ও স্বাস্থ্যগত কারণ হয় তাহলে কোন কথা নেই। সে নিজেকে বাঁচিয়ে পর্দা রক্ষা করে নৈতিকতা রক্ষা করে চলবে কিন্তু সে যদি অন্য কোন কারণে বিবাহ থেকে মুক্ত রাখে সেটা জায়িয হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৫৪) বিয়েতে যে উকিল বাবা থাকে এটা কি ইসলামে জায়িয?

ইসলামে উকিল বাবা বলতে কিছু নেই। উকিল বাবা পরপুরুষ। তার সামনে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৫৫) ধর্ম ছেলে ও ধর্ম ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দেয়া যাবে কি না?

ধর্ম ছেলে ও ধর্ম ভাই বলে ইসলামে কোন ভাই বা ছেলে নেই। শরীয়তে ধর্ম ছেলে নাজায়িয। আল্লাহ এটার প্রমাণ করেছেন রসূল ﷺ-কে দিয়ে। ধর্ম ছেলের যদি ভিত্তিই থাকত তাহলে যায়িদের পরিত্যাক্ত স্ত্রী যায়নাবকে রসূল ﷺ কি বিয়ে করতে পারতেন? যায়িদ রসূল ﷺ -কে পিতা ডেকেছিলেন। মুখে ডাকা পিতা আর মুখে ডাকা ছেলে এবং মুখে ডাকা ভাই এর কোন শরীয়াতে ভিত্তি নেই। এজন্য ধর্ম ছেলে, পিতা, ভাই এ ধরনের আত্মীয়তা বানানোও সঠিক নয়। এরা সবাই পরপুরুষ। এদের সঙ্গে দেখা করা জায়িয নেই।

প্রশ্ন ঃ ১৫৬) বিনা ওযুতে কি কুরআন ধরতে পারবে এবং পড়তে পারবে?

বিনা ওযুতে কুরআন ধরতে পারবে এবং অবশ্যই পড়তে পারবে। তবে ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করার বিধিনিষেধ ফিরিশতাদের জন্য নাকি মানুষের জন্য তা

অনেকের কাছে পরিষ্কার না। কুরআনের যে আয়াতে বলা হয়েছে যে এটি যারা পবিত্র তারা ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এখানে ফিরিস্তাদের বুঝানো হয়েছে যারা সবসময় পবিত্র থাকে এবং লাওহেমাফুজে যে কুরআনের মুল কপিটি আছে তা ফিরিস্তারা ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। ইসলামে পবিত্রতা এবং ওযু এক নয়। ইসলামে শুধুমাত্র দুটি ইবাদত করতে ওযু লাগে আর তা হচ্ছে সলাত আদায় করতে এবং কাবা ঘর তাওয়াফ করতে যার সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।

তবে কুরআন ওযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়েও বেশ মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জন, যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বল, ইমাম মালেকসহ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মনে করেন, বিনা ওযূতে কুরআন ছোঁয়া নিষিদ্ধ, তবে কাপড়ে পেঁচানো থাকলে বা কাপড়ের আবরণ থাকলে ধরতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বেশীরভাগ ইমামের মতামত হচ্ছে ওযূ ছাড়া কুরআন অবশ্যই স্পর্শ করা যাবে এবং তিলাওয়াতও করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)বলেন, খালি দু মলাটই কাপড়ের কাজ করে, তাই আলাদা কাপড় না হলেও চলবে। ইমাম হাম্বল (রহ.) মনে করেন, কুরআন ওযূ ছাড়া স্পর্শ করতে কোনো সমস্যা নেই, তবে আরবি লিখিত অংশে হাত দেয়া যাবে না। তবে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য ও শিক্ষকেরা শেখানোর নিমিত্তে কুরআনের যে কোনো অংশই ওযূ ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখলে কোনো না কোনোভাবে তাদের শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া দু'টোতেই বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের জন্য কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বেশ উদার। এভাবে দেখা যায়, এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান তবে ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি মত প্রদান করেছেন যে, কুরআন ওযূ ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায়। ওযূ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনেক মতানৈক্য থাকলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত আর তাহলো ওযূসহ কুরআন তিলাওয়াত উত্তম।

এখন টেকনলোজির যুগ। আমরা জানি কুরআন অনেক আগেই কম্পিউটারে এবং অনলাইনে চলে এসেছে। আজকাল মানুষ কুরআন তিলাওয়া করা, তিলাওয়া শুনা, অর্থ পড়া, তাফসীর পড়া ইত্যাদি সবই ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, আইফোন, স্মার্টফোন ইত্যাদিতে ব্যবহার করে আর তা হাতে ধরেই করে

থাকে। এখন প্রশ্ন এই ডিভাইজগুলোর মধ্যে তো সম্পূর্ণ কুরআন রয়েছে এবং তখন কেউ প্রশ্ন তুলে না যে এই ইলেকট্রনিক কুরআন ধরতে বা পড়তে ওযু লাগবে কিনা? প্রশ্ন শুধু কাগজের বাইন্ড করা কপিটি নিয়ে।

প্রশ্ন ঃ ১৫৭) মেয়েরা কি হায়েয (পিরিয়ড) অবস্থায় কুরআন ধরতে পারবে?

সাধারণভাবে হাদীসে এসেছে 'ত্বাহারাত' অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু 'ত্বাহারাত' বা পবিত্রতা বলতে কিন্তু ওযূ নয়, এটি বড় অপবিত্রতা। যেমন ঃ স্ত্রী সহবাস, হায়েয বা নিফাস। সহীহ স্কলাররা এ বিষয়ে বিশ্লেষন করে বলেছেন ঃ মেয়েরা হায়েয অবস্থায় কুরআন স্পর্শ ছাড়া তিলাওয়াত করতে পারবে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ মেয়েরা এসময়ে হাতে কোন গ্লাফ্স পরে কুরআন ধরে তিলাওয়াত করতে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়তে পারবে। কেউ কেউ বলেছেন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ গবেষণার জন্য হায়েয অবস্থায় মেয়েরা কুরআন ধরতে ও পড়তে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ কোন মেয়ে যদি হায়েয অবস্থায় পরীক্ষার্থী হয় তাহলে অবশ্যই কুরআন হাত দিয়ে ধরতে পারবে, পড়তে পারবে এবং পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবে। তাই খুব জরুরী ছাড়া হায়েয এবং নিফস অবস্থায় মেয়েদের কুরআন হাত দিয়ে না ধরাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ ১৫৮) ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয কি?

প্রয়োজন দেখা দিলে ঋতুবতী কুরআন পাঠ করা জায়িয। যেমন সে যদি শিক্ষিকা হয়, তবে পাঠ দানের জন্য কুরআন পড়তে পারবে। অথবা ছাত্রী কুরআন শিক্ষা লাভ করার জন্য পাঠ করতে পারবে। অথবা নারী তার শিশু সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ করবে, শিখানোর জন্য তাদের আগে আগে কুরআন পাঠ করবে। মোটকথা যখনই ঋতুবতী নারী কুরআন পাঠ করার প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই তার জন্য তা পাঠ করা জায়িয কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কুরআন পাঠ না করার কারণে যদি ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে স্মরণ রাখার জন্য তিলাওয়াত করবে- কোন অসুবিধা নেই। স্কলারদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বিনা প্রয়োজনেও তথা সাধারণ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে ঋতুবতীর জন্য কুরআন পাঠ করা জায়িয।

প্রশ্ন ঃ ১৫৯) স্ত্রীকে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও তাকে চুম্বন করলে কি গোসল করতে হবে?

সাধারণ স্পর্শ, শৃঙ্গার, চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আনন্দ বিনোদন করলে তাদের উপর গোসল ফরয হবে না। তবে যদি উভয়ের থেকে বীর্যস্খলিত হয়, তবে উভয়ের উপর গোসল করা ফরয হবে। একজনের থেকে বীর্যস্খলিত হলে শুধু তার উপরই গোসল ফরয হবে। এ বিধান হচ্ছে সাধারণ শৃঙ্গার, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি তারা সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে নারী-পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে- যদিও তাদের কারোই বীর্যস্খলিত না হয়।

কেননা আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ বলেন,

"স্ত্রীর চার শাখার (দু'হাত, দু'পা) মাঝে বসে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই গোসল ফরয হবে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "যদিও বীর্যপাত না হয়।" এ বিষয়টি অনেক লোকের অজানা। তাদের ধারণা নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে বীর্যপাত না হলে তাদের উপর গোসল ফরয নয়। কিন্তু এটা বিরাট ধরনের অজ্ঞতা। অতএব সহবাস হলেই সর্বাবস্থায় গোসল ফরয হবে। কিন্তু সহবাস না করে যে কোন প্রকারে আনন্দ করলে গোসল ফরয হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৬০) ছোট্ট শিশুর পেশাব যদি কাপড়ে লাগে, তবে তার বিধান কি?

এই মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, শিশু যদি পুরুষ হয় এবং শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ তার খাদ্য হয়, তবে তার পেশাব হালকা নাপাক। এটাকে পবিত্র করার জন্য পানির ছিটা দেয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর এমনভাবে ছিটিয়ে দিবে যাতে সম্পূর্ণ স্থানকে শামিল করে, ঘঁষতে হবে না এবং তাতে এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালতে হবে না যে, চিপে পানি বের করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, একদা একটি শিশু পুত্র নিয়ে এসে তাঁর কোলে দেয়া হল। সে পেশাব করে দিলে, তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তার উপর ছিটা দিলেন, কিন্তু তা ধৌত করলেন না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আর শিশু যদি কন্যা সন্তান হয়, তবে তার পেশাব অবশ্যই ধৌত করতে হবে। কেননা মেয়ে শিশুর পেশাব মূলতঃ অপবিত্র। উহা ধৌত করা ওয়াজিব। কিন্তু শিশু পুত্রের পেশাবে ব্যতীক্রম। কেননা সুন্নাতে নববীতে এর প্রমান বিদ্যমান। (নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন ঃ ১৬১) জনৈক নারী পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে। কিন্তু পরিচিতি নিয়মেই তার স্রাব প্রবাহিত হচ্ছে। আরেক পঞ্চাশোর্ধ নারীর স্রাব পরিচিতি নিয়মে হয় না; বরং হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হয়। এদের বিধান কি?

নির্দিষ্ট ও পরিচিত নিয়মে যে নারীর স্রাব নির্গত হচ্ছে, তার উক্ত স্রাব বিশুদ্ধ মতে হায়েয বা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ঋতুবতী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ কোন বয়স নেই। অতএব ঋতুর নির্দিষ্ট বিধান সমূহ এই নারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ- সলাত, সিয়াম ও স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকা। স্রাব বন্ধ হলে ফরয গোসল করা এবং ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা আদায় করা।

আর যে নারীর হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হচ্ছে, যদি এটা ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে থাকে, তবে তা হায়েয বা ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। আর ঋতুর সময়ে না হলে তা হায়েয নয়। কিন্তু তার স্রাব যদি পরিচিত ঋতুস্রাবের মত হয় কিন্তু কখনো আগে হয় কখনো পরে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। যখন স্রাব আসবে তখন সলাত, সিয়াম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে আর যখন স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখন গোসল করে পবিত্র হবে। এসমস্ত কথা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী - ঋতুর জন্য বয়সের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই।

প্রশ্ন ঃ ১৬২) গর্ভবতীর রক্তস্রাব দেখা গেলে তা কি ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে?

গর্ভবতীর হায়েয হয় না। কেননা নারীর গর্ভ তো হায়েয বন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই জানা যায়। স্কলারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হিকমতে হায়েযের রক্তকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকেন। গর্ভে সন্তান এসে গেলে ঐ হায়েয বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন নারীর গর্ভধারণের পরও সঠিক নিয়মে হায়েয হতে থাকে। যেমনটি গর্ভধারণের পূর্বে হচ্ছিল। তাদের এই স্রাব ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। কেননা গর্ভধারণ তার মধ্যে প্রভাব ফেলেনি। ফলে ঋতু আপন গতিতে চলমান রয়েছে। অতএব তার এই

স্রাব ঋতুর সবধরণের বিধানকে শামিল করবে। মোটকথা গর্ভবতী থেকে যে স্রাব নির্গত হয়, তা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম প্রকার ঃ গর্ভধারণের পূর্বে যে নিয়মে ঋতু চলছিল গর্ভের পরেও যদি সেই নিয়মে স্রাব চলতে থাকে, তবে উহা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এখানে গর্ভধারণ তার স্বাভাবিক স্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে উহা হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ আকস্মিক কোন কারণ বশতঃ স্রাব নির্গত হওয়া। দুর্ঘটনাবশতঃ ভারী কোন বস্তু বহন করা বা কোন স্থান থেকে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। তখন তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তা শিরা থেকে নির্গত। তাই সে সলাত, সিয়াম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে না; পবিত্র অবস্থায় যা করতো তা সবই স্বাভাবিক নিয়মে করতে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৩) ঋতু সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট দিন বলে কি কিছু আছে?

বিশুদ্ধ মতে ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দিন নির্দিষ্ট বলে কিছু নেই। কেননা আল্লাহ বলেন ঃ অর্থাৎ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

এখানে স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধতা নির্দিষ্ট দিনের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। এর সম্পর্ক হচ্ছে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে।

এ থেকে বুঝা যায়, বিধানটির করণ হচ্ছে ঋতু থাকা বা না থাকা। যখনই ঋতু পাওয়া যাবে, বিধান প্রযোজ্য হবে। যখনই পবিত্র হয়ে যাবে, তার বিধান সমূহও বাদ হয়ে যাবে।

তাছাড়া নির্দিষ্ট দিন বেঁধে দেয়ার কোন দলীলও নেই। অথচ বিষয়টি বর্ণনা করে দেয়ার দরকার। বয়স বা দিনের নির্দিষ্টতা যদি শরীয়ত সম্মত হত, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতে বর্ণিত হত।

অতএব এই ভিত্তিতে নারীদের কাছে পরিচিতি স্রাব যখনই দেখা যাবে, নারী তখনই নিজেকে ঋতুবতী গণ্য করবে। এখানে কোন দিন নির্দিষ্ট করবে না।

কিন্তু নারীর স্রাব যদি চলতেই থাকে বন্ধ না হয়, অথবা সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ হয়, যেমন মাসে একদিন বা দু'দিন তবে তা ইস্তেহাযার স্রাব (বা অসুস্থতা) বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৪) কোন নারীর ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঋতুস্রাব চালু করে সলাত পরিত্যাগ করার বিধান কি?

নিজের ইচ্ছায় ঋতুস্রাব চালু করার কারণে যদি স্রাব চালু হয়ে যায় এবং নারী সলাত পরিত্যাগ করে তবে উক্ত সলাতের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা ঋতুস্রাব যখনই দেখা যাবে, তখনই তার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে নারী যদি ঋতুস্রাব বন্ধ করার জন্য কোন ঔষধ গ্রহণ করে এবং তার ফলে স্রাব না আসে, তবে সলাত ও সিয়াম আদায় করবে এবং সিয়ামের কাযা করবে না। কেননা সে তো ঋতুবতী নয়। অতএব কারণ পাওয়া গেলেই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

অতএব যখনই এই অপবিত্রতা পাওয়া যাবে, তার বিধান পাওয়াও যাবে। যখন অপবিত্রতা থাকবে না, কোন বিধি-বিধানও থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৬৫) নির্গত স্রাবের ব্যাপারে নারী যদি সন্দিহান হয় যে, এটা কি হায়েযের রক্ত না কি ইস্তেহাযার রক্ত না কি অন্য কিছুর রক্ত? এবং সে পার্থক্যও করতে পারে না। তবে সে উহা কি গণ্য করবে?

নারীর গর্ভ থেকে নির্গত রক্ত হায়েযেরই হয়ে থাকে। কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তা ইস্তেহাযার (অসুস্থতা) স্রাব তখন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করবে। অন্যথায় ইস্তেহাযা কিনা সুস্পষ্টভাবে না হওয়া পর্যন্ত নির্গত রক্ত হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৬) সলাতের সময় আরম্ভ হওয়ার পর ঋতু হলে তার বিধান কি?

সলাতের সময় প্রবেশ করার পর যদি নারীর ঋতুস্রাব শুরু হয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ যোহরের সলাত শুরু হওয়ার আধাঘন্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হল, তবে পবিত্র হওয়ার পর এই ওয়াক্তের সলাত কাযা আদায় করবে। কেননা সে পবিত্র

থাকাবস্থায় তার উপর সলাত আবশ্যক হয়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

আর ঋতু চলমান অবস্থায় যে সমস্ত সলাত পরিত্যাগ করবে, তার কাযা আদায় করবে না। কেননা নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ "নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে সলাত আদায় করে না ও সিয়াম রাখে না?" (সহীহ বুখারী) সমস্ত উলামায়ে কেরাম একথার উপর ঐকমত্য যে, ঋতু চলাবস্থায় ছুটে যাওয়া সলাতের কাযা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৬৭) জনৈক নারীর ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এই দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সে এখন কি করবে?

এই নারীর ঋতুর দিন ছিল ছয় দিন। কিন্তু তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নয় দিন বা দশ দিন বা এগার দিন হয়ে গেছে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। কেননা নাবী ﷺ ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্রাব অবশিষ্ট থাকবে, নারীও নিজ অবস্থায় থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। পরবর্তী মাসে যদি তার স্রাবের দিন কম হয়ে যায়, তবে স্রাব বন্ধ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও আগের মাসের সমান দিন পূর্ণ না হয়।

মোটকথা নারী যতদিন ঋতু বিশিষ্ট থাকবে ততদিন সে সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। চাই ঋতুর দিন পূর্ববর্তী মাসের বরাবর হোক বা কম হোক বা বেশী হোক। স্রাব বন্ধ হয়ে পবিত্র হলেই গোসল করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৮) ঋতু শুরু হওয়ার দু'দিন পূর্বে নারীর গর্ভ থেকে যে হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ নির্গত হয় তার বিধান কি?

হলুদ রংয়ের এই তরল পদার্থ যদি ঋতুর হওয়ার পূর্বে নির্গত হয়, তবে তা কিছু নয়। কেননা উম্মে আত্বীয়্যা (রা.) বলেন ঃ "আমরা হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।" (সহীহ বুখারী)

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে আত্বীয়্যা (রা.) বলেন ঃ "পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে আমরা তাকে কোন কিছুই গণ্য করতাম না।" ঋতুর পূর্বের এই হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ যদি ঋতু বের হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা কোন কিছু নয়। কিন্তু নারী যদি উহা ঋতুর সূচনা স্বরূপ মনে করে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করবে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৯) জনৈক নারী মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত শুরু করেছে। এভাবে নয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার স্রাব দেখা গেছে। তিন দিন স্রাব প্রবাহমান ছিল। তখন সলাত আদায় করেনি। তারপর পবিত্র হলে গোসল করে এগার দিন সলাত আদায় করেছে। তারপর আবার তার স্বাভাবিক মাসিক শুরু হয়েছে। সে কি ঐ তিন দিনের সলাত কাযা আদায় করবে? নাকি তা হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে?

নারীর গর্ভ থেকে যখনই রক্ত প্রবাহিত হবে তখনই তা ঋতু বা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। চাই সেই ঋতুর সময় পূর্বেও ঋতুর সময়ের চাইতে দীর্ঘ হোক বা কম হোক। ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পাঁচ দিন বা ছয় দিন বা দশ দিন পর পুনরায় স্রাব দেখা গেছে, তবে সে পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে এবং সলাত আদায় করবে না। কেননা এটা ঋতু। সর্বাবস্থায় এরূপই করবে। পবিত্র হওয়ার পর আবার যদি ঋতু দেখা যায়, তবে অবশ্যই সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু স্রাব যদি চলমান থাকে- সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ না হয়, তবে তা ইস্তেহাযা বা অসুস্থতা বলে গণ্য হবে। তখন তার নির্দিষ্ট দিন সমূহ শুধু সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ১৭০) পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়ার বিধান কি?

ঋতুর ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যা অনেক যার কোন কুল কিনারা নেই। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, গর্ভ বা মাসিক নিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা। পূর্বে মানুষ এত ধরনের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সন্দেহ

নেই সৃষ্টি লগ্ন থেকে নারীর নানান সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এর আধিক্য এত বেশি যে মানুষ তার সমাধানের ক্ষেত্রে হয়রান হয়ে যায়।

তবে মূলনীতি হচ্ছে, নারী যদি নিশ্চিতভাবে ঋতু থেকে পবিত্রতা দেখতে পায়, যেমন নারীদের কাছে পরিচিত সাদা পানি বের হওয়া, বা হলুদ বা মেটে রং বের হওয়া বা ভিজা পাওয়া এগুলো সবই হায়েম বা ঋতু নয়। এগুলো সলাত বা সিয়াম থেকে বাধা দিবে না। স্বামী সহবাসে বাধা থাকবে না। কেননা এট হায়েয নয়। উম্মু আত্বিয়্যা (রা.) বলেন, "পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে, আমরা তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।" এর সনদ সহীহ।

এই ভিত্তিতে, নিশ্চিতভাবে পবিত্র হওয়ার পর এ ধরণের যা কিছুই ঘটুক, তাতে নারীর কোন অসুবিধা নেই। সলাত-সিয়াম ও স্বামী সহবাসে কোন বাধা নেই। কিন্তু পবিত্রতা না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করা যাবে না। কেননা কোন কোন নারী রক্ত বের হওয়াতে কিছুটা শুস্কতা দেখলেই পবিত্রতার চিহ্ন না দেখেই তাড়াহুড়া করে গোসল করে নেয়। এই জন্য মহিলা সাহাবীগণ উম্মুল মু'মেনীন আয়িশা (রা.)-কে দেখানোর জন্য তুলা নিয়ে আসতেন যাতে পীত রংয়ের তরল পদার্থ লেগে থাকতো। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, "সাদা পানি নির্গত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করবে না।" (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ১৭১) ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করার বিধান কি?

ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তাতে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে। কিন্তু এ সমস্ত ঔষধ নারীর জন্য ক্ষতিকারক। একথা সবার জানা যে, মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর সময় মত স্বাভাবিক বিষয়ের গতিতে বাধা দিলে সেখানে অবশ্যই ক্ষতির আশংকা থাকে। নারীর শরীরে তার ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ইহা ব্যবহার করলে অনেক সময় নারীর স্বাভাবিক মাসিক বাধাগ্রস্থ হয় এবং সে পেরেশানী ও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। সলাত-সিয়াম ও স্বামীর সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখিন হয়।

এ জন্য এটা বলা যাবে না যে এটা হারাম। কিন্তু নারীর ক্ষতির দিক চিন্তা করে বলি, এটা ব্যবহার করা উচিত নয়।

আল্লাহ নারীর জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিদায় হাজ্জে নাবী ﷺ উম্মুল মু'মেনীন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি কাঁদছেন। তখন আয়িশা (রা.) উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "কি হয়েছে তোমার, কাঁদছো কেন? আয়িশা (রা.) বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ এ বছর আমি হাজ্জ না করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি ঋতুবতী হয়ে গেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। নাবী ﷺ বললেন, এটা এমন এক বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের মেয়েদের জন্য লিখে দিয়েছেন। (সুতরাং দুঃখ করার কিছু নেই।) (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) অতএব নারীর উচিত হচ্ছে, এ সময় ধৈর্যধারণ করা। ঋতুর কারণে সলাত-সিয়াম করতে না পারলে তো আল্লাহর যিকিরের দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। তাসবীহ-তাহলীল করবে, দান-সদাকা করবে, মানুষের সাথে সদাচরণ করবে, কথা-কাজে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করবে, ইত্যাদি কাজ তো সুন্দর ও অত্যাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল।

প্রশ্ন ঃ ১৭২) হায়েযের রক্ত অনেক সময় পরিধেয় পোশাকে লেগে যায় এবং তা ধোয়ার পরও যদি দাগ থেকে যায় তাহলে সে পোশাকে সলাত আদায় হবে কি?

হ্যাঁ সলাত আদায় হবে। দাগ থাকলেও যদি তা ধুয়ে পরিস্কার করা হয় তাহলে সে পোশাকে সলাত আদায় বৈধ।

প্রশ্ন ঃ ১৭৩) চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নিফাসের স্রাব চলতে থাকলে কি করবে?

কোন পরিবর্তন ছাড়াই যদি নেফাস বিশিষ্ট নারীর স্রাব চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চলতে থাকে- যদি চল্লিশ দিনের পরের স্রাব ঋতুস্রাবের সময়ে হয়ে থাকে, তবে তা হয়েয বা ঋতু স্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী স্বাভাবিত ঋতু স্রাবের সময়ে না হয়, তবে সে সম্পর্কে স্কলারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল স্কলার বলেন, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। আর প্রবাহিত রক্ত ইস্তেহাযা বা অসুস্থতা বলে গণ্য করবে।

আরেকদল স্কলার বলেন, সে অপেক্ষা করবে এবং ষাট দিন পূর্ণ করবে। কেননা ষাট দিন পর্যন্ত নেফাস হয়েছে, এমন অনেক নারীও পাওয়া গেছে। এটা বাস্তব বিষয়। কেননা প্রকৃত পক্ষে কোন কোন নারীর ষাট দিন পর্যন্তই নেফাস হয়েছে। অতএব এই ভিত্তিতে ষাট দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর স্বাভাবিক ঋতু স্রাবের দিকে ফিরে যাবে। আর সেই মাসিকের সময় অপেক্ষা করে পবিত্র হলে গোসল করে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। এরপরও যদি স্রাব চলতেই থাকে তখন উহা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

কিন্তু উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ - এর যুগে নেফাস বিশিষ্ট নারীগণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (সহীহ তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) অধিকাংশ স্কলার এমতই পোষণ করেন যে, চল্লিশ দিনের পর স্রাব নির্গত হতে থাকলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং গোসল করে সলাত ইত্যাদি শুরু করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৭৪) নিফাসের চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র হয়ে গেলে বা চল্লিশ দিনের পর পুনরায় স্রাব দেখা গেলে কি করবে?

নিফাস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়িয নয়। যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে সে পবিত্র হয়ে যায়, তবে গোসল করে সলাত আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব এবং সলাতও বিশুদ্ধ। এ অবস্থায় স্বামী সহবাসও তার জন্য জায়িয। কেননা আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

যতক্ষণ অপবিত্রতা তথা রক্ত বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ স্বামীর সাথে সহবাস জায়িয হবে না। পবিত্র হয়ে গেলেই সহবাস জায়িয হবে। যেমনটি সলাত আদায় করাও তার জন্য ওয়াজিব। চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হলে, নেফাস অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধতা শেষ হয়ে যাবে। তবে সহবাসের ফলে পুনরায় রক্ত চালু হয়ে যেতে পারে।

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর এবং পবিত্র হওয়ার পর যদি আবার রক্ত দেখা যায়, তবে উহা মাসিকের রক্ত হিসেবে গণ্য করবে। নিফাসের রক্ত নয়। মাসিকের রক্ত নারীদের কাছে পরিচিতি। যখনই উহা অনুভব করবে মনে করবে উহা ঋতুস্রাব। এই রক্ত যদি প্রবাহমান থাকে এবং সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ হয় না, তবে উহা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তখন ঋতুর নির্দিষ্ট দিন সমূহ অপেক্ষা করবে এবং অবশিষ্ট দিন সমূহ পবিত্র হিসেবে গণ্য করবে এবং গোসল করে সলাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৭৫) জনৈক নারীর তৃতীয় মাসেই গর্ভপাত হয়ে গেছে। সে কি সলাত আদায় করবে, না সলাত পরিত্যাগ করবে?

স্কলারদের মতে, নারীর গর্ভ যদি তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পড়ে যায়, তবে সে সলাত আদায় করবে না। কেননা নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তখন তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সে সলাত থেকে বিরত থাকবে।

স্কলারগণ বলেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স ৮১ (একাশি) দিন অতিবাহিত হলে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। এ সময়টি তো তিন মাসের অনেক কম। যদি নিশ্চিত হয় যে, তিন মাস বয়সের ভ্রূণ পতিত হয়ে গেছে, তবে নির্গত রক্ত নিফাসের রক্ত বলেই গণ্য হবে। কিন্তু এই গর্ভপাত যদি ৮০ দিনের কমে হয় তবে নির্গত রক্ত নষ্ট রক্ত বলে গণ্য হবে। আর সে কারণে সলাত প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে না।

প্রশ্নকারী এই নারীর উপর আবশ্যক হচ্ছে, স্মরণ করার চেষ্টা করবে ৮০ দিনের কম বয়সে যদি গর্ভপাত হয়ে থাকে এবং সে জন্য সলাত পরিত্যাগ করে থাকে, তবে পরিত্যাক্ত সলাতের কাযা আদায় করবে। সলাত কত ওয়াক্ত ছুটেছে তা নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে না পারলে অনুমানের ভিত্তিতে কাযা আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৭৬) অসুস্থতার কারণে যদি কোন নারীর রক্তস্রাব নির্গত হতেই থাকে, তবে কিভাবে সে সলাত ও সিয়াম আদায় করবে?

এই নারীর অসুখ শুরু হওয়ার পূর্বে তথা গত মাসে তার ঋতুর যে দিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল, সেই নির্দিষ্ট দিন সমূহে সে নিজেকে ঋতুবতী হিসেবে গণ্য করে সলাত-সিয়াম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত মাসগুলোর

প্রথম দিকে তার ছয়দিন ঋতু ছিল, তারপর এক সময় তার অসুখ শুরু হয়েছে, এক্ষেত্রে সে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিকে ছয় দিন অপেক্ষা করবে এবং সলাত সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। এ দিন সমূহ শেষ হলেই গোসল করে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। এ নারী বা তার মত নারীদের সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে,

ক) ফরয সলাতের সময় হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গরূপে লজ্জাস্থান ধৌত করবে।
খ) তারপর সেখানে প্যাড জাতীয় কোন কিছু বেঁধে নেবে।
গ) এরপর ওযূ করবে এবং সলাত আদায় করবে।

সলাতের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এরূপ ওযূ ইত্যাদি কাজ করবে না। ফরয সলাতের সময় ব্যতীত অন্য সময় নফল সলাত পড়তে চাইলেও এভাবে ওযূ ইত্যাদি করবে।

এ অবস্থায় যেহেতু বারবার এতকাজ করা তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই দু'সলাতকে একত্রিত করা জায়িয। যোহরের সাথে আসরের সলাত আদায় করে নিবে বা আসরের সাথে যোহরের সলাতকে আদায় করবে। এবং মাগরিবের সাথে ইশার সলাত আদায় করবে অথবা ইশার সময় মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করবে। যাতে করে তার একবারের পরিশ্রম দু'সলাত যোহর ও আসরের জন্য যথেষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়বারের পরিশ্রম মাগরিব ও ইশার জন্য যথেষ্ট হয়। আর একবার ফযর সলাতের জন্য। অর্থাৎ- পাঁচবার পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য লজ্জাস্থান ধৌত করা, প্যাড বাঁধা, ওযূ করা প্রভৃতি কষ্টকর বিষয়। তাই এর পরিবর্তে তিনবারেই একাজ আদায় হয়ে যাবে। কষ্টও অনেক লাঘব হবে। (আল্লাহই তাওফীক দাতা ও তিনিই অধিক জ্ঞাত আছেন)

প্রশ্ন ঃ ১৭৭) বেনামাযী স্বামীর সাথে মুসলিম নামাযী স্ত্রীর বসবাস করার বিধান কি? তাদের কয়েকজন সন্তানও আছে।

কোন নারী যদি এমন লোককে বিবাহ করে, যে সলাত আদায় করে না, জামাআতের সাথেও না বাড়ীতেও একাকি না। তার বিবাহ বিশুদ্ধ নয়। কেননা সলাত পরিত্যাগকারী কাফির। যেমনটি আল্লাহর সম্মানিত কিতাব, পবিত্র সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি সমূহ একথাটি প্রমাণ করে। আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব বলেন ঃ "নাবী ﷺ -এর সাহাবীগণ সলাত ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফির মনে করতেন না।" (তিরমিযী)

কাফিরের জন্য কোন মুসলিম নারী বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন ঃ "যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

বিবাহের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি স্বামী সলাত পরিত্যাগ করা শুরু করে তবে তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসলে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কতক স্কলার বলেছেন, বিবাহ ভঙ্গের বিষয়টি ঈদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত। যদি ঈদ্দত পার হয়ে যায় তারপর সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তবে নতুন চুক্তি করে আবার উক্ত স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। উক্ত মহিলার জন্য আবশ্যক হচ্ছে বেনামাযী স্বামী থেকে আলাদা থাকবে। তাকে মেলামেশা করতে দিবে না- যতক্ষণ না সে তাওবা করে সলাত আদায় করে। যদিও তাদের সন্তান থাকে। কেননা এ অবস্থায় পিতার কোন অধিকার নেই সন্তানদের প্রতিপালনের।

প্রশ্ন ঃ ১৭৮) বেনামাযীর সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়ার বিধান কি?

এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, তারা যেন কোন বেনামাযীর সাথে মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন না করেন। কেননা বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। এক্ষেত্রে তারা যেন নিকটাত্বীয় বা বন্ধুর সাথে কোন আপোষ না করেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭৯) যারা নিক্বাব করে নিক্বাব পরে কি সলাত আদায় করা যাবে?

নারী যদি নিজ গৃহে অথবা এমন স্থানে সলাত আদায় করে, যেখানে পরপুরুষ আগমণ করবে না। তবে তার জন্য শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় খোলা রাখা। যাতে করে সিজদার সময় কপাল ও নাক এবং উভয় হাত মাটিতে রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সে যদি এমন স্থানে সলাত আদায় করে সেখানে বেগানা পুরুষের আনাগোনা রয়েছে, তবে অবশ্যই মুখমন্ডল ঢেকে সলাত আদায় করবে। কেননা গাইর মাহরাম (যার সাথে বিবাহ সিদ্ধ এমন পর পুরুষের) সামনে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাদের সামনে মুখ খোলা জায়িয নয়। কিন্তু মুখমন্ডল ঢেকে রাখবে দাঁড়ানো, বসা- সর্বাবস্থায়। তবে সিজদার সময় মুখমন্ডলের কাপড় সরিরে কপাল ও নাকের উপর সিজদা করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৮০) হাত মোজা পরে কি সলাত আদায় করা যাবে?

হাত মোজা পরিধান করা শরীয়ত সম্মত। মহিলা সাহাবীরা এরূপই করতেন। কেননা নাবী ﷺ নারীদের ইহরাম বাঁধার নিয়মের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঃ "ইহরামকারী নারী নিক্বাব পরবে না হাত মোজাও পরিধান করবে না।" (সহীহ বুখারী) এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল হাত মোজা পরিধান করা। অতএব পরপুরুষের উপস্থিতিতে হাত মোজা পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ ১৮১) নারীদের কাতারের বিধান কি? তাদের জন্য উত্তম কাতার শেষেরটি এবং অনুত্তোম কাতার প্রথমটি একথাটি কি সর্বাবস্থায় নাকি একথা নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে কোন আড়াল না থাকলে?

নারী ও পুরুষ যদি একই স্থানে জামাআতবদ্ধ হয়ে সলাতে দাঁড়ায় তবে সেক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রথম কাতারের চেয়ে শেষের কাতার উত্তম। যেমনটি নাবী ﷺ বলেন, "নারীদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরগুলো আর অনুত্তোম কাতার হচ্ছে প্রথমগুলো।" (সহীহ মুসলিম) এটা একারণেই যে, কাতার যত পিছন দিকে হবে ততই তা পুরুষদের থেকে দূরে হবে। আর যত আগের দিকে হবে ততই পুরুষদের নিকটবর্তী হবে। তাই তাদের কাতার পুরুষদের থেকে যতদূরে হবে ততই কল্যাণ জনক হবে। অবশ্য এটা একই মসজিদের ভিতরের কথা। আর নারীদের সলাতের জন্য যদি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করা থাকে- যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে দেখা যায়- তবে সেক্ষেত্রে পুরুষদের মত তাদের প্রথম কাতারই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ ১৮২) জুমুআর দিবসে গোসল করার বিধান কি নারী ও পুরুষের সকলের জন্য? এ দিনের এক বা দু'দিন পূর্বে গোসল করার হুকুম কি?

জুমুআর দিবসে গোসল ও সাজ-সজ্জার বিধান শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই। কেননা সেই জুমুআর সলাতে উপস্থিত হবে। গোসল ও সৌন্দর্য গ্রহণ পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। নারীদের জন্য এটা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে যে কোন মানুষ নিজের শরীরে বা অঙ্গে ময়লা-আবর্জনা দেখতে পেলেই তা পরিষ্কার

করবে। কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামে প্রশংসিত বিষয়, এতে উদাসীনতা কারো জন্য উচিত নয়।

কিন্তু জুমুআর একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করলে কোন উপকার নেই। কেননা এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ শুধুমাত্র জুমুআর দিবসকে কেন্দ্র করেই বলা হয়েছে। আর এ সময়টি হচ্ছে জুমুআর দিবস ফযর উদিত হওয়ার পর থেকে জুমুআর সলাতের পূর্ব পর্যন্ত। এটাই হচ্ছে গোসল করার সময়। কিন্তু একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করা জুমুআর দিবসের জন্য যথেষ্ট হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৮৩) জুমুআর দিন মহিলারা কত রাক'আত সলাত আদায় করবে?

নারী যদি মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে জুমুআ আদায় করে, তবে ইমামের অনুসরণ করে দু'রাক'আতই আদায় করবে। কিন্তু সে যদি নিজ গৃহে সলাত আদায় করে, তবে চার রাক'আত যোহর আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৮৪) জনৈক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স ছয় মাস হলে তা পড়ে যায়। সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর ও ক্লান্তিকর কাজ করতো এবং সেই সাথে রমাদান মাসে সিয়ামও পালন করতো। তার আশংকা হচ্ছে এই গর্ভপাতের কারণ সে নিজেই। কারণ গর্ভ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতো। তাছাড়া জানাযা না পড়েই উক্ত মৃত সন্তানকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তার জানাযা না পড়া কি ঠিক হয়েছে? আর এই মহিলাই বা কি করবে, যে কঠিন পরিশ্রম করার কারণে বাচ্চা মারা গেছে এই অনুশোচনায় ভুগছে?

চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি গর্ভস্থ সন্তান পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা ওয়াজিব। কেননা চার মাস পূর্ণ হলে প্রত্যেক ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেয়া হবে। যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত ঃ "তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে উহা মাংস পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর

আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইহা একশত বিশ দিন অর্থাৎ চার মাস। সে যদি এই সময়ের পর মাতৃগর্ভ থেকে পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে এবং জানাযা পরাতে হবে। আর সে মানুষের সাথে ক্বিয়ামত দিবসে পূণঃরুত্থিত হবে। কিন্তু চার মাসের কম বয়সে পড়ে গেলে তাকে গোসল দিতে হবে না, কাফন পরাতে হবে না এবং জানাযাও দিতে হবে না। কেননা ওটা গোশতের একটি টুকরা মানুষ নয়।

প্রশ্নে উল্লেখিত সন্তানের বয়স ছয় মাস হওয়ার পর গর্ভপাত হয়ে গেছে। ওয়াজিব হচ্ছে, তার গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও জানাযা পড়া। কিন্তু যেহেতু এর কোনটাই করা হয়নি, তাকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তবে কবর কোনটি জানা থাকলে তার কবরে গিয়ে জানাযা সলাত আদায় করতে হবে। আর জানা না থাকলে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করে নিবে। যে কোন ভাবে একবার জানাযা পড়ে নিলেই হল।

আর প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলাটির যে আশংকা তার কোন ভিত্তি ও প্রভাব নেই। এনিয়ে অনুশোচনায় ভুগা উচিত নয়। অনেক ভ্রূণই এভাবে মাতৃগর্ভে কারণে-অকারণে মরে যায় এবং পড়ে যায়। এনিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। অতএব আবশ্যক হচ্ছে এই সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করা। (আল্লাহ তাওফীক দাতা ও ক্ষমাকারী)

প্রশ্ন ঃ ১৮৫) জনৈক বালিকা ছোট বয়সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। সে অজ্ঞতা বশতঃ ঋতুর দিনগুলোতে সিয়াম পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি?

তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, ঋতু অবস্থায় যে কয়দিনের সিয়াম আদায় করেছে সেগুলোর কাযা আদায় করা। কেননা ঋতু অবস্থায় সিয়াম পালন করলে বিশুদ্ধ হবে না এবং গ্রহণীয় হবে না। যদিও তা অজ্ঞতা বশতঃ হয়ে থাকে। তাছাড়া পরবর্তীতে যে কোন সময় তা কাযা করা সম্ভব। কাযা আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

এর বিপরীতে আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, অল্প বয়সে জনৈক বালিকা ঋতুবতী হয়ে গেছে। কিন্তু লজ্জার কারণে বিষয়টি কারো সামনে প্রকাশ করেনি এবং তার সিয়ামও পালন করেনি। এ উপর ওয়াজিব হচ্ছে, উক্ত মাসের সিয়াম কাযা আদায় করা। কেননা নারী ঋতুবতী হয়ে গেলেই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা তার উপর ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ১৮৬) সন্তানকে দুগ্ধদানকারীনী কি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে? নাকি সিয়ামের বিনিময়ে খাদ্য দান করবে?

দুগ্ধদানকারীনী সিয়াম রাখার কারণে যদি সন্তানের জীবনের আশংকা করে অর্থাৎ সিয়াম রাখলে স্তনে দুধ কমে যাবে ফলে শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তবে মায়ের সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয। কিন্তু পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নিবে। কেননা এ অবস্থায় সে অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ। যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে (সিয়াম পালন করে) গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

অতএব সিয়াম রাখার ব্যাপারে যখনই বাধা দূর হবে তখনই কাযা আদায় করবে। চাই তা শীতকালে অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে হোক অথবা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছর হোক। কিন্তু ফিদইয়া স্বরূপ মিসকীন খাওয়ানো জায়িয হবে না। তবে ওযর যদি চলমান থাকে অর্থাৎ সার্বক্ষণিক সিয়াম রাখার বাধা দেখা যায় যা বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তখন প্রতিটি সিয়ামের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবে।

প্রশ্ন ঃ ১৮৭) ঋতুবতী যদি ফযরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফযর হওয়ার পর গোসল করে, তবে তার সিয়ামের বিধান কি?

ফযরের পূর্বে পবিত্র হয়েছে এব্যাপারে নিশ্চিত হলে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা নারীদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, ধারণা করে যে পবিত্র হয়ে গেছে অথচ সে আসলে পবিত্র হয়নি। এই কারণে নারীরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে আসতেন তাদের লজ্জাস্থানে তুলা লাগিয়ে উক্ত তুলার চিহ্ন দেখানোর জন্য যে, তারা কি পবিত্র হয়েছেন? তখন তিনি বলতেন, 'তোমরা তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ না তোমরা সাদা পানি না দেখ।' অতএব নারী অবশ্যই ধীরস্থীরতার সাথে লক্ষ্য করবে এবং নিশ্চিত হবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে কিনা। যদি পবিত্র

হয়ে যায় তবে সিয়ামের নিয়ত করে নিবে। ফযর হওয়ার পর গোসল করবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সলাতের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত গোসল সেরে নেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে করে সময়ের মধ্যেই ফযর সলাত আদায় সম্ভব হয়।

ঋতুবতী নারীর মত অন্যান্য নাপাক ব্যক্তিগণ। (যেমন স্ত্রী সহবাসে বা স্বপ্ন দোষের কারণে নাপাক) নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করতে পারবে। এবং ফযর হওয়ার পর গোসল করে সলাত আদায় করবে। কেননা নাবী ﷺ কখনো কখনো স্ত্রী সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করতেন এবং ফযর হওয়ার পর সলাতের আগে গোসল করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন ঃ ১৮৮) পবিত্র হওয়ার পরেও কি দেরী করে গোসল করা ঠিক?

শুনা যায় অনেক নারী ফযরের পূর্বে বা পরে ঋতু থেকে পবিত্র হয়, কিন্তু তারা গোসল করতে দেরী করে সলাতের সময় পার করে দেয়। পরিপূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার যুক্তিতে সূর্য উঠার পর গোসল করে। কিন্তু এটা মারাত্মক ধরনের ভুল। চাই তা রমাদান মাসে হোক বা অন্য মাসে। কেননা তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সময়মত সলাত আদায় করার জন্য দ্রুত গোসল সেরে নেয়া। সলাতের স্বার্থে গোসলের ওয়াজিব কাজগুলো সারলেই যথেষ্ট হবে। তারপর দিনের বেলায় আবারো যদি পরিপূর্ণরূপে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে, তবে কি অসুবিধা আছে?

প্রশ্ন ঃ ১৮৯) মাহরাম ছাড়া কোন নারী যদি হাজ্জ সম্পাদন করে, তবে কি উহা বিশুদ্ধ হবে? বুদ্ধিমান বালক কি মাহরাম হতে পারে? মাহরাম হওয়ার জন্য কি কি শর্ত আবশ্যক?

তার হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাফরমানী। কেননা তিনি বলেছেন ঃ "নারী কোন মাহরাম ছাড়া যেন সফর না করে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

বালেগ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি এমন বালক মাহরাম হতে পারে না। কেননা তার নিজেরই তো অভিভাবক ও তত্বাবধান দরকার। অতএব এধরণের মানুষ কি করে অন্যের অভিভাবক বা তত্বাবধায়ক হতে পারে?

মাহরাম ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, সে মুসলিম হবে, পুরুষ হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবে এবং বিবেক সম্পন্ন হবে। এগুলো শর্তের কোন একটি না থাকলে সে মাহরাম হতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, অনেক নারী মাহরাম ছাড়া একাকী সফর করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মাহরাম পুরুষ তাদেরকে এয়ারপোর্টে বিমানে তুলে দেয় এবং পরবর্তী এয়ারপোর্ট আরেক মাহরাম তাদেরকে রিসিভ করে থাকে। আর সে তো প্লেনের মধ্যে নিরাপদেই থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তিটি অসাড় ঃ কেননা তার মাহরাম তো এরোপ্লেনে তাকে উঠিয়ে দিতে পারে না। খুব বেশী তাকে ওয়েটিং হল বা ইমিগ্রশন পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারে। কখনো প্লেন ছাড়তে দেরী হতে পারে। কখনো কারণ বশতঃ গন্তব্য এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এ নারীর কি অবস্থা হবে? কখনো হয়তো গন্তব্য এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করল ঠিকই কিন্তু মাহরাম ব্যক্তিটি তাকে রিসিভ করতে পারল না। হয়তো সে অসুস্থ হয়ে গেল, কোন সড়ক দুর্ঘটনা হল ইত্যাদি যে কোন কারণ ঘটতে পারে।

উল্লেখিত কারণগুলো কোনটিই হল না। ঠিকঠাক মত প্লেন উড়ল, গন্তব্য এয়ারপোর্টে মাহরাম তাকে রিসিভ করল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে- প্লেনের মধ্যে তার সিটের পাশে এমন লোক বসেছে, যে আল্লাহকে ভয় করে না, ফলে সে নারীকে বিরক্ত করতে পারে বা নারীই তার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাহলেই তো নিষিদ্ধ ফিতনার বীয বপন হয়ে গেল- যেমনটি কারো অজানা নয়। অতএব নারীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং কোন মাহরাম ছাড়া কখনো সফরে বের না হওয়া। অভিভাবক পুরুষদের উপরও ওয়াজিব হাজ্জে তাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, নারীদের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় না দেয়া, নিজেদের আত্নসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রত্যেকে তার পরিবার সম্পর্কে আল্লাহর সমীপে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা এদেরকে আল্লাহ তাদের কাছে আমানত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা যা করতে আদিষ্ট তাই করে।" (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

প্রশ্ন ঃ ১৯০) জনৈক নারীর কথা হচ্ছে, আমি রমাদানে উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু আমার সাথে থাকছে আমার সহদোর বোন, তার স্বামী ও আমার মা। এই উমরায় যাওয়া কি আমার জন্য জায়িয হবে?

এদের সাথে উমরায় যাওয়া আপনার জন্য জায়িয হবে না। কেননা বোনের স্বামী মাহরাম নয়। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি শুনেছি নাবী ﷺ খুতবায় বলেন ঃ "কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জন না হয়। মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে।" তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল আমার স্ত্রী হাজ্জ আদায় করার জন্য বের হয়ে গেছে। আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি? নাবী ﷺ বলেন, "তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ পালন কর।" তার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাইলেন না তোমার স্ত্রীর সাথে কি অন্য কোন নারী আছে না নেই? সে কি যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় সে কি নিরাপদ না নিরাপদ নয়?

প্রশ্নকারী এই নারী মাহরাম না থাকার কারণে যদি উমরায় না যায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। যদিও ইতোপূর্বে সে কখনো উমরা না করে থাকে। কেননা হাজ্জ-উমরা ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর মাহরাম থাকা।

প্রশ্ন ঃ ১৯১) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার হাজ্জের বিধান কি?

একথা সুবিদিত যে, স্ত্রী সহবাস ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম; বরং তা ইহরামের সর্বাধিক কঠিন ও বড় নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ বলেন, "হাজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হাজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া জায়িয নয় কোন অশোভন কাজ করা, না কোন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

এর অর্থ হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্বের কাজ সমূহ। অতএব ইহরামের সর্বাধিক কঠিন নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। হাজ্জের ইহরামে থেকে কোন লোক যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে হয় তা প্রথম হালালের পূর্বে হবে অথবা প্রথম

হালালের পর হবে। যদি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস হয়, তবে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবে ঃ

প্রথমতঃ তার ঐ হাজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। চাই উহা ফরয হাজ্জ হোক বা নফল হাজ্জ হোক।

দ্বিতীয়তঃ সে গুনাহগার হবে।

তৃতীয়তঃ হাজ্জের অবশিষ্ট কাজ তাকে পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ- হাজ্জ নষ্ট হওয়া সত্বেও হাজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

চতুর্থতঃ পরবর্তী বছর অবশ্যই তাকে উক্ত হাজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। চাই তা ফরয হাজ্জ হোক বা নফল হাজ্জ হোক। হাজ্জ ফরয হলে তো কাযা আদায় করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সে হাজ্জের ফরযিয়াতের যিম্মা মুক্ত হতে পারে নি। কিন্তু নফল হাজ্জ হলেও তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা হাজ্জ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

তাছাড়া হাজ্জের কাজ শুরু করলে তা ফরয হয়ে যায়। যেমনটি পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। "হাজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হাজ্জ ফরয করবে...।" এই জন্য আমরা বলব, হাজ্জ নফল হোক বা ফরয হোক, যে কোন কারণে তা বিনষ্ট করে ফেললে তা কাযা আদায় করতে হবে।

পঞ্চমতঃ কাফফারা স্বরূপ তাকে জরিমানা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি উট যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া। উটের পরিবর্তে যদি সাতটি ছাগল যবেহ করে তাও জায়িয আছে।

এই বিধান হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হলে। (অর্থাৎ- ১০ তারিখ বড় জামরায় কংকর মেরে মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে) কিন্তু প্রথম হালালের পর সহবাস করলে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবে ঃ

প্রথমতঃ সে গুনাহগার হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহরাম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয়তাঃ কাফফারা হিসেবে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের কোন একটি করবেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। অথবা

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা

গ) তিন দিন সিয়াম রাখবে।

এ তিনটির যে কোন একটি জরিমানা স্বরূপ আদায় করবে।

চতর্থতঃ নতুন করে ইহরামে প্রবেশ করবে। মক্কার হারাম সীমানার বাইরে নিকটতম কোন স্থানে গমণ করে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে এরপর তওয়াফে এফাযা বা হাজ্জের তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। এভাবেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন। যদি প্রশ্ন করা হয় ঃ প্রথম হালাল হওয়ার অর্থ কি?

জবাব ঃ হাজী সাহেব যখন ঈদের দিন (যিলহাজ্জের দশ তারিখে) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করে তখন সে প্রথম হালাল হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইহরামের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায়। আয়িশা (রা.) বলেন, 'নাবী ﷺ এর ইহরাম বাঁধার পূর্বে, এবং হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পরেই আছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। ঈদের দিন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করার মাধ্যমে প্রথম হালাল হবে। এই হালালের পূর্বে সহবাস হলে, উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় আবশ্যক হবে। আর এই হালালের পর সহবাস হলে, উল্লেখিত চারটি বিষয় আবশ্যক হবে। কোন লোক যদি মূর্খতা বশতঃ এই কাজ করে অর্থাৎ- ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম একথা তার জানা নেই, তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। কোন কাফফারা দিতে হবে না। চাই প্রথম হালালের পূর্বে হোক বা পরে হোক। কেননা আল্লাহ বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি অথবা ভুলে যাই তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ "ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমদের কোন গুনাহ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাব ঃ ৫)

যদি প্রশ্ন করা হয় ঃ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ লোক যদি একথা জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সহবাস করলে এত কিছু আবশ্যক হবে বা এই জরিমানা দিতে হবে, জানলে হয়তো সে একাজে লিপ্ত হতো না। তবে এ বিধান কি? তার এই অজ্ঞতার ওযর কি গ্রহণযোগ্য হবে?

জবাব ঃ তার এই ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ওযর হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। বিষয়টি যে হারাম সে ব্যাপারে তার কোনই জ্ঞান না থাকা। কিন্তু বিষয়টি হালাল না হারাম এই বিধান জানার পর, করলে কি লাভ বা না করলে কি ক্ষতি তা জানা আবশ্যক নয়। এই না জানা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না।

এই কারণে জনৈক ব্যক্তি রমাদানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে নাবী ﷺ এর নিকট এসে তার করণীয় কি জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ সহবাস করার সময় সে কাফফারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এথেকে বুঝা যায়, কোন মানুষ যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উক্ত অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে। যদিও এ শাস্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে।

প্রশ্ন ঃ ১৯২) ইহরাম অবস্থায় নারী কিভাবে পর্দা করবে? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত আছে কি?

ইহরাম অবস্থায় নারী যদি মাহরাম নয় এমন কোন পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে বা তার নিকট কোন পুরুষ অতিক্রম করে, তবে অবশ্যই স্বীয় মুখমণ্ডল ঢেকে নিবে। যেমনটি মহিলা সাহাবীগণ (রা.) করতেন। একারণে তাকে কোন ফিদইয়া দিতে হবে না। কেননা পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ঢাকা আল্লাহর নির্দেশ। আর নির্দেশ কখনো নিষেধ হতে পারে না।

পর্দা মুখমণ্ডল স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত নেই। এতে কোন অসুবিধা নেই। পরপুরুষের সামনে এলেই তাকে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে। কিন্তু যদি তাঁবুতে অবস্থান করে এবং সেখানে কোন পরপুরুষ না থাকে, তবে মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে মুখ খোলা রাখা।

প্রশ্ন ঃ ১৯৩) নারী বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়লে করণীয় কি?

যদি সে তাওয়াফে এফাযাসহ হাজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকে এবং শুধুমাত্র বিদায়ী তাওয়াফ বাকী থাকে, তারপর ঋতুবতী হয় তবে বিদায়ী তাওয়াফ বাদ হয়ে যাবে। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'লোকদের আদেশ দেয়া হয়েছে, কাবা ঘরের তাওয়াফ যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয়। তবে বিষয়টি ঋতুবতীদের জন্য হালকা করে দেয়া হয়েছে।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) যখন নাবী ﷺ কে বলা হল যে, উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রা.) ঋতুবতী হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি তাওয়াফে ইফাযা বা হাজ্জের তাওয়াফ করে নিয়েছেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, "তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) তিনি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফকে বাদ করে দিলেন।

কিন্তু তাওয়াফে ইফাযা বা হাজ্জের তাওয়াফ ঋতুবতীর জন্য বাদ হবে না। ঋতুবতী হয় মক্কায় থেকে অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে তাওয়াফে ইফাযা করবে। অথবা সে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে কিন্তু ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে এবং পবিত্র হলে মক্কায় ফিরে এসে শুধুমাত্র হাজ্জের তাওয়াফ করবে। যদি নিজ দেশে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সুন্দর হয়- প্রথমে ওমরা করে নিবে (তাওয়াফ করবে, সাঈ করবে এবং চুল খাট করবে) তারপর হাজ্জের তাওয়াফ করবে।

উল্লেখিত পন্থার কোনটিই যদি সম্ভব না হয়, তবে লজ্জাস্থানে প্যাড বা এজাতীয় কোন কিছু দিয়ে বেঁধে দিবে যাতে করে স্রাবের রক্ত মসজিদে না পড়ে, তারপর হাজ্জের তাওয়াফ করে নিবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা একান্ত জরূরী অবস্থা।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪) জনৈক নারী স্বামীর সাথে ঋতু অবস্থাতেই ইহরাম বাঁধে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর কোন মাহরাম ছাড়াই সে উমরার কাজ সমাধা করে। কাজ শেষ হলে আবার রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বিধান কি?

প্রশ্নের ধরণে বুঝা যায় এ নারী মাহরামের সাথে মক্কায় আগমণ করেছে। কিন্তু ঋতু অবস্থাতেই সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে। ঋতু অবস্থায় তার এই ইহরাম

বিশুদ্ধ। কেননা নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে যুলহুলায়ফার মীকাতে আগমণ করলে আসমা বিনতে উমাইস (রা.) প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি ঋতুবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেন, "গোসল করে তোমার লজ্জাস্থানে কাপড় বা নেকড়া বেঁধে দাও এবং ইহরাম বাধঁ।" (সহীহ মুসলিম)

মক্কায় আসার পর পবিত্র হয়ে মাহরাম ছাড়া যদি উমরার কাজ সম্পাদন করে থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে শহরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু উমরা সম্পাদন করার পর সে যে আবার রক্ত দেখেছে তাতে তার পবিত্রতার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন দাঁড় করায়। আমরা বলব, যদি সে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা দেখে থাকে তবে তার উমরা বিশুদ্ধ। কিন্তু এই পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকলে নতুন করে উমরা করে নিবে। অবশ্য এর জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত যেতে হবে না। শুধুমাত্র তাওয়াফ, সাঈ ও চুল খাট করার কাজগুলো নতুন করে সম্পাদন করবে।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫) জনৈক নারী তাওয়াফে ইফাযা করেনি। ইতোমধ্যে সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। তার ঠিকানা সঊদী আরবের বাইরে। হাজ্জ কাফেলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই দেরী করা সম্ভব হবে না। এবং পরবর্তীতে মক্কা ফিরে আসাটাও তার জন্য দুরহ ব্যাপার। এখন সে কি করবে?

বিষয়টি যদি এরূপই হয় যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজ্জের তাওয়াফ না করেই নারী ঋতুবতী হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় থেকে যাওয়াটাও তার জন্য দুঃসাধ্য অথবা চলে গেলে আবার মক্কা ফেরত আসাটাও অসম্ভব, তবে এ অবস্থায় নিম্নলিখিত দু'টি সমাধানের যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারে ঃ

১) ঋতু বন্ধ করার জন্য ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করবে- যদি তাতে ক্ষতির আশংকা না থাকে- তারপর তাওয়াফ করবে।
২) লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় বেঁধে দিবে যাতে করে মসজিদে রক্ত না পড়ে। তারপর তওয়াফ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) পছন্দ করেছেন।

এর বিপরীত সমাধান হচ্ছে, নিম্নলিখিত দু'টির যে কোন একটি ঃ

১) ইহরামের অবশিষ্ট যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা থেকে বিরত থেকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। অর্থাৎ- স্বামী সহবাসে লিপ্ত হবে না। অবিবাহিতা হলে কোন বিবাহের আকদ করবে না। তারপর পবিত্র হলে তাওয়াফ করবে।

২) অথবা নিজেকে হাজ্জের কর্ম সমূহ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত মনে করবে, এবং হালাল হওয়া যাবে এবং ফিদইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী করবে। কিন্তু এ অবস্থায় তার এই হাজ্জটি হাজ্জ হিসেবে গণ্য হবে না।

সন্দেহ নেই যে, উল্লেখিত এই দু'টি বিষয়ের উভয়টিই কঠিন। কারণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়াটা যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি হাজ্জ বাতিল করে দেয়াটা আরো কঠিন। এ কারণে জরূরী অবস্থা হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.)-এর মতটিই এখানে সঠিক। আর আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের মাঝে কোন অসুবিধা রাখেননি।" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কঠিন কিছু তিনি চান না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

কিন্তু এ নারীর জন্যে যদি সম্ভব হয় চলে গিয়ে পবিত্র হলে আবার ফেরত এসে হাজ্জের তাওয়াফ করা, তবে কোন অসুবিধা নেই। তবে এই সময়ের মধ্যে স্বামী সহবাস জায়িয হবে না। কেননা তওয়াফ না করলে হাজী সাহেব দ্বিতীয় হালাল বা পূর্ণ হালাল হয় না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬) ঋতু এসে যাওয়ার কারণে জনৈক নারী উমরা না করেই মক্কা থেকে ফেরত চলে গেছে। তার বিধান কি?

উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি নারীর ঋতু এসে যায়, তবে ইহরাম বাতিল হবে না। উমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুর কারণে তাওয়াফ-সাঈ না করেই মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে, সে ইহরাম অবস্থাতেই রয়েছে। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফ, সাঈ ও চুল ছোট করে হালাল হওয়া। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। চুল বা নখ কাটবে না, স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করবে না। তবে ইহরাম বাঁধার সময় যদি ঋতুর আশংকায় শর্ত আরোপ করে নেয় যে, যেখানেই বাধাগ্রস্থ হবে সেখানেই সে হালাল হয়ে যাবে। তবে ঋতু আসার পর ইহরাম খুলে ফেললে তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৭) ইহরাম অবস্থায় নারী কি স্বীয় কাপড় বদল করতে পারবে? নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোন পোশাক আছে?

নারী যে কাপড়ে ইহরাম করেছে তা পরিবর্তন করে অন্য কাপড় পরিধান করতে পারে। পরিবর্তন করার দরকার থাক বা না থাক কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যে কাপড় পরবে তাতে যেন বেপর্দা হওয়ার আশংকা না থাকে বা পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ না ঘটে।

নারীর জন্য ইহরামের বিশেষ কোন পোশাক নেই। তার ইচ্ছামত যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারে। তবে নিকাব পরবে না এবং হাতমোজা পরিধান করবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৮) ইহরামকারী নারীর হাত মোজা এবং পা মোজা পরার বিধান কি?

হাতমোজা ব্যবহার করা জায়িয নেই। পায়ের মোজা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। হাত মোজার ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেন, "নারী হাত মোজা পরিধান করবে না।" (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ১৯৯) জনৈক নারী ঋতু অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে। মক্কায় আগমণ করে বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করেছে। তার এই উমরার বিধান কি?

তার উমরা বিশুদ্ধ। যদিও এইদিন বা দু'দিন বা ততোধিক দিন বিলম্ব করে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঋতু থেকে পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পরই ওমরা আদায় করবে। কেননা ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা জায়িয নয়। এজন্য আয়িশা (রা.) উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমণ করলে ঋতুবতী হয়ে পড়েন, তখন নাবী ﷺ তাকে বলেন, "হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করো না।" (সহীহ বুখারী)

যখন সাফিয়া (রা.) ঋতুবতী হয়ে গেলেন, তখন নাবী ﷺ বললেন, সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে নাকি? তিনি ভেবেছিলেন সুফিয়া তাওয়াফে ইফাযা করেন নি। তারা বলল, তিনি তো তাওয়াফে ইফাযা করে নিয়েছেন।

একথা শুনে তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়' । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতএব ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা বৈধ নয় । মক্কায় এসে ঋতুবতী হয়ে পড়লে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব । কিন্তু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ শেষ করে সাঈ করার পূর্বে যদি ঋতু এসে যায়, তবে উমরা পূর্ণ করবে, এতে কোন অসুবিধা নেই । কেননা ঋতুবতীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ রহিত (বাদ) ।

প্রশ্ন ঃ ২০০) মীকাত থেকে ঋতুবতী অবস্থায় জনৈক নারী ইহরাম বাঁধে। মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র খুলে ফেলে। এর বিধান কি?

ঋতুবতী অবস্থায় নারী যদি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে, তারপর মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র খুলে ফেলে তাতে কোন অসুবিধা নেই । কারণ কাপড় পরিবর্তন করে ইচ্ছামত যে কোন বৈধ পোশাক পরিধান করা জায়িয । অনুরূপভাবে পুরুষও পরিধেয় ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে অনুরূপ ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারে । কোন অসুবিধা নেই ।

প্রশ্ন ঃ ২০১) বিশেষ কারণ বশতঃ মেয়েরা কি ঔষুধ খেয়ে তাদের পিরিয়ড দেরী করাতে পারে?

হ্যাঁ পারে ।

প্রশ্ন ঃ ২০২) আমি ওযূ অবস্থায় আমার বাচ্চার ডায়্যাপার পরিবর্তন করেছি বা তাকে পানি দিয়ে নিজ হাতে পরিস্কার করিয়েছি, আমার ওযূ কি ভেঙ্গে গেছে?

না । বাচ্চার ডায়্যাপার পরিবর্তন বা তাকে পানি দিয়ে নিজ হাতে পরিস্কার করালে ওযূ ভেঙ্গে যায় না এবং বাচ্চার লিংগে হাত লাগলেও ওযূ ভাংবে না ।

প্রশ্ন ঃ ২০৩) খালি হাতে সরাসরি গোপন অঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওযূ ভেঙে যাবে?

হ্যাঁ ওযূ ভেঙে যাবে । তবে কাপড়ের উপর দিয়ে স্পর্শ করলে ভাংবে না ।

প্রশ্ন ঃ ২০৪) অজানা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি নিয়ে সলাত আদায় করলে তার বিধান কি?

সলাত সম্পন্ন করার পর জানা গেল যে, কাপড়ে নাপাকি ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি থাকার কথা আগে থেকেই জানতো কিন্তু ভুলে গিয়েছে। সলাত শেষ হওয়ার পর সে কথা স্মরণ হল। এ অবস্থায় তাদের সলাত বিশুদ্ধ হবে। পুনরায় সলাত ফিরিয়ে পড়ার দরকার নেই। কেননা সে তো এই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে না জেনে অথবা ভুলক্রমে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ " হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)

"আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম।" (সহীহ মুসলিম) অর্থাৎ পাকড়াও করলাম না।

প্রশ্ন ঃ ২০৫) মা কি তার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে?

হ্যাঁ পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২০৬) নিজ ঘরে স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে জামাতের সলাতে কি স্ত্রী ইমামতি করতে পারবে?

না, পারবে না। জামাতে পেছনে যদি কোন পুরুষ থাকে তাহলে মহিলা ইমামতি করতে পারে না। মহিলারা শুধু মহিলাদের জামাতে ইমামতি করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২০৭) মহিলারা কি কবর জিয়ারত করতে পারবে?

কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

শিরকের আশংকায় প্রথম দিকে মহিলাদেরকে কবর যিয়ারতের জন্য নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ এতে তার নিজের মৃত্যুর কথা মনে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২০৮) মহিলারা কি মাজারে যেতে পারবে?

মাজারে যেয়ে কোন কিছু চাওয়া, টাকা-পয়সা দেয়া, মানত করা, আগরবাতি, মোমবাতি দেয়া যাবে না। এগুলো সবই শিরক।

প্রশ্ন ঃ ২০৯) জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি?

সন্তানকে খাওয়ানো-পড়ানোর ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কারণ রিযিকের মালিক আল্লাহ। সন্তান নিলে যদি স্ত্রীর শারীরিক কোন সমস্যা হয় তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ২১০) সন্তানের জন্মদিন পালন করা যাবে কি?

সন্তানের জন্মদিন পালন করা যাবে না। কারণ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোনদিন তার নিজের, তার সন্তানদের এবং তার নাতী-নাতনীদের জন্মদিন পালন করেননি।

প্রশ্ন ঃ ২১১) বিবাহ বার্ষিকী বা ম্যারেজ ডে পালন করা যাবে কি?

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বার্ষিকী বা ম্যারেজ ডে পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ২১২) পত্রিকায় রাশিফল দেখা যাবে কি? গণকের কাছে যাওয়া যাবে কি এবং ভাগ্য ফিরানোর জন্য পাথর নেয়া যাবে কি?

পত্রিকায় রাশিফল দেখা যাবে না, গণকের কাছে যাওয়া যাবে না এবং ভাগ্য ফিরানোর জন্য পাথরও নেয়া যাবে না। এগুলো সবই শিরকের অন্তভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ ২১৩) কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পীর-আওলিয়ার কাছে যাওয়া যাবে কি?

কোন প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য পীর-আওলিয়া বা কোন হুজুরের নিকট যাওয়া যাবে না। কোন পীর-আওলিয়া বা হুজুরের নিকট গিয়ে কিছু চাইলেই তা হবে সরাসরি শিরক। মনে রাখতে হবে শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যা কিছু চাওয়ার তা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে চাইতে হবে অন্য কারো নিকট নয়।

প্রশ্ন ঃ ২১৪) কোন অসুখের জন্য অথবা জিন-ভূতের জন্য তাবিজ-কবয নেয়া যাবে কি?

কোন অসুখের জন্য অথবা জিন-ভূতের জন্য তাবিজ-কবয অবশ্যই নেয়া যাবে না। তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের উপর ভরসা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ২১৫) শবেবরাতে কি কোন ইবাদত আছে?

শবেবরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই। শবেবরাত পালন করা, এই রাতে নফল সলাত আদায় করা এবং হালুয়া-রুটি বিলি করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ঃ ২১৬) শবেমিরাজে কি কোন ইবাদত আছে?

শবেমিরাজে রসূল ﷺ উর্ধ আকাশে গিয়েছিলেন। তবে এই দিন পালন করা, এই রাতে নফল সলাত আদায় করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ঃ ২১৭) ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা যাবে কি?

না ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করা যাবে না। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোন দিন ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করেননি তাই আমরাও পালন করতে পারবো না। এটি পালন করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ঃ ২১৮) দশই মহররম শোক দিবস পালন করা যাবে কি?

না, করা যাবে না। দশই মহররমের সাথে শোকের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে হোসাইন (রা.)-কে নিয়ে শিয়ারা যে কার্যক্রম করে তা ইসলামে জায়িয নেই।

প্রশ্ন ঃ ২১৯) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কি নফল সিয়াম (রোযা) পালন করা যাবে?

না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল সিয়াম (রোযা) পালন করা যাবে না? রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমাদানের সিয়াম ছাড়া একটি দিনও [নফল] সিয়াম না রাখে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ২২০) মেহেদী বা হেনা চুল ছাড়া হাতে অথবা পায়ে লাগানো যাবে কি?

মেহেদী বা হেনা চুলে, হাতে, পায়ে, দাড়িতে ছাড়াও শরীরের যে কোন জায়গায়ই লাগানো যাবে এতে ইসলামে কোন নিষেধ নেই।

প্রশ্ন ঃ ২২১) স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত (বেহেশত)?

এ জাতীয় কথা কুরআন বা হাদীসের কোথাও নেই। তবে পিতামাতার সন্তুষ্টিই সন্তানের জান্নাত এটি হাদীসে রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২২) স্ত্রী নফল সিয়াম (রোযা) রেখেছে, এই অবস্থায় যদি স্বামী তাকে সহবাসের জন্য ডাকে তাহলে কি সে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে?

হ্যাঁ। নফল সিয়াম (রোযা) রাখা অবস্থায় যদি স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে তাহলে স্ত্রী তার নয়ল সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহ্বান করবে, তখন সে যেন [তৎক্ষণাৎ] তার নিকট যায়। যদিও সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে।" (তিরমিযী)

প্রশ্ন ঃ ২২৩) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে তাহলে স্ত্রী কি আসতে বাধ্য? এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

রসূল ﷺ আরো বলেছেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে [স্বামী] তার প্রতি নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে [স্ত্রীকে] সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ২২৪) স্বামী যদি তার স্ত্রীর উপর অসন্তষ্ট থাকে তাহলে এই বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর

রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" (তিরমিযী)

প্রশ্ন ঃ ২২৫) ফরয গোসল কিভাবে করতে হবে?

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর অবশ্যই ফরয গোসল করতে হবে। ফরয গোসলের নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে নিয়ত করতে হবে তারপর গোসলের আগে ওযূ করে নিতে হবে শুধু পা ধোয়া ব্যতীত এবং গোসলের পর পা ধুয়ে নিতে হবে। যদি ঐ মুহূর্তে কোন কারণে গোসল করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততপক্ষে সম্পূর্ণরূপে ওযূ করে নিতে হবে এবং পরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল সেরে নিতে হবে। এই ফরয গোসল ব্যতীত কোন সলাতই আদায় করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ২২৬) ঠান্ডার সময় কেউ যদি নাপাক হয়, তবে কি সে তায়াম্মুম করবে?

নাপাক হলেই গোসল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

কিন্তু রাতে যদি শীত প্রচন্ড হয় এবং ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে সক্ষম না হয়, তবে সম্ভব হলে পানি গরম করে নিতে হবে। কিন্তু পানি গরম করার ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করবে এবং সলাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ ২২৭) ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রূপার কি যাকাত দিতে হবে?

যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম বা ৭.৫০ ভরি স্বর্ণ অথবা ৫৯৫গ্রাম বা ৫২.৫০ ভরি রূপা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার যাকাত ফরয।

প্রশ্ন ঃ ২২৮) মহিলারা বিয়ের মোহরাণার অর্থের উপর যাকাত কিভাবে দিবে?

'মাহর' (মোহরাণা) বিধানের মাধ্যমে ইসলাম নারীদের জন্য এক অনন্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কনে, বরের সাথে তার বিবাহবন্ধনে স্বীকৃতির সম্মানীস্বরূপ, বরের কাছ থেকে মাহর পেয়ে থাকে। মাহর বাবদ প্রাপ্ত জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে। মাহরের অর্থ নিসাব মাত্রার হলে অথবা অন্যান্য

যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। মোহরাণার যে অর্থ আদায় করা হয়নি তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ এই অর্থ তার আওতাধীনে নেই।

প্রশ্ন ঃ ২২৯) স্ত্রীর ব্যবহৃত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি? নিসাবের কম পরিমাণ স্বর্ণ স্বামীর অর্থের সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে স্বামীকে স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি?

স্ত্রীর অলংকার বা সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে স্ত্রীর উপরই যাকাত ফরয হবে। তার সম্পদের যাকাত আদায় করা স্বামীর জন্য জরুরী নয়। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে। নিসাব পূরণের জন্য স্বামীর অর্থের সাথে স্ত্রীর অলংকার বা অর্থ-সম্পদকে মিলাতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৩০) প্রাপ্ত বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েকে যদি স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তাহলে কী সেটা পিতার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতাকে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে?

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। মেয়েকে যে স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তা যদি তাকে পুরোপুরিভাবে দেয়া হয় অর্থাৎ সে যদি তার মালিক হয়ে যায় তাহলে সে সম্পদের যাকাত আদায় করা পিতার উপর ফরয নয়। কিন্তু মেয়েকে তার নিজের যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৩১) আমার (স্ত্রী) পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। আমার নিজের কোন আয় নেই, উক্ত স্বর্ণের কি যাকাত দিতে হবে?

অলংকারের যিনি মালিক যাকাত তাকেই দিতে হবে। অলংকারের কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও প্রতিবছর যাকাত আদায় করতে হবে আয়-রোজগার না থাকলেও।

প্রশ্ন ঃ ২৩২) স্ত্রী কি স্বামীর থেকে যাকাত নিতে পারবে?

না। স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মা কেউ যাকাত নিতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৩৩) আমার বিশ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তার মধ্যে দশ ভরি আমি প্রায়ই ব্যবহার করি। এই ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত কি আদায় করতে হবে?

ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত সমস্ত স্বর্ণালংকারের যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। আমাদের সমাজে একটি মারাত্তক ভুল প্রচলিত আছে যে ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হয় না।

প্রশ্ন ঃ ২৩৪) স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রের খাদসহ হিসাব করতে হবে নাকি খাদ ছাড়া? এবং বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আমরা বিক্রি করতে গেলে যে মূল্য পাই (বর্তমান বাজার মূল্য) সেই মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৩৫) আমার স্ত্রীর ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। তার কি পুরো স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে? নাকি শুধু সাড়ে সাত ভরির যাকাত আদায় করলেই চলবে?

পুরো ১০ ভরি স্বর্ণের যাকাতই আদায় করতে হবে। এবং নিজের আরো কোন সম্পদ ও ক্যাশ টাকা থাকলে তাও তার সাথে যোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৩৬) মেয়েরা কি চুলে কলপ দিতে পারবে?

না। তবে কালো ব্যতীত অন্য যে কোন রং করতে পারবে। যেমন, লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ, ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ ২৩৭) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল নারীদের জন্য কি আছে?

জান্নাতীদের নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ "সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবী কর।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ ৩১-৩২)

"এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৭১)

প্রশ্ন ঃ ২৩৮) স্বামী মারা যাওয়ার কতদিন পর্যন্ত একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য শোক পালন করবে পরবর্তী বিয়ে করার জন্য কত দিন অপেক্ষা করবে?

চার মাস দশ দিন।

প্রশ্ন ঃ ২৩৯) স্বামী মারা যাওয়ার পর অর্থাৎ বিধবা হওয়ার পর কি স্ত্রীকে সাদা কাপড় পড়তে হবে?

না। ইসলামে এই ধরণের কোন নিয়ম নেই। এগুলো হয়তো হিন্দুদের থেকে এসেছে। তবে সে চার মাস দশ দিন সাজগোজ করবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৪০) কোন মহিলার যদি কোন আত্মীয় মারা যান তাহলে কতদিন দিন শোক পালন করবে?

তিন দিন। তবে স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয় মারা গেলে কাল কাপড়ও পড়তে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৪১) ওযূ করার পর কি মেয়েরা কসমেটিকস ব্যবহার করতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪২) মেয়েরা কি নেইল-পলিশ ব্যবহার করতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবে। তবে নেইল-পলিশ থাকলে ওযূ হবে না, আর ওযূ না হলে সলাত হবে না। তাই ওযূ করার আগে অবশ্যই নেইল-পলিশ তুলে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪৩) মেয়েরা কি লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবে তবে পরপুরুষকে দেখানোর জন্য নয়। লিপস্টিক ভারী হলে ওযূ করার আগে তুলে নিতে হবে না হলে ওযূ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৪৪) মুসলিম মেয়েরা কি সিঁদুর পড়তে পারবে?

না, পারবে না। যেহেতু এটি হিন্দুদের ধর্মীয়ও চিহ্ন।

প্রশ্ন ঃ ২৪৫) গর্ভপাত (abortion) করা কি জায়িয?

না, গর্ভপাত করা ইসলামে জায়িয নয়। যদি মায়ের জীবন হুমকির কারণ হয় এবং গর্ভ আড়াই মাসের কম হয় তাহলে গর্ভপাত করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪৬) মেয়েদের যদি ছেলেদের মতো কিছুটা দাড়ি, গোফ বা লোম হয় তাহলে কি তা কাটতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবে। তবে ভ্রুর লোম তুলতে অর্থাৎ প্লাক করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৪৭) মেয়েরা কি প্রয়োজনে তাদের হাতের ও পায়ের লোম তুলে ফেলতে পারে?

হ্যাঁ, পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪৮) মেয়েরা কি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নাকে ফুল, কানে দুল, পায়ে ব্রেসলেট পড়তে পারবে?

হ্যাঁ, পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪৯) স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। তবে এটা খুলা তালাক মাধ্যমে (সম্পদের বিনিময়ে) দিতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২৫০) স্বামী যদি রাগের মাথায় তালাক দেয় তাহলে কি তালাক হবে? অথবা সুস্থ মাথায় তালাক দেয়ার নিয়ম কি?

রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হবে না। তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে এক তালাক দেয়ার পর এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। এরপর আবার ২য় তালাক দেয়ার পর আরো এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে যদি দু'জনের মধ্যে মিলমিশ হয়ে যায় তাহলে তালাক বাদ হয়ে যাবে। আর যদি মিলমিশ না হয় তাহলে ৩য় তালাক এর মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। স্ত্রীর যদি গর্ভবতী থাকে তাহলে তালাক দেয়া যাবে না, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। স্ত্রীর পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে তালাক দেয়া উচিত নয় কারণ এই সময়ে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না।

পর্দার কিছু বাস্তব চিত্র

একজন নন-প্রাকটিসিং মুসলিম বোনের গল্প!

আজ আমি আমার জীবনে পর্দা করার আগের ও পরের জীবনের কথা শেয়ার করতে চাই। আমি ২০ বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে যার জন্ম আরব উপসাগরীয় এলাকায়-ইসলামের আদি জন্মভূমিতে। আমি বিশ্বাস করতাম পর্দা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদিও আমার মা পর্দা করতেন, তিনি আমাকে বা আমার বোনকে সে ব্যাপারে জোর করেন নি। তিনি মনে করতেন কাজটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা উচিত, নতুবা তার আওতার বাইরে চলে গেলেই আমরা পর্দা ছেড়ে দিব। আমি মনে করি ধারণাটা কিছু মাত্রায় সঠিক আবার সঠিকও না।

অথবা আমরা যখন বড় হব তখন পর্দা করাটাকে আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হবে। কারণ সারাজীবন ধরে একটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়া আর তারপর হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলা খুব কঠিন। মন পরিবর্তন করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যাই হোক, নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে আমি খুবই ভালবাসতাম যেহেতু আমি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিলাম। আর এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন অংশ। আমি দামী দামী জামা-কাপড় কিনতে, সেগুলো দিয়ে নিজেকে সাজাতে খুবই পছন্দ করতাম। সবাই যখন আমার দিকে তাকাত এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করত, ব্যাপারটা আমি চরমভাবে উপভোগ করতাম। আমি ভালবাসতাম প্রশংসা শুনতে- বাহ! মেয়েটাতো দারুণ সুন্দরী।

আমার মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা শেষ হবার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি আমেরিকাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে আমি একটি বিষয় লক্ষ করলাম যা আগে কখনও দেখিনি। তা হল মুসলিম সমাজ এবং সম্প্রদায়। এ এক অসাধারণ সমাজ আদর্শ মুসলিমদের নিয়ে যারা ইসলাম পালন করছে আমি যেভাবে অভ্যস্ত তার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায়। আরব উপসাগরীয় এলাকার মুসলিমরা জন্মগতভাবে মুসলিম। তাদের কোন প্রশ্ন করতে হয় না কারণ সব কিছুই খুব সুস্পষ্ট। আমাদের নিজেদের ঈমান নিয়ে এবং কিভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস করতে হবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি কারণ আমরা বেড়েই উঠেছি মুসলিম হিসেবে এবং আমাদের চারপাশের সবাই ছিল মুসলিম। প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ কেমন এটা এবং সব ধরণের ধর্মাবলম্বী সম্মলিত একটি মিশ্র সমাজে বাস করার অনুভূতি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। আমি উপলব্ধি করলাম উপসাগরীয় লোকজন বিশুদ্ধ ধর্ম পালন করত না, যা করত তা হল ধর্ম এবং সংস্কৃতির এক ধরণের মিশ্রণ। আমি আবিষ্কার করলাম-অনেক কিছু, যাকে আমি ইসলামী বলে মনে করতাম, আসলে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম ভুল! আমি জানলাম যে বিশুদ্ধ ইসলাম সেটা না যার মাঝে আমরা বেড়ে উঠেছি বরং তা ছিল অর্থহীণ বিষয়ে পূর্ণ যা বহুদিন ধরে আমাদের সংস্কৃতির অংশ। বিশুদ্ধ ইসলামের শিক্ষার উৎস শুধুই কুরআন ও সুন্নাহ।

যখন আমেরিকার লোকজন জানতে পারল যে আমি মুসলিম, তখন তারা সবসময় ইসলামের ব্যাপারে আমাকে নানা ধরণের প্রশ্ন করত। অধিকাংশ সময়েই আমি তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না। ফলে আমি বিভিন্ন ইসলামী বই এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করা শুরু করলাম- বিশুদ্ধ ইসলাম জানার আশায়। আমার অবস্থা ছিল এমন ব্যক্তির মত যে কখনও ইসলামের কথা আগে শোনেনি। আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমি আগে জানতাম না। আমি মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম এবং প্রচুর ভাই-বোনদের সাথে ইসলামী বিষয়ে কথা বলা ও আলোচনায় অংশ নিতে লাগলাম। আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমার নিজের দেশে আমি কখনও কোন মসজিদে যাইনি এবং সেটার কথা চিন্তাও করিনি। যদিও আমার দেশে হাজার হাজার মসজিদ ছিল। আমি ছাড়া মসজিদের সমস্ত বোনরা পর্দা করত। আমি ছাড়া আর সবাই ছিল আমেরিকান। তারা আমার ব্যাপারে খুবই উদার ছিল আর সেজন্য আমি তাদের খুবই সম্মান করি। আমি এটা নিয়ে সবসময়ের জন্য ভাবা শুরু করলাম এবং

আমার পর্দা করা নিয়ে প্রচুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমি হঠাৎ এক অচেনা অনুভূতির সম্মুখীন হতে লাগলাম- আর তা হল কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তা উপভোগ করার বদলে আমার বিতৃষ্ণা বোধ হতে থাকল। আমার নিজেকে একটা ছবির মত মনে হত যার কোন ব্রেন বা হৃদয় বলতে কিছু নেই। পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এবং পর্দা করা শুরু করলাম। এটা আমার জীবনের নেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। জীবনে প্রথমবারের মত আমি অনুভব করলাম যে আমি একজন দৃঢ় চিত্তের মানুষ। আমি যা বিশ্বাস করি সে অনুযায়ী কাজ করি। চারপাশের মানুষ আমার ব্যাপারে কি বলল বা আমার দিকে কিভাবে তাকাল, আমি তা গ্রাহ্য করি না।

পর্দা করার পর প্রথম দিনটি ছিল সবচেয়ে সুন্দর। আমি এত সুখী আর উদার জীবনে আর কখনও বোধ করি নি যেমনটি করেছিলাম সেদিন। আর বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য অবিশ্বাস্য ছিল যে আমি আসলেও এটা করতে পারব এবং প্রত্যেকে বলেছিল যে আমার এটা বেশী দিন স্থায়ী হবে না। সম্ভবত তাদের এই অনুমান অনেকগুলো কারণের মাঝে একটি যা আজও আমাকে পর্দা করা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আমার নিজের সাথে এজন্য যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। আমার আমি সবসময়ই দুনিয়ার এই জীবনটাকে খুব ভালবাসে এবং তাকে সর্বোত্তমরূপে ভোগ করতে চায়। কিন্তু তখন সময় এসেছিল তাকে থামানোর এবং আমি তা করেছিলাম। কিছুদিন পর থেকে সবাই আমাকে সম্মানের চোখে দেখা শুরু করল যেভাবে তারা আগে কখনও দেখেনি। সবাই আমাকে ভালভাবে বিশ্বাস করা শুরু করল এই কারণে যে তারা জানত আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কি তাদের মাঝে এই ধারণার জন্ম দিল? - নারীর পর্দা।

আমি এখন যে কোন জায়গায় যেতে পারি এবং কেউ আমার দিকে এমনভাবে তাকায় না যে আমি একটা ছবি বা প্রাণহীণ পুতুল। তবে আমি এখনও সুন্দর করে পোশাক পড়ি এবং সাজগোজ করি, যখন আমি শুধু আমার বোনদের মাঝে থাকি আর দেখা গেল সেটা আরও বেশি মজা- নির্মল বিনোদন।

আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ পর্দা বাধ্যতামূলক করেছেন আমাদের সাহায্য করার জন্য, আমাদের জীবনকে সহজতর করার জন্য। এটা নারী ও পুরুষের মাঝে সম্মানজনক সেতুবন্ধনের সাহায্য করে। তাছাড়াও এটা হল নিজের সৌন্দর্য শুধু নিজের কাছে এবং যাদের কাছে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন শুধু তাদের কাছেই তুলে ধরার ব্যাপার। এটা অন্য সকল ধর্মের মত একটি চিহ্ন বা স্মারক যে আমি

একজন মুসলিম। যেমন ইহুদীরা তাদের মাথার উপর একটা ছোট কাপ পড়ে আর খ্রিস্টানরা পরে ক্রস। তাদের কেউই জনসম্মুখে এটা পড়তে লজ্জিত বোধ করে না। কোন মানুষ এব্যাপারে খারাপ ধারণাও পোষণ করে না।

একটা মেয়ের পর্দা করে যেন এটা তাকে ভুল বা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া থেকে বাঁচায়। যে মেয়েটা পর্দা করে সে এমন দৃঢ়চিত্ত হয় যে, যে কোন কিছু করতে পারে এবং জীবনের পথে যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে। তোমার চারপাশের সবাই তোমাকে বিশ্বাস করবে কারণ তুমি নিজেকে বিশ্বাস কর। তুমি কি জান না যে তোমার বাহ্যিক দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ? তুমি কি জান না তা খুব মূল্যবান? তুমি যে সুন্দর এটা বলার জন্য তোমার কাউকে প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি তা জান। আর তোমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার জন্যও তোমার কাউকে দরকার নেই যেন তুমি একটা সুন্দর ছবি না চিত্রকর্ম, কারণ তুমি একজন মানুষ।

একজন অমুসলিম ব্রিটিশ নারী সাংবাদিকের মুসলিম হওয়ার ঘটনা

এটি আফগানিস্তানের একটি ঘটনা। আমেরিকা-ব্রিটিশ সেনারা যখন আফ-গানিস্তান দখল করে আছে সেই সময়ের একটি সত্য ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। আফগানিস্তানের মুজাহিদ বাহিনী Yvonne Ridley নামে এক ব্রিটিশ নারী সাংবাদিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং বেশ কিছুদিন তাকে তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় একটি বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখে।

ঐ ব্রিটিশ নারী সাংবাদিক যখন মুক্তি পান তখন তিনি ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং অপহরণ অবস্থায় যে দিনগুলি তিনি মুজাহিদদের সাথে সম্মানের সাথে অতিবাহিত করেছিলেন তার উপর তিনি একটি বই লিখেছেন যা প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের উপর সেমিনার করে বেড়াচ্ছেন। মুজাহিদরা যখন Yvonne Ridley-কে মুক্ত করে দেন তখন তাকে একটি ছোট্ট শর্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে যেন ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে আল কুরআনুল কারীমকে একবার পড়েন। তিনি ফিরে এসে শর্তানুযায়ী গোটা কুরআনের ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়েছিলেন। সেই Yvonne Ridley-র একটি ঘটনা এখানে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা হলো।

তিনি তার বইয়ে বর্ণনা করেছেন তার নিজ চোখে দেখা Beauty of Islam। তিনি দেখেছেন মুসলিম নারীদের পর্দার বাস্তব রূপ। তিনি দেখেছেন নারীদের সম্মান। তিনি দেখেছেন মুসলিমদের পবিত্র চরিত্র, প্রকৃত সৎব্যবহার ইত্যাদি।

পুরুষরা যখন তাকে তিন বেলা খাবার দিতে আসতো তখন কোন পুরুষই তার দিকে তাকাতো না, মাথা নিচু করে তাকে খাবার দিয়ে চলে যেতো। তিনি যে কদিন বন্দি ছিলেন কোন পুরুষ তার দিকে কোনদিন তাকিয়ে কথা বলেন নি, তাকে নির্যাতন করেন নি, একটি খারাপ বাক্যও উচ্চারণ করেন নি।

একদিন ঐ ব্রিটিশ নারী গোসলের পর তার ব্রা বাড়ির উঠানে একটি দড়ির উপর রোদে শুকাতে দিয়েছেন। এক সময় মুজাহিদ বাহিনীর লীডার এসে তাকে পরামর্শ দিলেন যে এভাবে খোলা জায়গায় পরপুরুষের সামনে তার ব্রা রোদে না দেয়াই উচিত। কারণ পুরুষরাতো মানুষ, আর শয়তানের প্ররোচণায় মানুষ ভুল করতে পারে। তাই তার এই undergarment দেখে কারো মনে খারাপ চিন্তা আসতে পারে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। এখানে শিক্ষণীয় যে, নারীদের পর্দার বিষয়টা কত সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারীর অনেক দিক চিন্তা করতে হয়, আল্লাহ তাকে এতো দিক দিয়ে গুণ দিয়েছেন যে, যে কোন একটি দিক দেখেই পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করতে পারে। আর একজন নারীর কোন কিছু দেখে যদি কোন পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করে বা মনে মনে খারাপ চিন্তা করার প্রয়াস পায় তাহলে তার জন্য আখিরাতের ময়দানে ঐ নারীকেই সর্ব প্রথমে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। Yvonnne Ridley সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তার ওয়েবসাইট দেখুন ঃ

http://yvonneridley.org/
(British-born, award-winning Journalist, Broadcaster, Human Rights Activist)

একটি সত্য ঘটনা

বাংলাদেশে আমাদের পরিচিত এক দ্বীনি ভাই তার স্ত্রীকে প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, সে (স্ত্রী) বাসায় সবসময় কাজের বুয়ার মতো কাপড়-চোপড় পরিধান করে থাকে আর বাইরে কোথাও বের হওয়ার সময় ভাল ভাল ড্রেস পরিধান করে বের হয়। আসলে এটা একটা কমন দৃশ্য, অনেক নারীরাই বাসায় স্বামীর

সামনে সাজগোজ করেন না কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় সেজেগুজে বের হন! বিষয়টা অপ্রিয় সত্য হলেও গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়।

আবার বাংলাদেশে আমাদের পরিচিত একজন ধার্মিক ভাবীর অভিযোগ যে, "আপনারা তো শীতের দেশে থাকেন তাই পর্দা করা সহজ, ঐখানে আমি থাকলেও পুরোপুরি পর্দা করতাম, বাংলাদেশে খুব গরমতো তাই কুরআনের নির্দেশ মতো পুরোপুরি পর্দা করে চলা যায় না"।

এটা সত্য কথা যে শীতের মধ্যে পর্দা করা সহজ এবং গরমের মধ্যে পর্দা করা খুবই কঠিন এবং অনেক বড় ত্যাগ। আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য যারা প্রচন্ড গরমের মধ্যে পর্দা করেন আর যারা প্রচন্ড শীতের মধ্যে পর্দা করেন তাদের দুই গ্রুপের মধ্যে ত্যাগের যেমন কোয়ালিটি আছে তেমনি আখিরাতে রিওয়ার্ডেরও কোয়ালিটি হয়তো আছে। তাই যারা প্রচন্ড গরমের মধ্যে কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর ভয়ে পর্দা করছেন তারা অবশ্যই রিওয়ার্ড বেশী পাবেন।

কোন্ দেশে গরম কত ডিগ্রি হবে তা মহান আল্লাহ অবশ্যই জানেন এবং জেনেই তিনি সকলের জন্য পর্দা ফরয করেছেন। যেমন সবচেয়ে গরম বেশী মধ্যপ্রাচ্যে আর পর্দা সকলের আগে ফরয হয়েছে ঐ জায়গায়। আবার সিংগাপুরে তো সারা বছরই গরম এবং সেখানে মালে নারীরা রীতি মতো পর্দা করে চলাফেরা করেন। এছাড়া ইউরোপ, নর্থ-আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে গ্রীষ্মকালে খুবই গরম। এবং যারা পর্দা করার তারা এর মধ্যেই আল্লাহর ভয়েই পর্দা করে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে সাহায্য করুন।

প্রবাসে এসে উন্নতি না অবনতি

যেসব নারীরা দেশে মোটামুটি পর্দা করে চলতেন তাদের অনেকেই আজ এই উন্নত দেশে এসে শয়তানের প্ররোচনায় পরে পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন। মাশা-আল্লাহ অনেকেই আবার আরো বেশী পর্দানশীন হয়েছেন। তবে যারা পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের অবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই করুণ। অনেকেই মেয়েদের পোশাক ছেড়ে দিয়ে রীতিমতো ছেলেদের পোশাক পড়ে ওয়েস্টার্ন কালচার ফলো করে থাকেন, তারা হয়তো মনে করেন উন্নত দেশে এসেছি উন্নত জীবনযাপনের জন্য, এখানে এমন পোশাকই পড়তে হয় এবং এটা উন্নত

জীবনযাপনের একটা অংশ। তাদের জন্য দু'আ করি, তারা যেন তাদের পূর্বের জীবনের কথা স্মরণ করে পূর্বের জীবনে ফিরে যান।

একটি মজার ঘটনা কিন্তু বাস্তব সত্য

নানী গেছেন পুকুরে গোসল করতে এবং নাতিকে পুকুরের পাড়ে বসিয়ে রেখেছেন পাহারাদার হিসেবে যদি কোন লোক আসে তাহলে যেন নানীকে জানানো হয় এবং ইতিমধ্যে নানী পর্দা করে নিবেন। একসময় একটি যুবক ছেলে এদিকে আসছে দেখে নাতি নানীকে জানিয়েছে। যুবক ছেলেটি কাছে আসলে নানী নাতিকে বকা দিয়ে বলছে "দূর বোকা এতো আমাদের পাড়ার রফিক"। আবার কিছুক্ষণ পরে আর একটি লোক আসছে দেখে নাতি নানীকে জানিয়েছে। লোকটি কাছে আসলে নানী নাতিকে বকা দিয়ে এবার বলছে "দূর বোকা এতো ঐ পাড়ার মন্ডলের বাপ"। আবার কিছুক্ষণ পরে আর একটি লোক আসছে দেখে নাতি নানীকে জানিয়েছে। লোকটি কাছে আসলে নানী নাতিকে বকা দিয়ে এবার বলছে "দূর বোকা এতো আমাদের গ্রামের দুধওয়ালা" আবার কিছুক্ষণ পরে মসজিদের ইমাম সাহেব এদিকে আসছে, কিন্তু নাতি এবার আর নানীকে কিছু জানায়নি কারণ সে জানাতে গিয়ে প্রতিবারই বকা খেয়েছে। ইমাম সাহেব কাছে আসলে নানী নাতিকে এবার এক চড় মেরেছে, যে ইমাম সাহেব আসছে আগে বলিসনি কেন? তখন নাতি বলছে "এ তো লোক না আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব..."।

যাহোক, ঘটনা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব। বাংলাদেশে আজকাল ঘরে বসেই শাক-সব্জি-মাছ ইত্যাদি কেনা যায়। ফেরীওয়ালারা নিত্যপ্রয়োজনীয় সবই বাসার দরজার কাছে নিয়ে আসে। বাস্তবে দেখা যায় পর্দার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সত্যিকার অর্থে না বুঝার কারণে আমরা অনেক নারীরাই যখন বাড়ির বাইরে যাই তখন পর্দা করেই যাই কিন্তু যখন বাসার দরজার সামনে সব্জীওয়ালার কাছ থেকে সব্জী কিনি তখন আর পর্দা করি না।

একইভাবে আমরা অনেক নারীরাই সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা লোকের সামনে পর্দা করি না কিন্তু কোন দাড়ি-টুপি-পাগড়ী এবং লম্বা জুব্বা পড়া হুজুরের সামনে পর্দা না করলে লজ্জা পাই। কোন হুজুর দেখলে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দেই। আরো বাস্তবে দেখা যায় অনেকে আমরা বাইরে যাই সাধারণ ড্রেসেই কিন্তু যখন কোন মৃতের বাড়িতে যাই বা মিলাদ-মাহফিলে যাই তখন মাথায় কাপড় দেই বা

হিজাব পড়ি। আবার দেখা যায় আমরা অনেকেই এমনি মাথায় কাপড় দেই না কিন্তু আজান দিলে তখন মাথায় কাপড় বা ওড়না দেই। এর কারণ অজানা। কোথা থেকে যে এর উৎপত্তি হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, কারণ এর দলিল কোন সহীহ হাদীসে বা কুরআনে নেই।

একটা বাস্তব পরীক্ষা

এবার পরীক্ষা করে দেখবো যে মানুষের সাধারণ বিবেকবুদ্ধি পর্দার স্বপক্ষে রায় দেয়, নাকি বিপক্ষে রায় দেয়। আসুন একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে বুঝে দেখি যে সুস্থ বিবেক এ ব্যাপারে কী রায় দেয়।

ধরা যাক, আমি (স্ত্রী) খাবার পরিবেশন করছি আর আমার পরিবারের কয়েকজন ডিনার করছেন। এখানে রয়েছেন আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার পিতা, আমার শ্বশুর, আমার ভাই এবং আমার স্বামীর বন্ধু। এরা সকলেই আমাকে দেখছেন, কারণ আমিই তো খাবার পরিবেশন করছি। এবার, এই ছয়জন লোক আমাকে কে কোন হিসেবে দেখছেন? অর্থাৎ ঃ

১) আমার স্বামী দেখছেন 'স্ত্রী' হিসেবে
২) আমার ছেলে দেখছে 'মা' হিসেবে
৩) আমার পিতা দেখছেন 'মেয়ে' হিসেবে
৪) আমার শ্বশুর দেখছেন 'পুত্রবধূ' হিসেবে
৫) আমার ভাই দেখছেন 'বোন' হিসেবে
৬) এবার, আমার স্বামীর বন্ধু দেখছেন কোন হিসেবে?

হয়তো কেউ বলবে যে, স্বামীর বন্ধু দেখছেন 'বন্ধুর স্ত্রী' হিসেবে। কিন্তু আমি কী কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক্সরে বা আল্ট্রাসাউন্ড এর মতো কোনো কিছু দিয়ে ধরতে পারবো যে, আমার স্বামীর বন্ধু আমাকে প্রকৃতই কী হিসেবে দেখছেন?

তিনি বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে মনে মনে নেগেটিভ চিন্তাও করতে পারেন। এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, মানুষ এ ধরনের চিন্তা থেকে মুক্ত নয়। এবার বলি! এতে কী কেউ রাজি হবে যে, তার স্ত্রীকে বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো একজন মেয়েলোককে দেখে অন্য পুরুষেরা বাজে চিন্তা করার সুযোগ পাক।

খৃষ্টান এবং মুসলিম নারীদের মধ্যে হিজাবের প্রচলন

Christian women who chose to follow their religion

Muslim women who chose to follow their religion

নিকাব ও বিশ্লেষণ

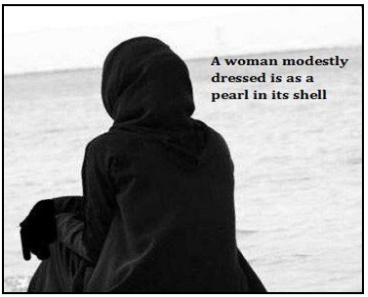

নিকাব এবং আমার বিবেক

সম্মানিত মা ও বোনেরা, এই বিষয়ে মুফাস্‌সির ও মুজতাহিদগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির ও মুজতাহিদের মতে মুখমণ্ডল ঢাকা জরুরী নয় আবার কারো কারো মতে জরুরী। যা হোক, এই অধ্যায়ে আমরা দুই পক্ষের আলোচনাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবার সিদ্ধান্ত যার যার, এই বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। তবে যারা একেবারেই পর্দা করেন না বা নতুন পর্দা করা শুরু করেছেন তাদের উচিত হবে পর্দার উত্তম পন্থার দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া এবং কোন প্রকার তর্কে জড়িয়ে না পড়া।

এছাড়া নিকাবের উপর যদি আমরা আরো বিস্তারিত জানতে চাই তাহলে এই বইয়ের শেষে রেফারেন্সের বইগুলো পড়তে পারি যথা ঃ ১) মুসলিম নারীর পর্দা ২) পরিবার ও পারিবারিক জীবন ৩) ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব ৪) www.islamhouse.net ইত্যাদি।

বিশেষ অনুরোধ ঃ

যারা নিকাব করি আর যারা নিকাব করি না তারা যেন নিকাব নিয়ে অবশ্যই কোন প্রকার তর্কে জড়িয়ে না যাই এবং একে অপরে তর্ক করে সম্পর্ক নষ্ট না করি, ভ্রাত্বিতবোধ নষ্ট না করি। কারণ ইসলামে ভ্রাত্বিতবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিকাব কী?

নিকাব আরবী শব্দ, এই আলোচনায় "নিকাব" মুখ ঢেকে রাখার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ পর্দার অংশ হিসেবে নিকাবকে বুঝানো হয়েছে।

মুখমন্ডল খোলা রাখার দলীল

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নারী সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। নারীর মুখমন্ডল নারী সৌন্দর্যের মূল উৎস। কাজেই মুখমন্ডল ঢেকে রাখার ব্যাপারে সবার ঐক্যমত হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কুরআনে কারীমের একটি আয়াতাংশের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে মুফাস্সির ও মুজতাহিদগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদের সূত্রপাত হয়। ফলে কিছু সংখ্যক মুফাস্সির ও মুজতাহিদের মতে মুখমন্ডল ঢাকা জরুরী নয়, খোলা রাখা বৈধ। আয়াতাংশটি হল ঃ

"আর তারা (নারীরা) যেনো নিজেদের 'সৌন্দর্য' প্রকাশ না করে। তবে স্বতঃই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

নারী সৌন্দর্যের যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ব্যতীত তাদের যাবতীয় সৌন্দর্য আবৃত রাখা ফরয। স্বতঃই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ঢাকা ফরয নয় বরং তা প্রকাশ করা বৈধ। "স্বতঃই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে" তা কী? তার নির্দিষ্টকরণ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। আর এ মতপার্থক্য নিকাব সমস্যার মূল কারণ। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এ সমস্যাটিকে আরো প্রবল করে তুলেছে। হাদীসটি হল, রসূলুল্লাহ রসূল ﷺ বলেন ঃ

"হে আসমা, মেয়েরা যখন বালেগা হয়, তখন তাদের শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া বৈধ নয়। তবে এইসব অঙ্গ ছাড়া।" একথা বলে তিনি স্বীয় মুখমন্ডল ও তালুদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।" (আবু দাউদ)

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। একজন বর্ণনাকারী খালিদ বিন দুরায়ব আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়নি এবং তিনি আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে হাদীস শোনেননি।

মুখমণ্ডল আবৃত রাখা জরুরী কিনা

পর্দা বিধানে নারীর মুখমণ্ডলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নারীর মুখমণ্ডল তার সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই কেউ কোন নারীকে দেখতে চাইলে প্রধানতঃ তার মুখমণ্ডলই দেখে থাকে। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করেই কোন নারীকে সুন্দর বা অসুন্দর বলা হয়। নারীর মুখমণ্ডল নারীদেহের সর্বাধিক সুন্দর অঙ্গ। এর সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও লাবণ্যময়তা পুরুষের মনকে আকৃষ্ট ও আলোড়িত করে। এতে পুরুষের মনে যৌন বাসনার সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মে যখন কোন পুরুষ কোন মেয়ের দিকে দেখার উদ্দেশ্যে তাকায় সর্বপ্রথম সে মুখমণ্ডল দেখার চেষ্টা করে এবং তারপর তার ফিগার দেখে। যদি মুখমণ্ডল দেখতে সুন্দর না হয় এবং ফিগার যতই সুন্দর হোক না কেন সেই পুরুষ তখন তার প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে ঃ

১) ধরি, যখন এয়ারলাইন্স-এ এয়ারহোস্টেস হায়ার করা হয় তখন সর্বপ্রথম প্রাইমারি সিলেক্সনে মুখের সৌন্দর্য দেখা হয় যা কাস্টমার সার্ভিসের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট।

২) আবার যখন কোন পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য মডেল সিলেক্ট করা হয় তখনও সর্বপ্রথম প্রাইমারি সিলেক্সনে মুখের সৌন্দর্য দেখা হয় যা দর্শকদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট।

সাধারণত কেউ যখন বিয়ের জন্য পাত্রী দেখে তখনও মুখের সৌন্দর্যকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় তারপর অন্যান্য দিক দেখে।

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার দলীল

"হে নাবী, আপন বিবি, কন্যা ও মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।" (সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৯)

"তারা যেন নিজেদের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে সেইসব জিনিষ ছাড়া যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

"তোমরা যখন তাদের নিকট কিছু চাইবে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩)

"নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহিলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেড়িওনা।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

বিশেষ করে মুখমণ্ডল আবৃত করার জন্য সূরা আহ্যাবের ৫৯ নং আয়াত নাযিল হয়েছে। জিলবাব শব্দের বহুবচন جَلَابِيبِ এর অর্থ চাদর। أَدْنَى শব্দের অর্থ লটকান। يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ এর শাব্দিক অর্থ নিজের উপরে চাদরের খানিক অংশ যেন লটকিয়ে দেয়। ঘোমটা দেয়ার অর্থও এটাই। কিন্তু এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণভাবে পরিচিত 'ঘোমটা' নহে, বরং এর উদ্দেশ্য মুখমণ্ডলকে আবৃতকরণ। তা ঘোমটার দ্বারা হোক, পর্দা অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। এর উপকারিতা এই বর্ণনাতে করা হয়েছে যে, যখন মুসলিম নারী এভাবে আবৃত অবস্থায় বাড়ী থেকে বের হবে, তখন লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তারা সম্ভ্রান্ত নারী, নির্লজ্জ ও শ্লীলতাবর্জিত নহে। এই কারণে কেউ তার শ্লীলতার প্রতিবন্ধক হবে না।

✍ ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এ আয়াত সর্ম্পকে বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাবে, তখন যেন তারা মাথার উপর হতে চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে দেয় এবং একটি মাত্র চোখ খোলা রাখে - এ অত্যন্ত জরুরী।

✍ অপর এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ স্বাধীনা - ক্রীতদাসী নয় - এমন মেয়েলোক যখন ঘর থেকে বাইরে যাবে, তখন তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা আবৃত করে নেবে।

✍ আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্সাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ এ আয়াত বলে দিচ্ছে যে, যুবতী মেয়েদেরকে পরপুরুষ থেকে নিজেদের মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

✍ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ উবায়দা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বলেছেন ঃ মু'মিন মেয়েদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তাদের মুখমন্ডল ও মাথা

পূর্ণ মাত্রায় ঢেকে রাখে, তবে একটি মাত্র চোখ খোলা রাখতে পারে। এ থেকে জানা যাবে যে, তারা স্বাধীন নারী - ক্রীতদাসী নয়।

✍ ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ মেয়েরা তাদের মুখমণ্ডলকে এমনভাবে ঢাকবে যে, বাম চক্ষু ছাড়া তাদের শরীরের অপর কোনো অংশ দেখা যাবে না।

✍ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, "যানবাহন আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা নাবী ﷺ -এর সংগে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। যখন লোক আমাদের সামনে আসত, তখন আমাদের চাদর মাথার উপর হতে মুখের উপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে দিতাম।" (আবু দাউদ)

✍ ফাতিমা বিনতে মানযার বলেন, "আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতাম। আমাদের সংগে আবু বকরের কন্যা আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) ছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই।" (ইমাম মালিক ঃ মুয়াত্তা)

✍ মুখমণ্ডল ঢাকা ওয়াজিব, খোলা রাখা নাজায়িয ও হারাম। এ মতের পক্ষে রয়েছেন বিশিষ্ট সাহাবী ও ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসসহ বহু সাহাবী, তাবেয়ী এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণ। এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেকও এ মতের পক্ষে রয়েছেন।

✍ প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণের মতে পরপুরুষের সামনে নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা নাজায়িয ও হারাম। কোন কোন বর্ণনামতে মালেকী মাযহাবের ইমামগণের ফাতওয়াও তাই। কেবল হানাফী মাযহাবের প্রাচীন ইমামগণের মতে নারীদের মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তাদের মতেও সুরমা, অলংকার ও প্রসাধনী দ্বারা সুসজ্জিত মুখমণ্ডল পরপুরুষের সামনে খোলা রাখা নাজায়িয।

✍ এছাড়া বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরকারকগণ যেমন ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইবনে জারীর, তাফসীরে গারায়েবুল কুরআন, তাফসীরে

কবীর, তাফসীরে বায়যাবী, আহকামুল কুরআন ইত্যাদিতে মুখমণ্ডল আবৃত করার পক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন।

✍ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তা (নিকাব) আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করবে তা তারই জন্য নিয়ামত হবে। আর যে ব্যক্তি ভালোভাবে গ্রহণ করবে সেটা তার জন্য অতি উত্তম হবে। আর তাই এটা আমার স্ত্রীসহ আমলে আঁকড়িয়ে ধরেছি। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা করছি, তিনি যেন আমাকে অনুরূপভাবে অথবা যারা এটা গ্রহণ করবে তাদেরসহ তাওফীক দান করেন।

✍ এ যুগের প্রথম সারির ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে ডা. জাকির নায়েক বলেন - নিকাব তাকওয়ার ব্যাপার। যারা করতে পারেন অতি উত্তম আলহামদুলিল্লাহ।

✍ ড. মানজুরে ইলাহী, তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে 'ইসলামিক ল' এর উপর পি.এইচ.ডি করেছেন। তার অভিমত হচ্ছে যারা নিকাব করেন আর যারা নিকাব করেন না এই দুই গ্রুপের মধ্যে যারা নিকাব করেন তাদেরকে অবশ্যই এক ডিগ্রি মর্যাদা বেশী দিতে হবে।

নিকাব নিয়ে
কুরআন-হাদীস এর উপর বিশ্লেষণ

হে নাবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে। (সূরা আন্ নূর ঃ ৩০)

"দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।" কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গন্ডীর মধ্যে দৃষ্টির

উপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের উপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়িয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নাবী ﷺ এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

- মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদ)

- বুরাইদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে বলেন ঃ "হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

- জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কী করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

- ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ বিদায় হাজ্জের সময় নাবী ﷺ -এর চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশআরে হারাম থেকে ফেরার পথে নাবী কারীম ﷺ -এর সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নাবী ﷺ তার মুখের উপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ)

✍ এই বিদায় হাজ্জেরই আর একটা ঘটনা। খাস্‌আম গোত্রের একজন নারী পথে রসূলুল্লাহ ﷺ -কে থামিয়ে দিয়ে হাজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নাবী ﷺ তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পর্দা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পর্দানশীন নারীরও কখনো মুখ খোলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

অন্যদিকে মুসলিম নারীরা পর্দা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পর্দার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি নারীদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পর্দার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পর্দা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাবী ﷺ -এর মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দুচোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন। "তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের

চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্মী এক নারীর ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নাবী ﷺ -এর কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নিকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নিকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি একদম নিশ্চিন্তে নিজেকে পর্দাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো! জবাবে তিনি বলতে লাগলেন ঃ "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"।

আর হাজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহরামের পোশাকে নিকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা পরপুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বর্ণনা ঃ "বিদায় হাজ্জের সফরে আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম।" (আবু দাউদ)

হে নাবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের উপর টেনে নেয়। এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। আর ইদন শব্দের আসল মানে হচ্ছে নিকটবর্তী করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে 'আলা' অব্যয় বসে তখন তার মধ্যে ইরখা অর্থাৎ উপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের কোন কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ করেন শুধু "জড়িয়ে নেয়া" যাতে চেহারা কোনভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু যা বর্ণনা করছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে তিনি ইউদনীনা ইলাইহিন্না বলতেন। যে ব্যক্তিই আরবী

ভাষা জানেন তিনি কখনো একথা মেনে নিতে পারেন না যে, ইউদনীনা ইলাইহিন্না মানে কেবলমাত্র জড়িয়ে নেয়া হতে পারে। তাছাড়া মিন জালাবীবিহিন্না শব্দ দু'টি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন শব্দটি "কিছু" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীরা যেন নিজেদের চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের উপর লটকিয়ে দেয়, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ঘোমটা।

নবুওয়াত যুগের নিকটবর্তী কালের প্রধান মুফাসসিরগণ এর এ অর্থই বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.) উবাইতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করেন। (এই উবাইদাহ নাবী ﷺ -এর যুগে মুসলিম হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি। উমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাঁকে ফিকহ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ এর সমকক্ষ মনে করা হতো।) তিনি জবাবে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের চাদর তুলে নেন এবং তা দিয়ে এমনভাবে মাথা ও শরীর ঢেকে নেন যে তার ফলে পুরো মাথা ও কপাল এবং পুরো চেহারা ঢাকা পড়ে যায়, কেবলমাত্র একটি চোখ খোলা থাকে। ইবনে আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ নারীদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা উপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধু চোখ খোলা রাখে।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের উপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না। (জামেউল বায়ান, ২২ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আবু বকর জাসসাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'সতর' ও পবিত্রতা সম্পন্ন হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।" (আহকামুল কুরআন, ৩য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা যামাখশারী বলেন, ইউদনীনা ইলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।" (আল কাশশাফ, ২য় খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, ইউদনীনা ইলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না অর্থাৎ নিজেদের উপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। (গারায়েবুল কুরআন, ২২ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

ইমাম রাযী বলেনঃ "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তরভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।" (তাফসীরে কবীর, ২য় খন্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা)

"হে নাবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

এ আয়াতে নাবী ﷺ এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন করা। নাবীর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন নাবী ﷺ -এর গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের

নারীরা আপনা আপনিই এর অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল।

এ আয়াতগুলোতে নাবী ﷺ -এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এর-ই ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখি। এর মধ্যে কোনটি এমন যা শুধু নাবী ﷺ -এর স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি মুসলিম নারীদের জন্য কাংখিত নয়? কেবলমাত্র নাবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ জীবনযাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবেন, সলাত তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো?

যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং পরপুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি আছে কি?

প্রয়োজন হলে কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরণ এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনো এ ধরণের কোন চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভংগীতে কোন নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোন মনমাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোন নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে।

"তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" (সূরা নূর ঃ ৩১)

এ থেকে মনে হয় বিশ্ব-জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পুর্ণ সতর্কতা সহকারে বলতে হবে। জামায়াতের সলাতে যদি কোন নারী হাজির থাকে এবং ইমাম কোন ভুল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার সুবহানাল্লাহ বলার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের উপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

"আর হে নাবী! মু'মিন নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হিফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

"প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর নারীরা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নিকাবকে নারীদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত নারীদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়িয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

জাহিলী যুগে নারীরা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের উপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলিম নারীদের মধ্যে

ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মাফলার বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য।

মু'মিন নারীরা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) তার প্রশংসা করে বলেন ঃ সূরা নূর নাযিল হলে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে "ওয়ালইয়াদরিবনা বিখুমরি হিন্না য়ালা জুইয়ুবিহিন্না" বাক্যাংশ শোনার পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফযরের সলাতের সময় যতগুলো নারী মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, নারীরা পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। (আবু দাউদ)

পরামর্শ

আমরা যারা এখনো পর্দা করি না, আশা করি তারা এই বই পড়ে কিছুতেই মন খারাপ করবো না এবং বিরক্তও হবো না। এই বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ চাহেতো তা পালন করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে যদি আমি আমার তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) লেভেল বাড়াতে পারি। কারণ ঈমানের গভীরতা নির্ভর করে তাকওয়ার উপর আর ঈমানের উঠানামা নির্ভর করে তাওয়ার গভীরতার উপর। তাই যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার ঈমান তত মজবুত। এই বইয়ের পাশাপশি আমাদের গবেষণার ফল আরেকটি বই "তাকওয়া" অবশ্যই যোগাড় করে যেন পড়ে নেই। তখন দেখা যাবে লাইফ কতো সহজ হয়ে গেছে। কারণ সবকিছুর মূলে হলো এই তাকওয়া। এছাড়া আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলোও যেন জোগাড় করে পড়ার চেষ্টা করি, ইন্‌শাআল্লাহ।

নারীর অধিকার

ডিকশনারী অনুযায়ী নারীর অধিকার

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী– নারীর অধিকার হলো ঐ সকল অধিকার, যা একজন নারীকে সামাজিক এবং আইনগত সমতার দিক দিয়ে পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করে ।

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী– সেগুলো হলো ঐ সকল অধিকার, যা নারীদের জন্য দাবি করা হয়েছে– যা পুরুষের সমান– ভোট প্রয়োগ এবং সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি ।

'আধুনিকায়ন' অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী- এর অর্থ আধুনিক করা, আধুনিক প্রয়োজন বা অভ্যাসের সাথে খাপ খাওয়ানো ।

ওয়েবস্টার শব্দকোষ অনুযায়ী- এর অর্থ আধুনিক করা, নতুন বৈশিষ্ট্য (চরিত্র) বা আকৃতি দান করা যেমন– কারো ধারণার আধুনিকায়ন ।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার

হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে । মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালিমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্য হালাল করে নিয়েছো । (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

ইসলামের মৌলিক বৈপ্লবিক আদর্শ, নারীদেরকে উপযুক্ত অধিকার ও মর্যাদা জাহিলিয়্যাতের যুগেই প্রদান করেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে।

ইসলামের লক্ষ্য ছিল এবং এখনো অব্যাহত আছে– আমাদের চিন্তাকে আধুনিক করা, আমাদের জীবনযাপন, আমাদের দেখাশোনা, সমাজে নারীদের শৃঙ্খলামুক্ত করা ও তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য আমাদের অনুভূতি ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে নেয়া প্রয়োজন ঃ

১. আনুমানিক পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মুসলিম। তবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রকমের। কোন কোন সমাজ ইসলামের কাছাকাছি আবার কোন কোন সমাজ অনেক দূরে অবস্থান করে (ব্যবহারিক দিক দিয়ে)।

২. "ইসলামে নারীর অধিকার" এর বিচার হবে ইসলামের মূল সূত্রের আলোকে– মুসলিমরা কী করে এর উপর ভিত্তি করে নয়।

৩. ইসলামের মূল সূত্রগুলো হলো, কুরআন– আল্লাহর বাণী এবং সুন্নাহ যা আমাদের প্রিয়নাবী ﷺ -এর বাণী।

৪. কুরআন নিজের সাথে বৈপরীত্য করে না এবং সহীহ হাদীসের অন্য হাদীসের সাথে বৈপরীত্য নেই, এমনকি এ দুই মূল সূত্র কখনো একে অপরের সাথে বৈপরীত্য করে না।

৫. অনেক সময় পণ্ডিতগণ মতানৈক্য করেন, এ মতানৈক্য কুরআনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা দূর করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ যদি কুরআনে নির্দিষ্ট কোন আয়াত যদি জটিল হয় তাহলে অনেক সময়ই কুরআনেরই অন্য কোথাও তার সমাধান আছে। কিছু লোক হয়তো এক সূত্র উল্লেখ করে অন্যগুলোকে অবহেলা করতে পারে। এটা করা যাবে না।

৬. সর্বশেষ হলো, প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ যাই হোক তার কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় কাজ করা। নিজের মতে সন্তোষ অর্জন ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এখানে সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলাম নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের, বিরোধিতার নয়, যা শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে লিপ্ত করে।

ইসলামে নারীর অধিকার

ক) আত্মিক অধিকার
খ) অর্থনৈতিক অধিকার
গ) সামাজিক অধিকার
ঘ) শিক্ষার অধিকার
ঙ) আইনগত অধিকার
চ) রাজনৈতিক অধিকার

ক) আত্মিক অধিকার

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এই যে, তারা চিন্তা করে ইসলামে জান্নাত শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এ ভুল ধারণা সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াত এর দ্বারা দূর করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমাদের যে কেউ সে নারী হোক বা পুরুষ মু'মিন সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না।"

একই রূপ বর্ণনায় সূরা আন নাহলে ৯৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় সৎ আমল করবে সে নারী-পুরুষ যাই হোক না কেন তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিবো।"

এটা এ কারণে যে, ইসলামে জান্নাতে প্রবেশের জন্য লিঙ্গ কোন মাপকাঠি নয়। সূরা ইসরায় (বনী ইসরাঈল) ৭০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকেই বিশেষ মর্যাদা দান করেছি।"

এখানে সকল আদম সন্তানকে সম্মানিত করা হয়েছে, পুরুষ এবং নারীকে।

কিছু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, যেমন– বাইবেল, যা মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-কে দায়ী করে। বাস্তবে আল কুরআনের সূরা আ'রাফ ১৯ থেকে ২৭ নম্বর আয়াতগুলোতে দেখা যায় সেখানে আদম ও হাওয়াকে ১২ এর অধিক বার সময় সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়েই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন, উভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করেছিলেন এবং উভয়কে ক্ষমা করা হয়েছিল।

বাইবেলের জেনেসিস ৩য় অধ্যায় পড়লে দেখা যায় মানবতার পতনের জন্য শুধুমাত্র হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-কে দায়ী করা হয়েছে এবং "মূল পাপ" এর বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-এর কারণে সকল মানবতা পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। বাইবেলের জেনেসিস, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে বলা হচ্ছে– নারীদের লক্ষ্য করে ঃ তুমি গর্ভধারণ করবে, দুঃখের মাঝে জন্ম দেবে, তোমার আশা হবে তোমার স্বামী এবং সে তোমাকে শাসন করবে। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানকে বাইবেলে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসববেদনা এক ধরনের শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে আল কুরআন গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মদান নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সূরা লুকমান, আয়াত ১৪ বলেন ঃ

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। তাই আমি নির্দেশ দিলাম আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।"

সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫ এ একই নির্দেশ ঃ

"আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে।"

কষ্ট সহ্য করে তাকে দুগ্ধ দান করেছে। আল কুরআনে গর্ভধারণ নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেনি।

আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হলো "তাকওয়া" তথা আল্লাহভীতি বা 'ন্যায়নীতি'।

সূরা হুজুরাতে ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

"ওহে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদের এক জোড়া মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পরিচিতির জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।"

লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ এগুলো ইসলামের কোন মাপকাঠি নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে মাপকাঠি হল 'তাকওয়া'। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ কি নারী এ কোন মাপকাঠি নয়।

সূরা আলে ইমরানের ১৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"আমি তোমাদের কোন কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে নারী হোক কি পুরুষ, তোমরা পরস্পরের সঙ্গী।"

সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"মুসলিম নর ও মুসলিম নারীর জন্য বিশ্বাসী নর ও নারীর জন্য, একনিষ্ঠ নর ও নারীর জন্য, সত্যবাদী নর ও নারীর জন্য, ধৈর্য ও সহনশীল নর ও নারীর জন্য, বিনয়ী নর ও নারীর জন্য, সৎ নর ও সতী নারীর জন্য, সিয়ামদার নর ও নারীর জন্য, লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নর ও নারীর জন্য, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী নর ও নারীর জন্য। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

এ আয়াতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে আত্মিক কর্তব্য, নৈতিক কর্তব্য নারী-পুরুষের জন্য সমান। কিন্তু ইসলামে নারীদের জন্য বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন করেছে। যদি তিনি ঋতুমতী বা গর্ভবতী হন তাহলে তাঁকে সিয়াম পালন করতে হবে না, তবে পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ভাল হলে সিয়াম পালন করবেন। ঋতু ও সন্তান জন্মদানের পর তাঁকে সলাতও আদায় করতে হয় না। পরবর্তীতেও এ সলাত আদায় করতে হবে না।

খ) অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত হন বা নাই হন, কারো সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই সম্পদের মালিক হতে পারেন, বিলি-বণ্টন করতে পারেন, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারেন।

১৮৭০ সালে প্রথম ইংল্যান্ডে বিবাহিত নারীকে কারো সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন ও বণ্টন করার আইনগত অধিকার দান করা হয়। ইসলাম নারীদেরকে ১৩০০ বছর (পশ্চিমাদের তুলনায়) পূর্বে যে অর্থনৈতিক অধিকার দান করেছে এটা অনেক পুরাতন অধিকার।

ইসলামে একজন নারী যদি কাজ করতে চায় তাহলে করতে পারে, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কোন দলীল নেই, যতক্ষণ না তা হারাম হবে, সে বাইরেও যেতে পারবে তবে (তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে) শরীয়াহ সমর্থিত পোশাক পরিধান করে যেতে হবে।

কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে তিনি তাঁর দেহ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনীমূলক কোন কাজে অংশ নিতে পারবেন না। যেমন মডেলিং, অশ্লীল সিনেমা এবং এ ধরনের নানাবিধ কাজে। আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ আছে যা নারীর জন্য হারাম, পুরুষের জন্যও হারাম। যেমন– মদ সরবরাহ করা, জুয়া খেলা, অন্যান্য অসৎ ব্যবসা এ সকল কাজ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। সত্যিকার মুসলিম সমাজ নারীদের ডাক্তারি পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করে। আমাদের নারী গাইনোকোলজিষ্ট দরকার, আমাদের নারী নার্স দরকার, নারী ল্যাব টেকনিশিয়ান দরকার, নারী ইনভেস্টিগেটর দরকার, নারী উকিল দরকার, নারী শিক্ষিকা দরকার।

কিন্তু একজন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবারের পুরুষের উপর ন্যস্ত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আছে, সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এখানেও তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, তিনি তার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন কিন্তু অবশ্যই পর্দার মধ্যে থেকে।

এ ছাড়া বাড়ীতেও কাজ করতে পারেন। ঘরে বসে কম্পিউটারে অনেক রকম কাজ করতে পারেন। ইন্টারনেটে অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে আয় করতে পারেন। তিনি ফ্যাক্টরী বা ছোট আকারের কারখানা যেগুলো নারীদের জন্য করা হয়েছে সেখানেও কাজ করতে পারেন। তিনি এমন স্থানে কাজ করতে পারেন যেখানে নারীদের জন্য পৃথক সেকশন করা আছে। কেননা ইসলামে নারী-পুরুষে মেলামেশার বিধি-নিষেধ রয়েছে।

তিনি ব্যবসা করতে পারেন, যেখানে লেনদেনের প্রশ্ন আসে, বিশেষ করে বিদেশী কোন পুরুষ বা গায়রে মাহরামের সাথে লেন-দেনের প্রশ্ন আসে সেখানে তিনি পিতা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্রের মাধ্যমে এগুলো করতে পারেন।

সর্বোত্তম উদাহরণ খাদীজা (রাদিআল্লাহু আনহা) যিনি আমাদের প্রিয়নাবী ﷺ –এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী নারী ছিলেন এবং তিনি তাঁর লেনদেন তাঁর স্বামী নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে করতেন। একজন নারী পুরুষের তুলনায় অধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে। অর্থনৈতিক দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায় না। এটা পরিবারের পুরুষের উপর। এটা পিতা, বা ভ্রাতার উপর বিয়ের পূর্বে। বিয়ের পর স্বামী অথবা সন্তানের উপর। বিয়ের পর তার থাকা, খাওয়া, পোশাক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তায়।

বিয়ের সময় তিনি অংশ পাচ্ছেন। তিনি একটা উপহার পাচ্ছেন, যাকে বলা হয় 'মোহর'। এটাও কুরআনের সূরা নিসার ৪ নম্বর আয়াতের নির্দেশ ঃ

"নারীদের তাদের মোহরানা আবশ্যিকভাবে দিয়ে দাও।"

বিবাহকে ইসলাম পবিত্র করণার্থে মোহর আবশ্যকীয় করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শুধু নামকা ওয়াস্তে মোহর নির্ধারণ করা হয়, কুরআনের নির্দেশের নামান্তর মাত্র। অথচ তারাই জাকজমক রিসিপশন, বাড়ি-গাড়ি সাজানো, ডিনার ও লান্চের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করছেন।

ইসলামে মোহর নির্ধারণের কোন সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। কিন্তু যখন কেউ রিসিপশনেই লাখ লাখ টাকা খরচ করেন তখন মোহর এর তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ ভাল হওয়া উচিত।

মুসলিম সমাজে বহু অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষ করে পাক-ভারত এলাকায়। তারা সামান্য মোহর দিয়ে আশা করে স্ত্রীর নিকট হতে ফ্রিজ, টিভি, আসবাবপত্র, আশা করে স্ত্রী তাকে ফ্লাট দিবে, গাড়ি দিবে ইত্যাদি এবং বিরাট অংকের যৌতুক স্বামীর মর্যাদার উপর ভিত্তি করে। সে যদি গ্র্যাজুয়েট হয় তাহলে ৫ লক্ষ টাকা আশা করতে পারে, যদি প্রকৌশলী হয় তাহলে ১০ লক্ষ, যদি ডাক্তার হয় তাহলে ২০ লক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন স্বামীর জন্য তাঁর স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকার দান করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে। যদি আমরা কুরআন অধ্যয়ন করি তাহলে সূরা নিসা, সূরা বাকারা ও সূরা মায়িদার বহু আয়াতে পাবো যে একজন নারী তিনি স্ত্রী, মা, বোন বা কন্যা যাই হন না কেন তার উত্তরাধিকার রয়েছে এবং এগুলো আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতা'আলা) কর্তৃক আল কুরআনে নির্ধারিত।

গ) সামাজিক অধিকার

একে চারটি উপ-বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সামাজিক অধিকার যেগুলো দেয়া হয়েছে– কন্যাকে, স্ত্রীকে, মাকে ও বোনকে।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার

কন্যাকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে সেদিকে দেখা যাক। ইসলাম নারী শিশু হত্যা নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে সূরা তাকভীরের ৮ ও ৯ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?" শুধু কন্যা সন্তান হত্যাকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি? সকল প্রকারের শিশু সে পুত্র শিশু বা কন্যা শিশু হোক না কেন?

সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"আর তোমরা খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমরাই তোমাদের ও তাদের আহার যোগাই।"

ইসলামপূর্ব আরবে যখনই কোন কন্যা শিশু জন্মলাভ করত, তাদের বেশিরভাগকেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে এ প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও ইন্ডিয়াতে এ কুপ্রথা চলছে। বি.বি.সি রিপোর্ট অনুযায়ী, "তাকে (কন্যা) মরতে দাও" নামক অনুষ্ঠানে এমিনি বেকমেন নামক একজন ব্রিটিশ নাগরিক যিনি ব্রিটেন থেকে ভারতে কন্যা শিশু হত্যার পরিসংখ্যান প্রদানের জন্য এসেছিলেন।

তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী এ পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক দিন ৩,০০০ এরও অধিক ভ্রূণ হত্যা করা হয় যখন আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে জানা যায় যে সেগুলো কন্যা। যদি এ সংখ্যাকে ৩৬৫ দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে দেখা যায় ইন্ডিয়াতে প্রতি বছর এক মিলিয়নেরও অধিক কন্যা ভ্রূণ-এর গর্ভপাত করানো হচ্ছে।

ইসলাম আমাদেরকে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছে। সে শিশু নর-নারী যাই হোক না কেন? ইসলামে একজন কন্যাকে যথাযথভাবে লালনপালন করতে হবে। আহমাদ হাদীস গ্রন্থের একটি হাদীস অনুযায়ী রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে যথাযথভাবে লালন করবে, সে শেষ বিচারের দিন এরকম আমার সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আমার খুবই নিকটবর্তী হবে।"

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তা মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভেধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত।"
(সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫)

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের উপযুক্ত লোকটি কে? তিনি বললেন, তোমার মা, লোকটি বলল, তারপর কে? বলল, তোমার মা, লোকটি আবারো বলল, তারপর কে? বলল, তোমার পিতা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এখানে ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান। চারভাগের তিনভাগ সম্মান, মর্যাদার প্রথমাংশ বরং উত্তমাংশ মাতার জন্য, বাকী চার ভাগের এক ভাগ সম্মান এবং মর্যাদা পিতার জন্য।

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার

পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাই নারীকে 'শয়তানের' যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করত। কুরআন নারীকে 'মুহসানা' আখ্যা দিয়েছেন যার অর্থ "শয়তান থেকে সুরক্ষিত।" ভাল নারীকে একজন বিয়ে করলে সে তাকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সিরাতুল মুস্তাকীম এর উপর টিকিয়ে রাখে– যেটা হচ্ছে সঠিক পথ।

সহীহ বুখারী থেকে রসূল ﷺ যুব সম্প্রদায়কে বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে। এটা তাদের চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।"

মহান আল্লাহ বলেন, *"আমরা স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি।"*

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, তদুপরি তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা এ সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরা রূম ঃ ২১)

সূরা নিসার ২১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি, পবিত্র কনটাক্ট। সূরা নিসার ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা যায়েজ নেই।"

অর্থাৎ বিয়েতে উভয়ের অনুমতি ও সম্মতি প্রয়োজন। এটা আবশ্যক যে, নর-নারী উভয়কে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে অন্য কেউ এমনকি পিতাও তার কন্যার অসম্মতিতে জোর করতে পারবেন না।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে– এক নারীর বিয়ে তার অসম্মতিতে তার পিতা দিয়েছিলেন, তিনি মহানাবী ﷺ এর নিকট গেলেন, মহানাবী ﷺ তার বিয়ে বাতিল করে দেন।

"আর তোমরা তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রাখবেন।"
(সূরা নিসা ৪ ঃ ১৯)

বিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার

অসুস্থাবস্থায় নারীর প্রতি ইহসানের আচরণ করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ সময়ে কোন কঠিন কথা বা তর্ক এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত সময় তালাক দেয়া যাবে না ঃ

১) অসুস্থাবস্থায় তালাক (পীরিয়ড চলাকালীন সময়ে)।
২) অসুস্থতা শেষে মেলামেশা করলে পরবর্তী অসুস্থাবস্থা না আসা পর্যন্ত।
৩) সন্তান জন্মের অব্যাহতির পর।
৪) একবারে তিন তালাক (মারাত্মক গুনাহের কাজ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ)।

আইনবিদরা বলেছেন এগুলি সুন্নাহ বিরোধী এবং ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য।

নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি বিষয়

যারা সতী-সিদ্ধ রমণীদের অপবাদ দেয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং তাদের ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেন।

- *আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪)*

- *যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মু'মিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (সূরা নূর ২৪ ঃ ২৩)*

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া

আল্লাহ তা'আলা বিবাহ সম্পর্কে বলেন, বিবাহ হল, আল্লাহ তা'আলার মহান নিদর্শন, যার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও পারস্পরিক অনুগ্রহ তৈরি হয়।

- *আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ৩০ ঃ ২১)*

আল্লাহ ও রসূলের প্রতি নারীর দায়িত্ব

- মু'মিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু বা সহযোগী, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, সলাত কায়েম করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৭১)

ঘ) শিক্ষাগ্রহণের অধিকার

আল কুরআনের প্রথমে নাযিলকৃত পাঁচ আয়াত হলো সূরা আলাক।

"পড় [জ্ঞান অর্জন কর] তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে"

আল কুরআনের প্রথম নির্দেশনা যেটা মানবতার প্রতি নাযিল হয়েছিল তা সলাত নয়, সিয়াম নয়, যাকাত নয়– তা ছিল পড়া– ইসলাম শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। নাবী ﷺ পিতা-মাতাকে সর্বাধিক তাগাদা দিয়েছেন যেন তারা কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দেয়। একজন নারীর বিয়ের পর স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা। সে যদি নিজে এটা করতে সক্ষম না হয়

অথচ স্ত্রী যদি তা চায় তাহলে স্বামী অন্য কোথাও শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্ত্রীকে যেতে দেবেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী নারীরা জ্ঞানার্জনের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা একদা নাবী ﷺ -কে বললেন, আপনি সাধারণত পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, আপনি আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করলে আমরা আপনাকে (প্রয়োজনীয়) প্রশ্ন করতে পারি। নাবী ﷺ রাজি হলেন। তিনি নিজে তো যেতেনই অনেক সময় সাথীদেরও তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করতেন।

ভেবে দেখি, ১৪০০ বছর পূর্বে যখন নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হতো তাদের শিক্ষা তো দূরের কথা, তাদেরকে পণ্য দ্রব্যের মতো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সে মুহূর্তে নারীর শিক্ষাদানের প্রতি কতই না তাকিদ। এই পৃথিবীতে অনেক স্কলার মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে।

সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত যেটা তা হলো আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) যিনি ছিলেন প্রথম খলিফা আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর কন্যা এবং প্রিয়নাবী ﷺ -এর স্ত্রী। তিনি রসূল ﷺ এর সাহাবা এমনকি খলিফাদের পর্যন্ত দিকনির্দেশনা দিতেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ভাগিনা উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাদিআল্লাহু আনহু)। তিনি বলেছেন, আমি কুরআনের ব্যাপারে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। ফরয, হালাল, হারাম এবং আরবী, ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতায় তার জ্ঞানের জুড়ি নেই।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন না, চিকিৎসা বিষয়েও তার অগাধ জ্ঞান ছিল। যখনই বিদেশী প্রতিনিধি রসূল ﷺ -এর নিকট আসতেন এবং আলোচনা করতেন, তিনি তাদের গবেষণাধর্মী আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তা মনে করে রাখতেন।

গণিতশাস্ত্রেও তাঁর ভাল দখল ছিল, অনেক সময় সাহাবীগণও মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান নিতে আসতেন। মীরাস কত অংশে বিভক্ত হবে, কত অংশ প্রত্যেকে পাবে এ সম্পর্কে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি চার খলিফাসহ অন্যান্য সাহাবীগণকেও দিকনির্দেশনা দিতেন। অনেক সময় তিনি আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি নিজে ২,২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু উম্ম, আবু মুসার মতে তিনি (আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)) একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, যখনই আমাদের সাহাবীদের কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব ঘটত, আমরা তখন আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর নিকট যেতাম এবং অবশ্যই তাঁর নিকট এ বিষয়ের জ্ঞান ছিল। তিনি ৮৮ জনের অধিক স্কলারকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, এমনকি সুফিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) যিনি রসূল ﷺ -এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ইসলামী ফিকহে দক্ষ ছিলেন। ইমাম নববীর মতে, সুফিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) ঐ সময়ের নারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বুদ্ধিমতি ছিলেন।

আরেক দৃষ্টান্ত উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা) যিনি প্রিয়নাবী ﷺ -এর স্ত্রী ছিলেন। ইবন হাযার-এর মতে তিনি বিভিন্ন ধরনের ৩২ জন স্কলারকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আরো অনেক উদাহরণের মধ্যে ফাতিমা বিনতে কায়স। বলা হয় যে, তিনি একবার আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) ও উমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সারাদিন ফিকহ শাস্ত্রের উপর আলোচনা করার পরও তাঁকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তিনি প্রথম যুগে ইসলামে প্রবেশ করেন এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

অন্য উদাহরণ ঃ যেমন উম্মে সুলাইম, যিনি আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু)এর মাতা, তিনি ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক ভাল ভূমিকা রাখেন। যেমন সাইয়্যেদা নাফিসা যিনি হাসান (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর পৌত্রী ছিলেন, চার মাযহাবের এক প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ী (র) এর শিক্ষিকা ছিলেন। আরো উদাহরণ যেমন উম্মে দারদা (রাদিআল্লাহু আনহা), যিনি আবু দারদার স্ত্রী এবং বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন যে, তিনি তার ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন।

সে সময় যখন নারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো, যখন জন্ম লাভের সাথে সাথে নারীদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তখন চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিম দক্ষ নারীরা ছিলেন। কারণ ইসলাম ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক নারী হবেন শিক্ষিতা।

ঙ) আইনগত অধিকার

ইসলামী আইন অনুযায়ী নর-নারী সমান। শরীয়াত নর-নারী উভয়ের জীবন এবং সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে সে কঠিন শাস্তি লাভ করবে, আর তা হলো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

"তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোন নারী হত্যা করে সেও হত্যাকৃত হবে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৭৮-১৭৯)

"চোর সে নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, তার হাত কেটে দাও, তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩৮)

অর্থাৎ নারী পুরুষ যেই চুরি করুক তার হাত কাটা হবে, শাস্তি একই।

"কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন তাকে ১০০ দোররা মার।" (সূরা নূর ২৪ ঃ ২)

ব্যভিচারের শাস্তি সে নারী বা পুরুষ যেই করুক না কেন তার শাস্তি একই অর্থাৎ ১০০ দোররা, ইসলামে নারী পুরুষের একই শাস্তি। ইসলামে নারীদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। ইসলাম একজন নারীকে ১৪০০ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দেবার অধিকার প্রদান করেছে।

অথচ এখন আধুনিককালে ইহুদী পুরোহিতরা বিবেচনা করছে যে, নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কিনা?

"যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাযির করে না, তাদেরকে ৮০ কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী।" (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪)

ইসলামে ছোট অপরাধে দুই জন সাক্ষী এবং বড় অপরাধে চার জন সাক্ষী প্রয়োজন। কোন নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য। অতএব তার জন্য চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে।

চ) রাজনৈতিক অধিকার

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।" (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৭১)

তারা সামাজিক সহায়কই নয়, রাজনৈতিকভাবে ও নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী। ইসলামে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে। সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"ওহে নাবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে আসবে।"

এখানে আরবী শব্দ 'বাইয়ানা'-এর অর্থ আধুনিক ও বর্তমান ভোটের চেয়েও অধিক ক্ষমতা, কারণ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ শুধু আল্লাহর রসূলই ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্র প্রধানও ছিলেন। এবং নারীরা নাবী ﷺ -এর নিকট আসতেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিয়ে সম্মতি দিতেন। সুতরাং ইসলাম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে। এমনকি নারীরা আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে।

নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন। বুখারীতে পূর্ণ একটা অধ্যায়ই রয়েছে "যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারী"। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীরা পানি সরবরাহ করেছেন, সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। এখানে নাসিবা নামের একজন নারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য যিনি ওহুদ যুদ্ধে প্রিয় নাবী ﷺ -কে প্রতিরক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।

যেহেতু কুরআন রয়েছে, "পুরুষ নারীদের সংরক্ষক", এ কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়, এটা পুরুষের দায়িত্ব। শুধু প্রয়োজনেই নারীদের অনুমতি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তাঁরা কেবল প্রয়োজনেই যুদ্ধে যাবেন অন্যথায় নন। যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা ১৯০১ সাল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি লাভ করে এবং তা মাত্র নার্স এর ভূমিকায়। পরবর্তীতে নারী অধিকার আন্দোলন যা ১৯৭৩ সালে শুরু হয়, এ নারী অধিকার আন্দোলন দাবি করল, কেন নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না? সুতরাং ১৯৭৬ সালের পর আমেরিকার সরকার নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকা প্রতিরক্ষা বিভাগ কর্তৃক যেটা ১৯৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত হয়, তাদের একশটি কনভেনশনে ৯০ জন লোক যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়, যার মধ্যে ৮৩ জন নারী। এছাড়া ১১৭ জন অফিসারকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়। দেখা যচ্ছে মাত্র একটা কনভেনশনে ৮৩ জন নারী যৌন নিপীড়নের স্বীকার হন।

ঐ ১১৭ জন কর্মকর্তার অপরাধ কী ছিল? তারা নারীদের দৌড়াতে বাধ্য করেছিল, তাদের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারা তাদেরকে যৌন অঙ্গগুলো অনাবৃত উলঙ্গ অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করেছিল। জনসাধারণের সামনে যৌন ক্রিয়া করেছিল। আমরা কী এটাকে নারী অধিকার বলবো? সুতরাং ইসলাম নারীদের শুধু জরুরী অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। তবে তাদের ইসলামী হিজাব, ইসলামী নিয়ম এবং সতীত্ব বজায় রাখতে হবে। ইসলাম নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাস করে, সমঅধিকার বলতে সমরূপ বুঝায় না।

একটি উদাহরণ

মনে করি একটি শ্রেণীতে ২ জন ছাত্র A এবং B এক পরীক্ষায় যৌথভাবে তারা প্রথম হয়েছে। তারা ৮০% নম্বর পেয়েছে। A ও B দুজনই ১০০ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছে। যখন প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করা হলো এবং দেখা গেল, ১০টি প্রশ্ন প্রতিটিতে পূর্ণ নম্বর ১০ করে। প্রথম প্রশ্নে A ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে B পেয়েছে ৭, প্রথম প্রশ্নে A ছাত্রটি B এর চেয়ে ভাল। দুই নম্বর প্রশ্নে A পেয়েছে ১০ এ ৭ এবং B পেয়েছে ৯। দ্বিতীয় প্রশ্নে B ছাত্রটি A এর চেয়ে ভাল। ৩নং প্রশ্নে উভয়ে সমান। যোগ করে A ও B সমান নম্বর ১০০-র মধ্যে ৮০। সংক্ষেপে A ও B ছাত্রদ্বয় সমান যদিও কোন প্রশ্নে A ভাল কোনটিতে B ভাল। একইরূপে দৃষ্টান্তটি ধরে, আল্লাহ পুরুষকে বেশি দিয়েছেন। মনে করি ঘরে একজন চোর ঢুকেছে, তখন আমি কি বলবো যে আমি নারী অধিকারে বিশ্বাসী, আমি কি আমার মাতাকে, বোনকে অথবা কন্যাকে বলবো যাও এবং চোরের সাথে যুদ্ধ কর? না, বরং স্বাভাবিকভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো, যদি প্রয়োজন হয় তারা হয়তো হস্তক্ষেপ করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ যেহেতু পুরুষকে শারীরিকভাবে অধিক শক্তি দিয়েছেন, তাকেই সামনে অগ্রসর হতে হবে এবং চোরকে ঠেকাতে হবে। সুতরাং এখানে শারীরিক শক্তিতে পুরুষ নারীর চেয়ে এক ডিগ্রী উপরে। আরেকটি দৃষ্টান্ত– যেখানে পিতা-মাতাকে সম্মান

দেবার প্রশ্ন, যেখানে সন্তানদের মাতাকে পিতার চেয়ে ৩ গুণ সম্মান দিতে হবে। এখানে নারীদের পুরুষের চেয়ে উপরে রাখা হয়েছে। অতএব গড়ে সমান। ইসলাম ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, সমরূপতায় নয়। ইসলামে গড়ে নর-নারী সমান।

নারীর স্বাধীনতা নাকী অসম্মান!

নারীর স্বাধীনতা বলতে আসলে কী বুঝায়? আমরা উন্নত দেশগুলোতে নারী স্বাধীনতার নামে কিছু বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করি।

- রাস্তা-ঘাটে যতো পোষ্টার বিজ্ঞাপন হিসেবে টানানো হয় সেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশালীন ছবি দেখা যায়।
- পত্র-পত্রিকায় নারী-পুরুষের যতো ছবি ছাপা হয় তার মধ্যে নারীদেরকেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেখা যায়।
- নাটক-সিনেমায় যা প্রচার হয় তার মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশালীন দেখা যায়।
- ঘরের বাইরে, শপিং মলে, পার্কে, কর্ম ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী সর্ট ড্রেস পরে থাকে।
- একইভাবে বেশীরভাগ ক্রীড়া-প্রতিযোগীতায় যেন নিয়ম করা হয়েছে যে নারী পরবে পুরুষের তুলনায় সর্ট ড্রেস।
- কোন নতুন মডেলের গাড়ির বিজ্ঞাপনে দেখা যায় গাড়ির পাশে একটি বা দু'টি মেয়েকে অশালীন পোশাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।
- যেমন, সাবান একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা নরনারী সকলেরই প্রয়োজন কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে মডেল হিসেবে একটি নারীকে।

একজন নারী মন্তব্য করেছেন যে - "নারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত ড্রেস তো পুরুষরাই তৈরী করে, এতে নারীদের দোষ কোথায়?" এখন বিষও তো পুরুষরা তৈরী করে সেজন্য আমি জেনেশুনে তো আর বিষ পান করতে পারি না। যেহেতু সর্বত্র নারী স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, একজন স্বাধীন নারী হিসেবে যদি আমি যা ইচ্ছে তাই সংক্ষিপ্ত ড্রেস পরতে পারি তাহলে তো একজন নারী হিসেবে আমার এই স্বাধীনতাও আছে যে আমি আমার শরীর অন্যকে প্রদর্শন করবো না, ঢেকে রাখবো।

নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ইসলাম

আমরা বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জের যুগে বসবাস করছি। এই চ্যালেঞ্জের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম। ভোগবাদী, বস্তুবাদী, পুজিবাদী এবং মুসলিম নামধারী কিছু ব্যক্তিদের ধারণা ও বক্তব্য, নির্বিচারে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করছে। ইসলামী চিন্তা ও সংস্কৃতির কোন এলাকাই এই আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। তবে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু নারী, ইসলামের নারী-ভাবনা ও নারী সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তগুলো। তাদের দাবী নারী সম্পর্কে ইসলামের মনোভাব সেকেলে, নিচুস্তরের এবং খুবই অসভ্য। নারীর ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানগুলো পীড়নমূলক। ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়নি। বলাবাহুল্য এই মিথ্যে প্রচারণামূলক এই ডিসকোর্স অনেকাংশে সফল। কারণ তাতে এমনকি অনেক মুসলিমরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে তাদের আস্থা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক লড়াইয়ের স্বভাব যারা জানেন তারা বুঝেন এর পরিণতি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য খুব সুখকর না। মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণে নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা আমাদের প্রতিটি নারীর জানা অবশ্য কর্তব্য।

মূলনীতি এক

যাবতীয় কল্যাণ ও সত্যের, পার্থিব ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে, উৎস হচ্ছে ওহী বা কুরআন ও হাদীস, জীবনের যাবতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই উৎসতেই ফিরে

যেতে হবে, কোন ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা যাবে না, দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করা। কারণ, উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে, এটা ঈমানের একটি মৌলিক অঙ্গ এবং তার শর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"*আপনার রবের কসম তাদের ঈমান আনা হবে না, যদি না তারা তাদের মাঝে বিবদমান বিষয়গুলোতে আপনাকে বিচারক মানে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে নিঃসংকোচে ও পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)*

ইসলামিক ডিসকোর্সের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'রবুবিয়্যাত'-এ বিশ্বাস। অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা গোটা মানবীয় জীবনের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও বিধান দেয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তা'আলার। স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের আরেকটি হচ্ছে 'উলুহিয়্যাত'-এ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের অর্থ সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই বিচারক মানা ও একমাত্র তারই ইবাদত করা।

মূলনীতি দুই

দৃঢ়ভাবে এ-বিশ্বাস রাখা যে, ইসলামী শরীয়ত স্থান ও কাল ভেদে জীবনের সব এলাকায় সফল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই দ্বীন ও তার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষাঙ্গিক বিধানগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, এই দ্বীনের পুরোটাই কল্যাণকর, সুবিচারী এবং মানুষের জন্য এক মহা আশীর্বাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"এই কুরআন সঠিকতম পথের নির্দেশনা দেয় এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদের এই সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান"। (সূরা ইসরা ঃ ৯)

এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে কারণ, এই বিধানের উৎস প্রজ্ঞাবান ও সূক্ষ্ম জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা, যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে যার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের (অজ্ঞতার) বিধান চায়? যাদের ইয়াক্বীন আছে তাদের জন্য আল্লাহর বিধানের চেয়ে ভাল আর কোন বিধান থাকতে পারে"!
(সূরা মায়িদা ঃ ৫০)

সুতরাং যে কোন সিদ্ধান্ত ও অনুশীলনের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, সফলতা ও ভ্রষ্টতা নির্ধারণ করতে হবে এই মাপকাঠি দ্বারা এবং এর উপর নির্ভর করেই তার

সংশোধন ও সংস্কার করতে হবে, অমুসলিমদের বা অমুসলিম চিন্তা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত কোন মুসলিমের চিন্তাপদ্ধতি ও পরিমাপক দ্বারা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তারা যেন আল্লাহ আপনার নিকট যা নাযিল করেছেন, তার কোন কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে"।
(সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

মূলনীতি তিন

মূল্যবোধ, বিধান, নানা বিষয়ের ধারণা, ইত্যাদি বিষয়ের মানব রচিত বিচার পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা। মানবীয় এই সব চিন্তা ও বিচার পদ্ধতিগুলো, অনেক সময়ই, হাজির হয় ঝলমল মোড়কে। এবং অনেক ক্ষেত্রে তা – স্বীকার করতে দ্বিধা নেই– পূর্ণ বা খণ্ডিত সত্য ধারণ করতে পারে। কারণ নানা ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও, বিচার-বিবেচনা ও সত্য চেনার ক্ষেত্রে মানুষের যে আদি-জন্মগত স্বভাব, মানুষের মাঝে সব সময় তার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই আদি ফিতরতের বলে বা বিশুদ্ধ-নিখাদ বুদ্ধি-যুক্তি দ্বারা মানুষ তার রচিত চিন্তা ও বিচার পদ্ধতিতে অনেক সময় সত্যকে পেতে সফল হয়। কিন্তু সচেতন থাকতে হবে, সব কিছুর পরও এই মেথডলজি সীমাবদ্ধ এবং আল্লাহ প্রদত্ব পদ্ধতির মত সর্বদিকে সুসঙ্গত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"যদি তা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত"। (সূরা নিসা ঃ ৮২)

মানুষ, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে, আজ যে সব অনিষ্ট-অকল্যাণে আক্রান্ত হয়ে আছে তার কারণ এই সঠিক আল্লাহ প্রদত্ত উৎস থেকে বিচার পদ্ধতিগুলোর বিচ্যুতি। এই সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

"মানুষের নিজেদের কর্মের ফলেই জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে"।
(সূরা রূম ঃ ২১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ *"যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো ইলাহ থাকত তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে আরশের রব তা থেকে পবিত্র"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২২)*

মূলনীতি চার

ইসলাম ধর্ম ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম, এই বিশ্বাস জাগরূক রাখা। আর ন্যায়পরায়ণতা মানে সমমানের দু'টি বিষয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা এবং অসম বিষয়গুলোর জন্য নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মান নির্ধারণ করা। ইসলাম নিঃশর্ত সমতা-সাম্যের ধর্ম, এই ধারণা ভুল। নিঃশর্ত সাম্যের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন মানের বিষয়কে সমমান দান করে, যা মূলতঃ যুলুম ও অবিচার। তবে যারা ইসলাম সাম্যের ধর্ম বলতে, ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম বুঝাতে চান, তারা ধারণাগতভাবে সঠিক। কিন্তু তাদের ভাষাটি ভুল। কুরআন কোথাও নিঃশর্ত সাম্যের আদেশ করেনি। কুরআন, বরং, সব জায়গায় ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও এহছান (সর্বত্তোম উপায় অবলম্বন) এর আদেশ দেন"। (সূরা নাহল ঃ ৯০)

শরীয়তের বিধানগুলোর ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। সুতরাং সমতা রক্ষায় যেখানে ন্যায়বিচার হয় সেখানে শরীয়ত সাম্য রক্ষা করে আর যেখানে ভিন্নতা-তারতম্য করাই হয় ইনসাফের দাবি সেখানে শরীয়ত তারতম্য করে। ইসলামে নিঃশর্ত সমতার কোন ধারণা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"আপনার রবের কালিমা পূর্ণ সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। তার বাণীতে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"। (সূরা আনআ'ম ঃ ১১৫)

অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা সত্য সংবাদ দান করে এবং ইনসাফপূর্ণ বিধান দেয়। তাই ইসলাম মানবীয় জীবন ও মানবীয় সম্পর্কগুলোকে যে এককের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা 'ইনসাফ'। সবাইকে ইনসাফ করতে হবে, সবার সাথে এবং সর্বাবস্থায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অন্যায় করতে বাধ্য না করে। ইনসাফ করে যাও। কারণ সেটাই তাক্বওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী"।
(সূরা মায়িদা ঃ ৮)

মূলনীতি পাঁচ

আধুনিক 'জাহিলিয়্যাত'-এর নাম পশ্চিম। সমকালীন এই জাহিলিয়্যাত মানবীয় সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে তার নাম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা। ব্যক্তিতান্ত্রিকতা নির্ভর যে কোন ধরনের মানবীয় সম্পর্ক, পরিণতিতে, যৌক্তিক ও প্রাকৃতিকভাবেই, চরম দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠে। পরস্পর দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ও স্বার্থপরতা হয় এই সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি। এই পরিণতি কোন ধরনের মানবীয় সম্পর্কের জন্যই সুখকর নয়। কিন্তু ওহী নির্ভর চিন্তা ও বিচার পদ্ধতিবিচ্যুত পশ্চিম মানুষকে এর চেয়ে ভাল কিছু দিতে সক্ষম নয়। আজ জগৎ জুড়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে নির্মম দ্বান্দ্বিকতায় আক্রান্ত হয়ে আছে, তাদের উভয়ের অধিকার ব্যহত হচ্ছে তা মূলতঃ পশ্চিমের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাকৃতিক ফলাফল। কারণ পশ্চিমের এই চিন্তা ও সংস্কৃতির আদি বীজ, যে মিথলজি বা পুরাণ, তা মনে করে নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের মাঝে রয়েছে এক আদি দ্বন্দ্ব, এবং নারীই হচ্ছে মানুষের মহা আদি পাপের মূল কারণ। এই মিথলজি অন্য অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত ও মুসলিম সংস্কৃতির সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলামী শরীয়তে মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে, তার নির্ধারক নারী বা পুরুষ নয়। তার নির্ধারক আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব কিছু সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি পায়"।
(সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯)

অনেক মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অবিচার করছে। ক্ষুণ্ন হচ্ছে তাদের অধিকার। ইসলামের কোন ত্রুটির কারণে এ রূপ ঘটছে ব্যাপারটি আদৌ সেরকম নয়। এটা ইসলামের কোন সংকটও নয়। তার কারণ, বরং, সেই সমাজের মুসলিমদের নিজেদের দ্বীন থেকে বিচ্যুতি, ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা, রবের প্রতি তাদের ঈমানের দুর্বলতা। কিংবা দেখা যাবে সেই সমাজের মুসলিমরা মানব রচিত কোন বিধান বা শরীয়ত বিরোধী স্থানীয় কোন প্রথা ও সংস্কারের অনুকরণ করার ফলে এই বিপদে আক্রান্ত হয়েছে।

মূলনীতি ছয়

ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিমদের মাঝে উদ্ভব ঘটে নানা ধরনের মুনাফিকীর। যে মুসলিমদের মনে অসুস্থতা আছে, ঈমানে দুর্বলতা আছে, তাদের সে অসুস্থতা ও দুর্বলতা উম্মুক্ত হয়ে পড়ে। বেড়ে যায় ইসলামবিরোধী চিন্তা ও বক্তব্যের অনুগত মুসলিম শ্রোতা ও পাঠক। এই মুনাফিক মুসলিম শ্রেণীও ইসলামের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তারাই শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে"! (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৪)

এই মুনাফিকরা অধিকাংশ সময় বিভ্রান্তিকর ও প্রতারক ভাষা ব্যবহার করে। তারা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এবং তার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় তৈরি করে ইসলামী শরীয়তের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করে থাকে। ফলে তাদের ভাষা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে। সুতরাং এই সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা মুসলিম চিন্তাবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এবং মুসলিমদের মধ্যে বস্তুগত ও চিন্তাগত পরাজয়ের প্রভাবে ইসলাম ও তার শরীয়ত ও বিধানের প্রতি যাদের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও ডিসকোর্সের প্রতি মনযোগ বেড়ে যায় এবং ফলে তাদের মনে নানা সংশয় বিকশিত হয়, তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় নসিহত করাও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

সমস্যার মূল ও সমাধান

সবসময় সমস্যার মূলে আঘাত হানতে হয়। আমার মেয়ে বা বোন পর্দা করে না, এটা মেনে চলে না, ওটা করে না ইত্যাদি অনেক অভিযোগ। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। সমস্যার মূল কোনটা। একজন ঈমানদার হিসেবে আমি নিঃসন্দেহে চাই যে আমার মেয়ে বা বোন ন্যূনতম পর্দা মেনে চলুক। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করবে না। এখন যদি আমি আমার ক্ষমতার দাপট দিয়ে তাদের উপর পর্দা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি তাহলে তাহলে বুঝতে হবে আমি সমস্যার মূলে না গিয়ে এর শাখা প্রশাখায় আঘাত হেনে ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর তৃপ্তি খুঁজছি। মূল সমস্যা কিন্তু রয়েই গেল। অথবা আমি লক্ষ্য করছি তারা সলাত আদায়ের ব্যাপারে মনযোগী নয়। এ অবস্থায় তাকে জোর করে সলাতে মনযোগী করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ ক্ষেত্রেও আমাকে সমস্যার মূলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সকল সমস্যার মূলে সমাধান না করে যদি কেবল আগা আর শাখা প্রশাখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই তাহলে একদিকে সমস্যার অস্থায়ী সমাধান হয়তো হবে অপর দিকে আরো নিত্য নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে যদি আমি ইসলামী পরিবার গঠন করতে চাই তাহলে সকল সমস্যার গোড়া হলো ঈমানের বুঝ ও আল্লাহ ভীতির অভাব। যার ভেতর ঈমানের আলো যত বেশী, যিনি আল্লাহকে যত বেশী ভয় পান তিনি তত পরিপূর্ণ মানব বা মানবী। সুতরাং পর্দা বা সলাত ইত্যাদি মূল কোন বিষয় নয়। একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে আল্লাহর হুকুমগুলি সে শোনা মাত্রই মানার চেষ্টা করবে। তাকে খুব বেশী চাপ দেয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে আস্তে আস্তে সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

রসূল ﷺ -এর জীবনী ও সাহাবীদের জীবনী নিজে পড়তে হবে। এর জ্ঞান পরিবারের সবার সাথে শেয়ার করতে হবে। এ থেকে শিক্ষা কী তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এভাবে কোন কাহিনীর মাধ্যমে, আল্লাহর ভয় জাগরুক রাখার মাধ্যমে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় জানা হবে। দ্বীনের প্রতি ভালবাসা বাড়বে। রসূল ﷺ -এর প্রতি মহব্বত জাগ্রত হবে। দ্বীনের হুকুম আহকাম শুনলে কেউ নাক সিটকাবে না।

আমাদের সিংহভাগ নারীরা শবেবরাত, ঈদের সেমাই তৈরী ইত্যাদিতে আনন্দ পায় ও পালন করতে বেশী উদ্বুদ্ধ। কিন্তু যদি কোন বেপর্দা নারীকে পর্দার

নসিহত করা হয় তাহলে তিনি নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন অথবা উল্টো ওয়াজ নসিহত করে দেবেন। অথবা যদি তাকে বলা হয় যে এত গহনা পড়া ঠিক নয় এটা দৃষ্টি কটু এবং এতে অহঙ্কারের ভাব আসে। অথবা যদি কল্যাণময়ী হয়ে জিজ্ঞেস করা হয় গহনার যাকাত আদায় করা হয় কি না? এতে অনাকাংক্ষিত একটা পরিস্থিতির অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো জাতীয় রোগ। তবে আল্লাহর বিশেষ রহমতে আমাদের শিক্ষিতা বোনেরা এখন আগের যে কোন সময়ের তুলনায় দ্বীনের প্রতি বেশী সংবেদনশীল ও জ্ঞানী। তারা অনেকেই এখন কুরআন ও সহীহ হাদীস চর্চা করেন। দ্বীনের প্রতি তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি ক্যানাডার মতো একটি অমুসলিম দেশে বসে আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের অন্যতম ফরয হুকুম "পর্দা বা হিজাব" সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মন-মানসিকতা দান করেছেন। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ, পর্দার উপর দিন দিন মানুষের সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়ছে, সবদেশেই এর উল্যেখযোগ্য ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২০০৭ সালে আমরা লন্ডন ইসলামিক সেন্টার ভিজিট করতে যাই এবং লন্ডনের রাস্তায় যে পরিমাণ হিজাব পরিহিতা তরুণীদেরকে দেখি তা নিজেদের মুসলিম দেশেও দেখিনি। তবে মাশা-আল্লাহ্ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, ঢাকার রাস্তায়ও এখন চোখে পরার মতো অনেক হিজাব পরিহিতা তরুণীদেরকে দেখা যায়।

পর্দার আসল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা খুব কম সংখ্যক মুসলিম মেয়েরাই জানি, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর সলাতের মতো কেন এই পর্দাকেও ফরয করলেন তা আমরা না জেনেই অনেকে পর্দা করি যার কারণে পর্দার আসল উদ্দেশ্য সফল হয় না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম প্রধান দেশে থেকেও আমরা পর্দার আসল রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারিনি অথচ এটা আমরা জানতে পেরেছি অমুসলিম দেশ ক্যানাডাতে এসে। বাজারে পর্দার উপর অনেক বই পাওয়া যায়, কিন্তু এতোসব বই যোগাড় করে সবার সবসময় পড়া হয়ে উঠে না। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য পর্দা সংক্রান্ত সকল বিধান সংক্ষেপে এই বইতে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। এই বইয়ে মূলতঃ সূরা নূর এবং সূরা আহযাবের উপর এনালাইসিস করা হয়েছে।

শেষ কথা

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক। এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা গবেষণা করে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

জোর করে কারো উপর কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সবকিছুর মূলে হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, তাই প্রতিদিন এই তাকওয়া অর্জন করতে হবে এবং সেই সাথে ঈমানকে মজবুত করতে হবে। আমরা বেশীর ভাগ মুসলিমরাই আংশিক বা ভুল ঈমান নিয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করছি, ঈমান সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। আমাদের ঈমান যখন মজবুত হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে এই দুনিয়ার সকল কঠিন কাজই আমাদের নিকট অতি সহজ হয়ে গেছে। আর সামান্য পর্দা করা তো কোন ব্যাপারই না।

প্রকৃত ঈমানদারের জীবনে কোন দুঃখ থাকে না, থাকে না কোন হতাশা। তারা সবসময়ই সুখী। কুরআনের আলোকে নিজের পারিবারিক জীবনকে গড়ে তুললে দেখা যাবে সেই সবচেয়ে বেশী সুখী। পরিবারে কোন দুঃখ নেই, নেই কোন অশান্তি, চারিদিকে সুখ আর সুখ। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন আমাদের প্রকৃত সুখ কিসে। কিন্তু আমরা আল্লাহর দেয়া শান্তির পথকে বাদ দিয়ে যখন নিজেদের মনগড়া স্টাইলে শান্তি খুঁজতে থাকি তখনই নেমে আসে অশান্তি। আসুন আমরা কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করি, নিয়মিত কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা) অধ্যয়ন করি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে গড়ে তুলি।

একজন নারী যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলবে, নাবীর অনুকরণ করবে, ইসলাম ও শরীয়তের বিধানের উপর অটল বিশ্বাস রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আত্ম-মর্যাদাশীল, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও উত্তম জাতি হিসেবেই পরিগণিত হবে। এতে সে দুনিয়াতে সফলতা ও প্রশান্তি লাভ করবে আর কিয়ামতের দিন মহান সওয়াব ও বিনিময়ের অধিকারী হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ জন নারীর জীবনী

উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা
(রাদিআল্লাহু আনহা)

নাম খাদিজা। কুনিয়াত 'উম্মু হিন্দ'। লকব 'তাহিরা'। বংশনামা হলো ঃ খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে খুওয়াইলিদ বিন আসান বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই। মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনতু যায়িদ। তিনি আমের বিন লুব্বীর বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পিতা খুওয়াইলিদ বিন আসাদ একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি শুধু স্বগোত্রেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন না বরং সুন্দর আদান-প্রদান ও বিশ্বস্ততার কারণে সমগ্র কুরাইশের মধ্যে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

'হাতীর সাল'-এর ১৫ বছর পূর্বে ৫৫৫ খৃস্টাব্দে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি নেক ও শরীফ প্রকৃতির ছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হলে আবু হালাহ হিন্দ বিন নাবাশ তামিমীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু হালাহর ঘরে তাঁর দু'টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। এক পুত্রের নাম ছিল হালাহ। জাহিলী যুগেই সে মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হলো হিন্দ। কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আবু হালাহর ইন্তিকালের পর খাদিজার (রাদিআল্লাহু আনহা) দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল আতিক বিন আবেদ মাখজুমীর সঙ্গে। তার ঘরেও একটি মেয়ে জন্ম

নিয়েছিল। তার নাম ছিল হিন্দ। কিছুদিন পর আতিক বিন আবেদও মারা যান। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী খাদিজার তৃতীয় বিয়ে হয়েছিল তাঁর চাচাত ভাই ছাইফী বিন উমাইয়ার সাথে। তার ইন্তিকালের পর রসূলে কারীমের ﷺ সঙ্গে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র তৃতীয় এবং শেষ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় রসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে।

প্রিয় নাবী ﷺ -এর সাথে বিয়ের পূর্বে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিধবা সময়ে একাকীত্বে সময় কাটাতেন। কিছু সময় তিনি কাবা শরীফে অতিবাহিত করতেন এবং কিছু সময় সমকালীন সভ্রান্ত নারী গণকদের সঙ্গে ব্যয় করতেন। সে সময় তিনি তাদের সঙ্গে তৎকালীন বিপ্লব নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। কুরাইশের বড় বড় সরদার তাঁর নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেইসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা একের পর এক দুঃখে তাঁর মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছিল।

এদিকে বার্ধক্যের কারণে তাঁর পিতা নিজের বিরাট বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না। সকল কাজ-কারবার মেধা ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কন্যার হাতে সোপর্দ করে তিনি নির্জনত্বে চলে যান। কিছুদিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পিতা খুওয়াইলিদ বিন আসাদ ফুজ্জারের যুদ্ধে মারা যান এবং তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। যাহোক এটা সন্দেহাতীত ব্যাপার যে, প্রিয় নাবী ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় খুওয়াইলিদ জীবিত ছিলেন না এবং আমর বিন আসাদই খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর অভিভাবক ছিলেন।

খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ব্যবসা অব্যাহত রাখলেন। সে সময় তাঁর ব্যবসা একদিকে সিরিয়া এবং অন্যদিকে সমগ্র ইয়েমেনে বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে আরব, ইহুদী ও খৃস্টান কর্মচারী এবং গোলাম ছিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বস্ততার কারণে তাঁর ব্যবসা ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল। এসময় তিনি একজন অসাধারণ যোগ্য, মেধাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে তিনি নিজের নেতৃত্বে এই সময় কর্মচারীকে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে বাইরে প্রেরণ করতে পারেন।

যুগটি ছিল সেই যুগ যখন প্রিয় নাবী ﷺ -এর পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলীর কথা প্রতিটি ঘরে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সে সময় তিনি ছিলেন যুবক এবং সমগ্র জাতির মধ্যে আমিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কানে এই পবিত্র ব্যক্তির কথা না পৌঁছাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তিনি নিজের ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য এই ধরনের গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানেই ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -কে বাণিজ্যিক পণ্য সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে পাঠালেন এবং জানালেন যে, যদি এতে সম্মত হন তাহলে তিনি তাঁকে ভালভাবেই স্মরণ রাখবেন।

প্রিয় নাবী ﷺ সে সময় তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে খাদিজার (রাদিআল্লাহু আনহা) ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত হতেন। তিনি ﷺ খাদিজার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন এবং বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানার প্রাক্কালে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) নিজের বিশেষ গোলাম মাইছারাহকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সঙ্গে দিলেন এবং তাকিদ দিয়ে বলে দিলেন যে, সফরকালে যেন তাঁর কোন কষ্ট না হয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর আচরণের বদৌলতে সকল পণ্য দ্বিগুণ লাভে বিক্রি হয়ে গেল। সফরকালে কাফেলা সরদার অর্থাৎ প্রিয় নাবী ﷺ সাথী বা সতীর্থদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করলেন যে, সকলেই তাঁর প্রশংসাকারী হয়ে গেল। কাফেলা যখন মক্কা ফিরে এলো তখন খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) মাইছারাহর মুখে সফরের বর্ণনা ও লাভের বিস্তারিত তথ্য শুনতে পেয়ে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং নিজের দাসী নাফিসার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করলেন। মুহাম্মাদ ﷺ ইঙ্গিত পেয়ে সে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র চাচা আমর বিন আসাদকে ডেকে আনলেন। সে সময় তিনিই তাঁর অভিভাবক ছিলেন।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ﷺ নিজের চাচা আবু তালিব এবং বংশের অন্যান্য গণ্যমান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বাড়ীতে গেলেন। আবু তালিব বিয়ের খুতবাহ পড়লেন এবং পাঁচ'শ দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো। সে সময় প্রিয় নাবী ﷺ এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

বিয়ের পর মুহাম্মাদ ﷺ প্রায়ই ঘরের বাইরে কাটাতে লাগলেন। একাধারে কয়েকদিন মক্কার পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। মোট

কথা এভাবেই ১০টি বছর কেটে গেল। একদিন এমনিভাবেই প্রিয় নাবী ﷺ হেরা পর্বতের গুহায় ইবাদতে ব্যাপৃত ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট আবির্ভূত হলেন এবং বললেন, কুম ইয়া মুহাম্মাদ।' অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! দাঁড়াও। রসূলুল্লাহ ﷺ দৃষ্টি উপরের দিকে ওঠালেন। এ সময় তিনি সামনে নুরানী চেহারার একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ ﷺ -কে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং বললেন, পড়। মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, আমিতো লিখা-পড়া জানি না। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) পুনরায় একই কথা বললেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বার যখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন ঃ

"পড়ুন (হে রসূল) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট পিন্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।"

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যা বললেন মুহাম্মাদ ﷺ এর পবিত্র মুখ দিয়েও একই কথা বেরিয়ে এলো। এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় রসূল ﷺ -এর উপর সীমাহীন প্রভাব পড়লো। বাড়ী ফিরে বললেন, 'আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।' খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) নির্দেশ পালন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন? আমিতো চিন্তিত হয়ে কয়েকজনকে আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছি।' প্রিয় নাবী ﷺ সকল ঘটনা খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) নিকট হুবহু বর্ণনা করলেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, 'আপনি সত্যি কথা বলে থাকেন, গরীবদের সাহায্য করেন, অতিথিপরায়ণ, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন, আমানতদার এবং দুঃখী মানুষের খোঁজ-খবর আপনি নেন। আল্লাহ আপনাকে একাকী ছেড়ে দেবেন না।' অতঃপর রসূল ﷺ ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারকাহ বিন নাওফলের নিকট গেলেন। জাহেলী যুগে এই ওয়ারকাহ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে খৃস্টান হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাওরিত, যাবুর ও ইনজিলের একজন বড় আলেম। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে সংঘটিত সকল ঘটনা তাঁর সামনে বর্ণনা করলেন। ওয়ারকাহ ঘটনা শুনতেই বলে উঠলেন ঃ 'এতো সেই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যিনি মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি

সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম (জাতি) আপনাকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে!'

রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এইসব মানুষ কি আমাকে বহিষ্কার করবে?' ওয়ারকাহ বললেন, "হাঁ, আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা কারোর উপর অবতীর্ণ হলে দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে আপনাকে আমি পুরোপুরি সাহায্য করবো।'

এই আলোচনার পর খুব শিগগিরই ওয়ারকাহ পরলোকগমন করেছিলেন। তবুও খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পূর্ণ আস্থা জন্মেছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। বস্তুত তিনি নির্দ্বিধায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনলেন। সকল স্কলাররাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী হলেন খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)।

প্রিয় নাবী ﷺ -এর সঙ্গে বিয়ের পর খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রায় ২৫ বছর (অর্থাৎ ওহি নাযিলের প্রায় ৯ বছর পর পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি রসূল ﷺ -এর সঙ্গে প্রত্যেক ধরনের অন্তর কম্পিত করা মুসিবত হাসিমুখে সহ্য করতেন এবং প্রিয় নাবী ﷺ -এর বন্ধুত্ব ও জীবন উৎসর্গের হক আদায় করেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ইসলাম গ্রহণের পর রসূল ﷺ -এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যেও ইসলামের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। যুবকদের মধ্যে আলী (রাদিআল্লাহু আনহা), বয়স্কদের মধ্যে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাঁদের পর অন্যান্য সুন্দর স্বভাবের লোকও আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ শুরু করেন। ইসলামের ব্যাপকতায় খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) খুবই আনন্দিত হতেন এবং তিনি অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজেকে হকের দাওয়াতে রসূল ﷺ -এর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে প্রমাণ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য ও এতিম-বিধবাদের উন্নতি, অসহায়দের সাহায্য ও অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে দান (ওয়াকফ) করে দিয়েছিলেন। এদিকে কুরাইশ কাফিররা নও-মুসলিমদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং হকের দাওয়াতের পথে সব ধরনের বাধা আরোপ করছিল। তারা প্রিয় নাবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালানোর প্রশ্নে সামান্যতম কুণ্ঠাও প্রকাশ করেনি।

কাফিরদের অর্থহীন এবং বাজে কথায় যখন রসূল ﷺ এর হৃদয়তন্ত্রী দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো তখন খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) আরজ করতেন ঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি দুঃখিত হবেন না। এমন কোন রসূল কি আজ পর্যন্ত আগমন করেছেন, যাঁকে নিয়ে মানুষ উপহাস করেনি!' খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এই কথায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর দুঃখ–কুষ্ট দূর হয়ে যেত। মোট কথা, সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে খাজিদাতুল কুবরা (রাদিআল্লাহু আনহা) শুধুমাত্র রসূল ﷺ -এর দুঃখের ভাগীদারই ছিলেন না। বরং প্রতিটি আপদ-বিপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

প্রিয় নাবী ﷺ বলতেন ঃ 'আমি যখন কাফিরদের নিকট থেকে কোন কথা শুনতাম এবং আমার নিকট অসহনীয় মনে হতো তখন আমি তা খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বলতাম। সে আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাতো যে আমার অন্তর শান্ত হয়ে যেত। আর এমন কোন দুঃখ ছিল না যা খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কথায় হাল্কা হতো না।'

আফিফ কিন্দী বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগে একবার আমি কিছু দ্রব্য ক্রয়ের জন্য মক্কা এসেছিলাম এবং আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট অবস্থান করেছিলেন। পরের দিন সকালে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সাথে বাজারের দিকে গেলাম। যখন কাবার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন এক যুবক সেখানে এলো। সে নিজের মাথা আসমানের দিকে উঁচু করে দেখলো এবং কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সেখানে একটি কিশোর এলো এবং প্রথম যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। এই তিনজন সলাত আদায় করলো এবং চলে গেল। আমি আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আব্বাস! মক্কায় বিপ্লব আসছে বলে অনুমিত হচ্ছে।' আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, 'হ্যা, এই তিনজন কে তা তুমি জানো?' আমি বললাম, 'না।' আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, 'এই যুবক এবং কিশোর উভয়েই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। যুবকটি হলো আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ এবং কিশোরটি হলো আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)। যে নারী উভয়ের পিছনে সলাত আদায় করলো সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ - এর স্ত্রী এবং খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী হলো, তার দ্বীন ইসলামী দ্বীন এবং সে আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেক কাজ করে থাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই তিনজন ছাড়া অন্য কেউ এই দ্বীনের অনুসারী আছে বলে আমার জানা নেই।'

আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু)-র এই কথা শুনে আমার অন্তরে সাধ জাগলো যে, হায়! আমি যদি চতুর্থ ব্যক্তি হতাম!

এই ঘটনায় অনুমান করা যায় যে, কি প্রতিকুল অবস্থায় খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রিয় নাবী ﷺ -কে সহযোগিতা করেছিলেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এই দরদি, আন্তরিকতা ও জীবন উৎসর্গের কারণেই প্রিয় নাবী ﷺ তাঁকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন নাবী ﷺ দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সন্তানদের লালনপালন, সুষ্ঠুভাবে সাংসারিক কাজ এবং সম্পদ ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নাবী ﷺ এর খিদমত স্বহস্তে করতেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলেন এবং বললেন, "খাদিজা পাত্র করে কিছু নিয়ে আসছেন। আপনি তাঁকে আল্লাহ এবং আমার সালাম পোঁছে দেবেন।"

রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এত গভীর ভালোবাসা ও আস্থা ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে নাবী ﷺ যা কিছু বলেছেন সব সময় তাই তিনি জোরের সাথে সমর্থন ও সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এজন্য নাবী ﷺ তাঁকে সীমাহীন প্রশংসা করতেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পর কুরাইশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ রসূল ﷺ এবং সকল নতুন মুসলিমদেরকে বয়কট করে এবং তারা প্রায় তিনটি বছর গাছের পাতা-ছাল খেয়ে পাহাড়ের ঢালে জীবনযাপন করে। এই বিপদের সময় খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। অবরোধের পুরো তিনটি বছর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তিনি সাহসিকতার সাথে সহ্য করেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে এই নির্যাতনমূলক অবরোধ শেষ হয়। কিন্তু তারপর খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। পবিত্র রমাদানে অথবা তার কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রিয় নাবী ﷺ তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শ্রুষাতে কোনো কমতি করেননি। হায়! মৃত্যুর তো কোন চিকিৎসা নেই! নবুয়তের ১০ম বছরের ১১ই রমাদান তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্তিকাল করলেন। মক্কার হাজুন নামক কবরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর ছিল।

তাঁর মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ ﷺ সীমাহীন দুঃখ পেলেন। সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রায় সময়েই বিষণ্ন থাকতেন।

খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ইন্তিকালের পরও তাঁর প্রতি প্রিয় নাবী ﷺ -এর গভীর ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। রসূল ﷺ যখন কোন কুরবানী করতেন তখন প্রথম খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বান্ধবীদেরকে গোশ্ত প্রেরণ করতেন এবং পরে অন্যদেরকে দিতেন। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কোন আত্মীয় তাঁর নিকট এলে তিনি তাদের খুব যত্ন করতেন।

খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মৃত্যুর পর একটি সময় পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ ততক্ষণ ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন না যতক্ষণ খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র প্রশংসা না করতেন। এমনিভাবে যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর উল্লেখ করে অনেক প্রশংসা করতেন। আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, একবার নাবী ﷺ যথারীতি খাদিজার প্রশংসা শুরু করলেন। আমার ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, "ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি একজন বৃদ্ধা বিধবা নারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর পর আপনাকে তাঁর থেকে উত্তম স্ত্রী দিয়েছেন" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারক ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে ভালো স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সবাই কাফির ছিল তখন সে ঈমান এনেছিল সবাই যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সে নিজের সকল ধন-সম্পদ আমার জন্য কুরবানী করে দিয়েছিল। যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত রেখেছিল তখন আল্লাহ তার গর্ভে আমার সন্তান দিয়েছিলেন।"

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ভবিষ্যতে রসূল ﷺ -এর সামনে কখনো খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে এমন তেমন বলবো না।

খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র গর্ভে আল্লাহ নাবী ﷺ -কে ৬টি পুত্র ও কন্যা সন্তান দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম কাসেম ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শৈশবকালেই ইন্তিকাল করেন। অতঃপর যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা), তারপর আব্দুল্লাহ। তিনিও ছোট বয়সেই মারা যান (তাঁর উপাধি ছিল তাইয়েব এবং তাহের)। অতঃপর রোকাইয়া (রাদিআল্লাহু আনহা)। এরপর উম্মে কুলসুম (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং তারপর ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) জন্মগ্রহণ করেন।

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা
(রাদিআল্লাহু আনহা)

নাম সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)। কুরাইশের আমের বিন লুব্বী গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশ পরিচয় হলো ঃ সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে যামা'আ বিন কায়েস বিন আবদি শামস বিন আবদি উদ্দ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাছাল বিন আমের বিন লুব্বী। মাতার নাম ছিল সামুস বিনতে কায়েস। আনসারের বনু নাজ্জার বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আমরের সঙ্গে।

আল্লাহ সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। রসূলে কারীম ﷺ যখন হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে তাতে সাড়া দিলেন। তাঁর নেক প্রকৃতির স্বামীও তাঁর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু)-ও অন্যান্য মুসলিমদের সহগামী হয়ে হাবশায় হিজরত করেন। কয়েক বছর সেখানে অবস্থানের পর মক্কা ফিরে আসেন। কিছুদিন পর সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করেন এবং সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিধবা হয়ে যান। এ সময় খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করেছিলেন। মাতাহীন শিশুদেরকে দেখে দেখে প্রিয় নাবী ﷺ মন মরা প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। রসূল ﷺ -এর একজন জীবন উৎসর্গকারী নারী সাহাবী খাওলাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে হাকিম একদিন নাবী ﷺ -এর সেবা করার প্রস্তাব করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রসূল! খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ইন্তিকালের পর সব সময়ই আপনাকে বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি।" নাবী ﷺ বললেন, "হাঁ, সাংসারিক কাজ এবং শিশুদের লালনপালন খাজিদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র উপরই ন্যস্ত ছিল।" খাওলা (রাদিআল্লাহু আনহা) আরজ করলেন, তাহলে তো আপনার একজন সাথী ও দুঃখের অংশীদার প্রয়োজন। অনুমতি পেলে আপনার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে পারি।"

নাবী ﷺ এই আরজ মঞ্জুর করলেন। খাওলা (রাদিআল্লাহু আনহা) তৎক্ষণাৎ সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট গমন করলেন এবং তাঁর নিকট রসূল ﷺ

-র ইচ্ছার কথা বর্ণনা করলেন। সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) সন্তুষ্ট চিত্তে নাবী ﷺ এর স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন। তাঁর পিতা যামা'আও রসূল ﷺ পয়গাম কবুল করলেন এবং নিজের আদরের মেয়ের বিয়ে বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর সঙ্গে চারশ' দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে নিজেই পড়ালেন। বিয়ের পর তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বাড়ী এলেন। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই বিয়ের কথা শুনে তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং মাথায় মাটি মাখলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সারাজীবন তিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে এই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল।

যারকানী (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, প্রথম স্বামী সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র জীবদ্দশায় একবার সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় আসমান ফেটে গেল এবং চাঁদ তাঁর উপর এসে পড়লো। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র নিকট বর্ণনা করলেন। সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "এই স্বপ্নের তাবির তো এই মনে হয় যে, শিগগিরই আমি মারা যাবো এবং আরবের চাঁদ মুহাম্মাদ ﷺ তোমাকে বিয়ে করবেন।" বাস্তবিকই এই স্বপ্নের তাবির কিছুদিন পরই পূর্ণ হলো। কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মৃত্যুর পর নাবী ﷺ সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করেন। কিন্তু অন্যদের মতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে রসূল ﷺ -এর দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর নাবী ﷺ হিজরত করে মদীনা যান। সেখান থেকে তিনি আবু রাফে (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হারেছাকে ফাতিমা, উম্মে কুলছুম ও সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) প্রমুখকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা সকলেই যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হারেছা এবং আবু রাফের (রাদিআল্লাহু আনহু) সঙ্গে মদীনা চলে আসেন। পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বে সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রাকৃতিক কাজ প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য বাইরে যেতেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মত ছিল যে, নাবী ﷺ -এর স্ত্রীদের বাইরে বেরুনো উচিত নয়।

প্রসঙ্গটি তিনি একবার নাবী কারীম ﷺ -এর নিকট উত্থাপনও করেছিলেন। কিন্তু প্রিয় নাবী ﷺ তখন চুপ ছিলেন। একদিন সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে দেখা। সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) দীর্ঘাকৃতির ছিলেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে চিনে ফেললেন এবং বললেন, "সাওদা! আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।" ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র এই বাক্য সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট অত্যন্ত অসহনীয় মনে হল এবং তিনি রসূল ﷺ -এর কাছে ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই ঘটনার পর পর্দার আয়াত নাযিল হলো এবং তারপর থেকে নারীদের জন্য পর্দা ফরয হয়ে গেল।

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) কিছুটা কড়া মেজাজের ছিলেন। অবশ্য তিনি সাধারণত হাসি-খুশি ছিলেন। এক রাতে রসূল ﷺ -এর সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। নাবী ﷺ দীর্ঘক্ষণ রুকুতে রইলেন। সকাল হলে তিনি বলতে লাগলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! রাতে সলাতের সময় আপনি এত দীর্ঘক্ষণ রুকতে ছিলেন যে, আমার নাকশিরা ফেটে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং আমি অনেকক্ষণ যাবত নাক চেপে রেখেছিলাম।" নাবী ﷺ তাঁর কথা শুনে মুচকি হেসে দিয়েছেন।

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত রহম দিল এবং দানশীলা ছিলেন। যা কিছু তাঁর নিকট আসতো তা তিনি অত্যন্ত উদার হস্তে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রাদিআল্লাহু আনহু) "ইছাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) হাতের কাজে পারদর্শিনী ছিলেন এবং তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করতেন। এই কাজে যা আয় হতো তা সব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন।

ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে উপহারস্বরূপ দিরহামের একটি থলে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? লোকজন বললো, "দিরহাম" তিনি বললেন, "থলেটি দেখতে তো খেজুরের থলের মতো।" এ কথা বলে তিনি খেজুর বন্টনের মত সকল দিরহাম অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বয়স বেশী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বয়স ছিল কম। এজন্য তিনি তাঁর পালা আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। আয়িশা সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহা) হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)

বলেন ঃ "সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) ছাড়া অপর কোন নারীকে আমি হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা মুক্ত দেখিনি।"

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একবার আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেছিলেন ঃ "সাওদা ছাড়া অপর কোন নারী সম্পর্কে আমার মনে আকাংখাও জাগেনি যে, তার দেহে যদি আমার আত্মা হতো।"

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) দশম হিজরীতে রসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে হাজ্জ করেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী মানুষ। এজন্য দ্রুত চলতে বাধ্য হতেন। মুযদালিফা থেকে রওয়ানার পূর্বেই নাবী ﷺ তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে ভিড়ে তাঁর কষ্ট না হয়।

বিদায় হাজ্জের সময় রসূলে কারীম ﷺ সকল স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "এই হাজ্জের পর নিজেদের বসে থাকতে হবে।"

বস্তুত সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে জাহাশ কঠোরভাবে এই নির্দেশ পালন করেছিলেন। অন্য স্ত্রীগণ হাজ্জ আদায় প্রশ্নে এই নির্দেশ ছিল না বলে মনে করতেন। কিন্তু সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা) রসূল ﷺ -এর ওফাতের পর সারাজীবন ঘর থেকে বের হননি।

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলতেন ঃ "আমি হাজ্জ এবং ওমরাহ দু'ই আদায় করেছি। এখন নির্দেশ অনুযায়ী ঘর থেকে বাইরে বেরুবো না।"

সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র শাসনামলে ২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

সাকরান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র ঔরসে তাঁর একটি পুত্র ছিল। তাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান (রাদিআল্লাহু আনহু)। তিনি ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র খিলাফতকালে জালুলার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হন।

রসূল ﷺ এর ঔরসে সাওদার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত আছে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দিকাহ
(রাদিআল্লাহু আনহা)

নাম আয়িশা। লকব সিদ্দিকাহ এবং হোমায়রা। উম্মে আব্দুল্লাহ কুনিয়াত। কুরাইশের বনু তাইম খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশ পরিচয় হলো ঃ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আবি কাহাফা (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আমের বিন আমর বিন কা'বা বিন সা'দ বিন তাইম বিন মারবাহ বিন কা'বা বিন লুব্বী।

মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে আমের এবং তিনিও ছিলেন বিখ্যাত সাহাবীয়াহ। নাবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির চার বছর পর শাওয়াল মাসে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) জন্মগ্রহণ করেন।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র শৈশবকাল কেটেছিল সিদ্দিকে আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র মত জালিলুল কদর সাহাবার ছায়াতলে। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সীমাহীন মেধাসম্পন্ন এবং শৈশবকালের সকল কথাই তাঁর স্মরণ ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, অন্য কোন সাহাবী অথবা সাহাবীয়ার এত স্মরণ শক্তি ছিল না।

রসূল ﷺ -এর পূর্বে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সম্পর্ক জাবির বিন মাতয়ামের পুত্রের সঙ্গে স্থির হয়েছিল। কিন্তু জাবির মায়ের ইঙ্গিতে এই সম্পর্ক বাতিল করে দেয়। কেননা আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরিজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর খাওলা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে হাকিমের উদ্যোগে নাবী ﷺ আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য পয়গাম প্রেরণ করলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূলে কারীম ﷺ এর মুখে ডাকা ভাই ছিলেন। তিনি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাইয়ের কন্যার সঙ্গে কি বিয়ে হয়?" খাওলা (রাদিআল্লাহু আনহা) এ কথা নাবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহু) আমার দ্বীনি ভাই। এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সঙ্গে বিয়ে জায়িয আছে।" সিদ্দিকে আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র পক্ষে এরচেয়ে বড় খুশী আর কি ছিল যে, তাঁর কন্যার বিয়ে হবে রসূল ﷺ এর সঙ্গে! তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। বস্তুত হিজরতের তিন বছর আগে শাওয়াল মাসে ৬ বছর বয়সে রসূল ﷺ -এর সঙ্গে আয়িশা (রাদিআল্লাহু

আনহা)-র বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) স্বয়ং বিয়ে পড়ালেন। পাঁচশ' দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো।

একবার শাওয়াল মাসে আরবে প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। এই রোগে হাজার হাজার পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সে সময় থেকে আরববাসীর নিকট শাওয়াল মাস অপয়া মাস হিসেবে বিবেচিত হতো এবং তারা এ মাসে আনন্দ-উৎসব করতে অহীহা প্রকাশ করতো। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বিয়েও শাওয়াল মাসে সম্পন্ন হয়েছিল এবং কয়েক বছর পর কন্যা বিদায়ও শাওয়াল মাসেই হয়েছিল। সেই সময় থেকে শাওয়াল মাস অপয়া হওয়ার চিন্তা মানুষের অন্তর থেকে দূর হয়।

নাবী ﷺ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে বিয়ের সুসংবাদ স্বপ্নে লাভ করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি রেশমে লেপ্টানো কোন বস্তু তাঁকে প্রদর্শন করছে এবং বলছে, "এই বস্তু আপনার।" তিনি তা খুলে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে পেয়েছিলেন। খুব সাধারণভাবে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বিয়ে হয়েছিল।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) জন্মগতভাবে মুসলিম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, "যখন আমি পিতা-মাতাকে চিনতে শুরু করি তখন তাঁদেরকে মুসলিম হিসেবে পেয়েছি।" এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, জীবনের শুরু থেকেই আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র উপর কুফর ও শিরকের ছায়াও পড়েনি।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে বিয়ের তিন বছর পর রসূল ﷺ আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে হিজরত করে মদীনা যান। মদীনা পৌঁছে প্রিয় নাবী ﷺ এবং আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) পরিবার-পরিজন আনার জন্য যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হারেছা, আবু রাফে (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ বিন আরিকত (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে মক্কা প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হারেছার সঙ্গে ছিলেন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা), উম্মে কুলছুম (রাদিআল্লাহু আনহা), সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে যামাআ, উম্মে আইমান (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং উসামা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিন যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু)। অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন আরিকত (রাদিআল্লাহু আনহু)র সঙ্গে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু), উম্মে রুমান

(রাদিআল্লাহু আনহা), আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং আসমা বিনতে আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহা)।

মদীনা পৌঁছে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বনু হারেছের মহল্লায় অবস্থিত শ্রদ্ধেয় পিতার গৃহে অবতরণ করলেন। প্রথম দিকে মদীনার আবহাওয়া মুহাজিরদের সহ্য হলো না। আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাঁর সেবা-শুশ্রুষা করলেন। যখন আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন তিনি স্বয়ং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখও এত কঠিন ছিল যে, মাথার চুল পড়ে গেল। এ সত্ত্বেও জীবনে বেঁচে গেলেন। যখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হলো তখন সিদ্দিকে আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ এর নিকট আরজ করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে আপনি উঠিয়ে নেন না কেন?" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বর্তমানে আমার নিকট মোহর নেই।" সিদ্দিকে আকবর (রাদিআল্লাহু আনহা) নিজের নিকট থেকে পাঁচশ দিরহাম রসূল ﷺ সেবায় করজে হাসানা হিসেবে পেশ করলেন। এই অর্থ তিনি গ্রহণ করলেন এবং আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট তা প্রেরণ করে প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁকে তুলে নিলেন। সে সময় আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বয়স ছিল ৯ বছর। অন্য রাওয়ায়েতে ১২ বছর বলা হয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং রসূল ﷺ এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লো তখন মদীনা থেকে আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) সুফিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা), ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং অন্য মুসলিম নারীরা পাগলিনীর মত যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে নাবী ﷺ -কে সুস্থ দেখে শুকরিয়া আদায় করলেন। তাঁরা সকলে মিলে রসূল ﷺ -এর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলেন এবং মশক ধরে ক্ষতস্থানে পানি ঢাললেন। এদিক ওদিক বিশৃংখল অবস্থায় অবস্থারত সাহাবীরা যখন রসূল ﷺ -এর চারপাশে একত্রিত হওয়া শুরু করলেন তখন তাঁরা মদীনা ফিরে গেলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) লিখেছেন, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধেও দুর্গের বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধের চিত্র দেখতেন। রসূল ﷺ -এর নিকট অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু

অনুমতি পাননি। সহীহ বুখারীতে আছে, তিনি রাতে ঘুম থেকে উঠে কবরস্তানে চলে যেতেন। এই সব রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, উম্মুল মু'মিনীন প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়হীন ছিলেন।

আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পবিত্র জীবনে চারটি ঘটনা অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার। এই চারটি ঘটনা হলো ঃ ইফ্‌ক, ইলা, তাহরিম এবং তাখাইয়্যির।

(১) ইফ্‌কের ঘটনা ঃ বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সফরে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) রসূল ﷺ এর সফর সঙ্গী ছিলেন। রাস্তায় এক স্থানে রাতে কাফেলা অবস্থান করলো। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তাঁবু থেকে বের হয়ে দূরে চলে গেলেন। অসাবধানতাবশতঃ গলার হার সেখানে পড়ে গেল। এ হার তিনি বোন আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট থেকে চেয়ে এনেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে যখন বুঝতে পারলেন যে, হারটি হারিয়ে গেছে তখন খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। অতঃপর ফিরে সেদিকে গেলেন। ধারণা করেছিলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হারটি সন্ধান করে ফিরে আসতে পারবেন। যখন হার সন্ধান করে ফিরে এলেন তখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। অনভিজ্ঞতার বয়স। চাদর উড়িয়ে সেখানেই শুয়ে রইলেন। সাফওয়ান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন মুয়াত্তাল নামক এক সাহাবী কোন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনে কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে চিনে ফেললেন। কেননা শৈশবে (অথবা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে) তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে পিছে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন ঘটনা বিস্তারিত জানতে পারলেন অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে উটে বসিয়ে দ্রুত কাফেলার দিকে রওয়ানা হলেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় কাফেলার সঙ্গে গিয়ে একত্রিত হলেন। নামকরা মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলো তখন সে আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ব্যাপারে রটিয়ে দিল যে তিনি আর এখন পবিত্র নেই। সাদাসিধে মনের কতিপয় মুসলিমরাও ভুল ধারণার শিকার হলেন। রসূলে কারীম ﷺ ও প্রাকৃতিকভাবে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র অন্যায় অপবাদের দুঃখে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো এবং পবিত্রতার আয়াত নাযিল হলো ঃ

"যখন তোমরা এই ঘটনা শুনলে তখন মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা কেন পোষণ করনি এবং কেন বলনি যে এটা নীরেট অপবাদ। (সূরা নূর ঃ ১২)"

পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পর শত্রুদের মুখ কালো হয়ে গেল এবং সাধারণ মুসলিম, যারা ভুল ধারণার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরা খুব লজ্জিত হলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মাথা গৌরবে উঁচু হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি শুধু আমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অন্য কারো নিকট কৃতজ্ঞ নই।

(২) তাহরিমের ঘটনা ঃ প্রিয় নাবী ﷺ এর নিয়ম ছিল আসরের সলাতের পর স্ত্রীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমা) নিকট কিছুক্ষণের জন্য গমন করতেন। একবার যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর নিকট বেশ দেরী হয়ে গেল। এতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) ঈর্ষান্বিত হলেন। তিনি গোপনে খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন যে, নাবী ﷺ যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট থেকে মধু খেয়েছেন। এই মধু কেউ তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) হাফছা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বললেন, যখন নাবী ﷺ আমাদের এবং তোমাদের ঘরে আসবেন তখন বলতে হবে, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি মাগাফিরের মধু খেয়েছেন [মাগাফির এক ধরনের ফুল। মৌমাছি এই ফুলে বসে মধু আহরণ করে। আর এ মধুতে সামান্য দুর্গন্ধ হয় এবং প্রিয় নাবী ﷺ সব ধরনের দুর্গন্ধই অপছন্দ করতেন]। যখন নাবী ﷺ বলবেন যে, যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা) মধু পান করিয়েছে তখন তোমরা বলবে, সম্ভবত এই মধু আরফাতের মৌমাছির আহরিত মধু। যখন নাবী ﷺ হাফছা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট গেলেন তখন এই আলোচনা হলো। অতঃপর সুফিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) ও আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-ও একই কথা বললেন। ফলে রসূল ﷺ এর মনে হলো তাঁর পবিত্র শরীরে কেমন যেন গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত যখন তিনি পুনরায় যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট গেলেন এবং তিনি নিয়মমত মধু আপ্যায়ণস্বরূপ দিলেন, তখন রসূল ﷺ বললেন, "তা আমার প্রয়োজন নেই। আমি ভবিষ্যতে মধু খাবো না।" এতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

"নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য যে বস্তু আল্লাহ হালাল করেছেন, তা নিজের উপর হারাম করছেন কেন?"

(৩) ইলার ঘটনা ঃ পূত পবিত্র স্ত্রীদের জন্য খাদ্য ও খেজুরের যে পরিমাণ নির্ধারিত ছিল তা তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না এবং তাঁরা অভাবের মধ্যে সময় কাটাতেন। এদিকে গনিমতের মাল ও বার্ষিক রাজস্ব আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং পবিত্র স্ত্রীরা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) নির্ধারিত জীবিকা বৃদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) নিজেদের কন্যাদ্বয় যথাক্রমে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) ও হাফছা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বুঝিয়ে এই দাবী থেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু অন্য স্ত্রীরা (রাদিআল্লাহু আনহা) ঐ দাবীর উপর অটল রইলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় নাবী ﷺ ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যান এবং পাঁজরে আঘাত পান। তিনি আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ঘর সংলগ্ন উপর তলায় এক কক্ষে অবস্থান করলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। মুনাফিকরা এ ধরনের ঘটনার সন্ধানে থাকতো। তারা রটিয়ে দিল যে, নাবী ﷺ স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। সকল সাহাবা এই খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ এর কাছে গেলেন। তিনি একটি চারপায়ীর উপর শুয়ে ছিলেন এবং পবিত্র শরীরে রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ এর এই অবস্থা দেখে খুবই মনোকষ্ট পেলেন এবং বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? "নাবী ﷺ বললেন, "না"।

ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) এই সুসংবাদ সব লোককে শুনিয়ে দিলেন। এতে সকল মুসলিম এবং পূত-পবিত্র স্ত্রী (রাদিআল্লাহু আনহুন্না) সকলের মধ্যে খুশীর ঢেউ বয়ে গেল।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, "আমি এক এক করে দিন গুণছিলাম। ২৯তম দিনে নাবী ﷺ উপর তলার কক্ষ থেকে নেমে সর্বপ্রথম আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম "ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি এক মাসের ওয়াদা করেছিলেন। আর আজ ২৯ দিন।" তিনি বললেন, "চাদের মাস কখনো ২৯ দিনেও হয়।"

(৪) তাখাইয়্যিরের ঘটনা ঃ ইলার ঘটনার পর একদিন নাবী ﷺ আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট আসলেন এবং বললেন, "আয়িশা, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে যদি জবাব দাও তাহলে ভালো হবে।"

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! কথাটি কী?" নাবী ﷺ সূরায়ে আহযাবের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

"হে নাবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের পার্থিব জীবন এবং তার শোভা প্রয়োজন হয় তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই এবং যদি তোমার আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আখিরাতের গৃহ ভালো মনে হয় তাহলে তোমাদের মধ্যে যে নেককার তার জন্য আল্লাহ বড় সওয়াব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! এতে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শের কি আছে! আমি তো আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং আখিরাতের ঘর পছন্দ করলাম। নাবী ﷺ এই উত্তর পছন্দ করলেন। এই কথা যখন অন্য স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তখন তাঁরাও একই ধরনের জবাব দিলেন।

প্রিয় নাবী ﷺ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে সীমাহীন ভালোবাসতেন। মুসনাদে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! এমনিতেই তো আমি সকল স্ত্রী সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অন্তর আমার আয়ত্তের বাইরে। অন্তর আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কেই বেশী ভালবাসে। হে আল্লাহ। তুমি অন্তরকে ক্ষমা করে দিও।"

প্রিয় নাবী ﷺ পবিত্রতার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন এবং নিজের মেসওয়াক বার বার ধৌত করাতেন। এই সেবার দায়িত্ব আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র উপরই ন্যস্ত ছিল।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রিয় নাবী ﷺ এর উপর জীবন বাজি রাখতেন। একবার নাবী ﷺ রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে কোথাও গেলেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) চক্ষু খুললেন এবং রসূল ﷺ -কে না দেখে খুব চিন্তিত হলেন। পাগলিনীর মত উঠলেন এবং এদিক ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে সন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে এক স্থানে নাবী ﷺ -কে দেখতে পেলেন। তিনি

দেখলেন যে, নাবী ﷺ সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল আছেন। এই সময় তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন।

একবার নাবী ﷺ কম্বল গায়ে দিয়ে মসজিদে আসলেন। একজন সাহাবী জানালেন ঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! এতে দাগ দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়।" তিনি তা একজনকে দিয়ে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) পানি আনলেন। নিজের হাতে সেই দাগ ধুলেন। এরপর কম্বল শুকিয়ে রসূল ﷺ এর নিকট ফেরত পাঠালেন।

প্রিয় নাবী ﷺ যখন ইহরাম বাঁধতেন অথবা ইহরাম খুলতেন তখন আয়িশা সিদ্দিকা (রাদিআল্লাহু আনহা) শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন।

একবার সফরে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র হার হারিয়ে গেল। নাবী ﷺ তা অনুসন্ধানে কতিপয় সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা হার অনুসন্ধানে বের হলেন। রাস্তায় সলাতের সময় হলো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ছিল না। এজন্য তাঁরা ওযূ ছাড়াই সলাত আদায় করলেন। ফিরে এসে তাঁরা রসূল ﷺ এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হাজিয়া একে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)র বড় ফজিলত হিসেবে মনে করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম জাযা দিন। আপনি এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হননি যা থেকে আপনি পরিত্রাণ পাননি এবং মুসলিমদের জন্য তা এক বরকত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।"

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র দাম্পত্য জীবনের ন'বছর পর প্রিয় নাবী ﷺ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন। তের দিন যাবত তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। এই তের দিনের মধ্যে ৫ দিন তিনি অন্য স্ত্রীদের নিকট অবস্থান করেন এবং ৮ দিন ছিলেন আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট। কঠিন রোগের দুর্বলতার কারণে নাবী ﷺ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট মিসওয়াক দিতেন। তিনি নিজের দাঁত দিয়ে তা চিবিয়ে নরম করে দিতেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করতেন। ১১ হিজরীর ৯ অথবা ১২ই রবিউল আউয়ালে আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় রসূল ﷺ এর পবিত্র মাথা আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বুকের উপর রাখা ছিল এবং তাঁর নিজ ঘরের মধ্যে তাকে দাফন করা হয়।

প্রিয় নাবী ﷺ -এর ইন্তিকালের সময় আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বয়স ছিল ১৮ বছর। ৪৮ বছর তিনি বিধবা জীবন অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ইসলাম বিশ্বের হিদায়াত, ইলম ও ফজিলত এবং খায়ের ও বরকতের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তাঁর থেকে ২ হাজার ২শ' ১০টি হাদীস বর্ণিত আছে। অনেকেই বলেছেন, শরীয়তের হুকুম আহকামের এক চতুর্থাংশ আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বিবৃত হয়েছে।

বড় বড় সাহাবী (রাদিআল্লাহু আনহুম) আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে সব ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। আবু মুসা আশয়ারী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইনি যার জ্ঞান আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট ছিল না। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসয়ালা সম্পর্কেই তিনি রসূল ﷺ এর আদর্শ পরিজ্ঞাত ছিলেন। উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, আমি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস এবং বংশনামা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র থেকে বড় আর কাউকে দেখিনি। আহনাফ বিন কায়েস (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং মুসা বিন তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র থেকে সুন্দর ভাষার লোক আমরা দেখিনি।

মুয়াবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বেশী জ্ঞানী বক্তা, শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগকারী এবং তীক্ষ্ম মেধার নারী আর আমি দেখিনি।

চরিতগ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, আয়িশা সিদ্দিকা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র দ্বীনী জ্ঞান ছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস এবং সাহিত্যেও বিশেষ দখল ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জ্ঞান ও ফজিলত ছিল বিরাট। এই জ্ঞান ও তার বাস্তবায়ন বর্ণনার জন্য হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি ছিলেন উম্মাহর কল্যাণকামী।

মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) সকল সাহাবী ও নারী সাহাবীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বর্ণনা অনুযায়ী আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) স্বয়ং

বলেছেন, আমার মধ্যে ১০টি গুণ এমন রয়েছে যা রসূল ﷺ এর অন্য স্ত্রীর মধ্যে নেই।

(১) কুমারী অবস্থায় রসূল ﷺ এর সঙ্গে শুধু আমারই বিয়ে হয়।

(২) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন যে, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করুন।

(৩) আল্লাহ আমার জ্ঞান বারায়াত বা পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন।

(৪) আমার মাতা-পিতা উভয়েই মুহাজির।

(৫) আমি রসূল ﷺ সম্মুখে থাকতাম এবং তিনি সলাতে মশগুল হতেন।

(৬) আমি এবং রসূলে কারীম ﷺ একই পাত্রে গোসল করতাম।

(৭) ওহী নাযিলের সময় শুধু আমি তাঁর পাশে থাকতাম।

(৮) যেদিন আমার পালা ছিল সেদিনই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকাল হয়।

(৯) যখন প্রিয় নাবী ﷺ -এর রুহ আল্লাহর দিকে যাত্রা করে তখন রসূল ﷺ -এর মাথা আমার কোলের উপর ছিল।

(১০) আমার ঘরেই রাহমাতুললিল আলামীনকে ﷺ দাফন করা হয়।

ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু)-র খিলাফতকালে রসূল ﷺ -এর সকল স্ত্রীর (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বার্ষিক ভাতা ছিল ১০ হাজার দিরহাম। অবশ্য আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) ১২ হাজার দিরহাম পেতেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি রসূল ﷺ -এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

ইরাক বিজয়ের সময় গনিমতের মালের মধ্যে মুক্তার একটি পাত্রও ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি জনগণের অনুমতি নিয়ে তা আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সেবায় পাঠিয়ে দিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "হে আল্লাহ! রসূল ﷺ -এর পর ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) আমার উপর বড় ইহসান করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁর উপঢৌকনের জন্য আমাকে জীবিত রেখো না।

ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হলো তখন তিনি নিজের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট প্রেরণ করে তাঁকে রসূল ﷺ -এর পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "আমার দাফনের জন্য এই স্থান রেখেছিলাম। কিন্তু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র খাতিরে আমি আজ তা থেকে হাত গুটিয়ে নিলাম।"

আয়িশা সিদ্দিকা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এই নজিরবিহীন উদারতার কারণেই ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) আজ রসূল ﷺ -এর পাশে শুয়ে আছেন।

ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র পর ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) খলিফা হলেন। তাঁর শাসনকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভয়াবহ ফিতনা এবং ষড়যন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়ায় যার ফলশ্রুতিতে ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। তিন দিনের ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর বার্দ্ধক্যে পীড়িত আমিরুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতরত অবস্থায় যালিমরা যে নির্দয়তার সাথে শহীদ করে তাতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র অন্তর ব্যথিত হয়ে গেল। বস্তুত চতুর্থ খলিফা আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র শাসনামলে কতিপয় সাহাবী (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং মুসলিমদের একটি দল ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বদলা নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এই দলে যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আওয়াম এবং তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু)-র মত বিখ্যাত সাহাবীও ছিলেন।

ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র শাহাদাতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) মনে নিদারুণ দুঃখ ছিল। এজন্য তিনি নেক নিয়তের সঙ্গে এই দলকে সমর্থন করেন। এই দলের ধারণা ছিল যে, ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) হন্তাদের কতিপয় ব্যক্তি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র আশ্রয়ে রয়েছে। ওদিকে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বক্তব্য ছিল, পূর্ণ তদন্তের পর যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীদের সনাক্ত না করা হবে ততক্ষণ তাদের উপর দন্ড জারি করা সম্ভব নয়। এই মতভেদের কারণে উষ্ট্রের যুদ্ধের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) পরিস্থিতি শোধরানোর জন্য নিজের দলসহ বসরা গেলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে আলী (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ব্যাপক জীবন হানি ঘটলো। এ সত্ত্বেও

আলী বিজয়ী হলেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। যখনই আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এই যুদ্ধের কথা স্মরণ হতো তখনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ "হায়! ২০ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র প্রায় দুশ ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। এইসব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কাসিম বিন মুহাম্মদ (রাদিআল্লাহু আনহু) মাসরুক তাবেয়ী (রাদিআল্লাহু আনহু), রায়েশা বিনতে তালহা (রাদিআল্লাহু আনহা), আবুসালমা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু)-দের নাম প্রসিদ্ধ।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) কোন হাদীস বর্ণনা কালে তার নেপথ্য কারণও বর্ণনা করতেন। যে ব্যাখ্যা তিনি দিতেন তা আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতো না। তিনি অন্ধ আনুগত্য পছন্দ করতেন না। সব সময়ই প্রিয় নাবী ﷺ এর কথা ও কাজের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন। যেমন কিছু কিছু হাদীস তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন ঃ

- আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, "ঘরের লোকদের কান্নায় মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়।" আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) যখন এই রাওয়ায়েত শুনলেন তখন তা মানতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, রসূলে কারীম ﷺ এক ইহুদী নারীর জানাজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব ক্রন্দন করছিল। নাবী ﷺ বললেন, মানুষেরা কাঁদছে আর তার উপর আযাব হচ্ছে (অর্থাৎ সে নিজের আমলের সাজা ভুগছে)। এরপর বললেন যে, আল-কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ "কেউ অন্যের গুনার বোঝা বহন করবে না।"

- আবু সাঈদ খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু) একজন বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো তখন তিনি নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরিবর্তন করলেন এবং বললেন ঃ "রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলিম যে পোশাকে মৃত্যুবরণ করবে সেই পোশাকেই তাকে উঠানো হবে।" আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) একথা শুনে বললেন, "আল্লাহ আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু)-র উপর রহম করুন। রসূল ﷺ এর নিকট পোশাকের অর্থ ছিল আমল।"

নৈতিক মর্যাদার দিক থেকে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র স্থান অনেক উর্ধে ছিল। তিনি অসীম দানশীল, অতিথিপরায়ণ এবং দরিদ্র সেবী ছিলেন। একবার আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ তা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সেদিন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। সন্ধ্যায় খাদেম বললো ঃ "উম্মুল মু'মিনীন! কত ভালই না হতো, যদি আপনি ইফতারের জন্য ঐ অর্থ থেকে কিছু গোশ্ত কিনতেন।" তিনি বললেন, "তুমিতো স্মরণ করিয়ে দিতে পারতে।"

উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট ৭০ হাজার পরিমাণ দিরহাম এলো। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন এবং দোপাট্টার আঁচল ঝেড়ে দিলেন।

ইমাম মালিক (রহ.)-র মুয়াত্তায় আছে, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) একদিন সিয়াম পালনরত অবস্থায় ছিলেন এবং হাঁক দিল। তিনি দাসীকে সেই রুটি ভিখারিনীকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দাসী বললো, সন্ধ্যায় ইফতার কী দিয়ে করবেন? উম্মুল মু'মিনীন বললেন, তাকে রুটিতো দিয়ে দাও। সন্ধ্যা হলো। এসময় কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে বকরীর গোশ্ত প্রেরণ করলো। তিনি দাসীকে বললেন, দেখ, আল্লাহ রুটির চেয়ে উত্তম জিনিস প্রেরণ করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীনের (রাদিআল্লাহু আনহা) বদান্যতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন তাঁর ভাগিনা। প্রায়ই তিনি তাঁর সহযোগীতা করতেন। খালার বদান্যতা দেখে দেখে একবার তিনিও ভড়কে গেলেন এবং মুখ ফসকে বলে ফেললেন যে, এখন থেকে তিনি আর কিছু দেবেন না। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) এ কথা জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং ইবনে যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে আর কখনো কথা বলবেন না বলে কসম খেলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি আর তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। তাতে আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) খুব ঘাবড়ে গেলেন এবং অতি কষ্টে মিছওয়ার (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন মাখরামাহ ও আব্দুর রহমান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আছওয়াদকে মধ্যস্থতা করে অপরাধ ক্ষমা করিয়েছিলেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) কসম ভাঙ্গার কাফফারা হিসেবে ৪০টি গোলাম আযাদ করে দেন। এই ঘটনা যখন তাঁর স্মরণ হতো তখন কেঁদে

কেঁদে আঁচল ভিজিয়ে ফেলতেন। ইবনে সায়াদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) নিজের বাসগৃহ আমীর মুয়াবিয়ার (রাদিআল্লাহু আনহু)-র নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিক্রি বাবত যে অর্থ পেয়েছিলেন তা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন।

উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা) রাত-দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ইবাদত অথবা মাসয়ালা-মাসায়েল বলে কাটাতেন। স্নেহ-ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। শত্রু এবং বিরোধীদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। প্রখ্যাত সাহাবী কবি হাসসান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন ছাবিত ইফকের ঘটনায় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বিরোধিতা করেছিলেন। এই ঘটনায় আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মনে খুব দুঃখ ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি হাসসান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন ছাবিতকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কিছু আত্মীয় (রাদিআল্লাহু আনহুম) ইফকের ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে হাসসান (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে গালি দিতে চাইতেন। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তাঁকে খারাপ বলো না। তিনি রসূল ﷺ -এর তরফ থেকে মুশরিক কবিদের জবাব দিতেন।

সহোদর মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) মাবিয়া বিন খাদিজের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, জিহাদের ময়দানে অধীনস্তদের সঙ্গে মাবিয়া অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করেন, কারোর পশু মরে গেলে তাঁকে নিজের পশু দিয়ে দেন, কারোর গোলাম পালিয়ে গেলে তাকে নিজের গোলাম দান করেন এবং সকলেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তখন তিনি বললেন, "আসতাগফিরুল্লাহ! যে ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণ আছে তার উপর তো অসন্তুষ্ট থাকতে পারি না। যদিও সে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী। রসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি এই দু'আ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে তার প্রতি তুমিও দয়া প্রদর্শন করো। যে তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে তার প্রতি তুমিও কঠোরতা প্রদর্শন করো।"

উম্মুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু আনহা) গীবত বা পরনিন্দা এবং খারাপ কথা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর থেকে বর্ণিত কোন হাদীসে কোন ব্যক্তিকে

হেয়প্রতিপন্ন করার অথবা অপকথার একটি শব্দও পাওয়া যায় না। তিনি এত উদার হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন যে, সতীনদের গুণাবলী ও প্রশংসা হৃষ্টচিত্তে বর্ণনা করতেন।

তাঁর অন্তরে সীমাহীন আল্লাহভীতি ছিল। কোন সময় শিক্ষণীয় কোন কথা স্মরণ হলে শুধু কাঁদতেন। একবার তিনি বলেন, ক্রন্দন ছাড়া কখনো আমি পেট পুরে খাই না। তাঁর এক ছাত্র এই কথায় জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন তা আমার মনে পড়ে। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিন দু'বেলা পেট পুরে রুটি ও গোশ্ত খাননি।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) আল্লাহর ইবাদতের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে অনুরক্ত। ফরয সলাত ছাড়াও বেশী বেশী সুন্নাত ও নফল সলাত আদায় করতেন। জীবনে তাহাজ্জুদ ও চাশতের সলাত বাদ দেননি। কঠোরভাবে হাজ্জ পালন করতেন। রমাদানের সিয়াম ছাড়া প্রচুর নফল সিয়াম পালন করতেন। আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কোন সন্তান হয়নি।

আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) ৫৮ হিজরীর রমাদান মাসে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত অনুযায়ী রাতে বিতরের সলাতের পর মদীনার বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) জানাযার সলাত পড়ান। জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়েছিল যা আগে কখনো দেখা যায়নি। তাঁর ইন্তিকালে ইসলামী বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে।

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতে উমর
(রাদিআল্লাহু আনহা)

নাম হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)। তিনি কুরাইশের আদি বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বংশ পরিচয় হলো ঃ হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র মেয়ে। যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে মাজউন ছিলেন মা। তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানীয়া সাহাবী ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবী ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন মাজউন ছিলেন হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মামা এবং ইসলামের ফিকাহবিদ আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন সহোদর।

হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) নাবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। খুনাইস (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হুজাফা বিন কায়েস বিন আদির সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়। তিনি বনু সাহাম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁর সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়তের ৬ বছর পর খুনাইস (রাদিআল্লাহু আনহু) হিজরত করে হাবশা গমন করেন। নাবী ﷺ এর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন এবং পুনরায় হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সঙ্গে হিজরত করে মদীনা গমন করেন।

খুনাইস (রাদিআল্লাহু আনহু) হক পথের একজন জানবাজ সিপাহী ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধে প্রচন্ড বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং লড়াই করতে করতে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে মদীনা নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক চিকিৎসার পরও তিনি আর সুস্থ হননি এবং পরপারের দিকে যাত্রা করেন। ফলে হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিধবা হয়ে যান। ইদ্দত পুরো হলে ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা করলেন। একদিন রসূলে কারীম ﷺ নির্জনে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র প্রসঙ্গ উথাপন করলেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) ব্যাপারটি অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করার জন্য বললেন। কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। এতে ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মনোক্ষুণ্ন হলেন। অতঃপর তিনি ওসমান (রাদিআল্লাহু

আনহু)-র নিকট গেলেন। সে সময় রোকেয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে রসূলুল্লাহ ﷺ মারা যান। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে নিজের কলিজার টুকরাকে বিয়ে করতে বলেন। ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। এ সময় ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

নাবী ﷺ বললেন ঃ "হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বিয়ে আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) উভয় থেকে উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে কেন হতে পারবে না।"

এরপর নাবী ﷺ হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করেন এবং নিজের দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে বিয়ে দেন। সহীহ বুখারীর এক রাওয়ায়েতে আছে, হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র মেজাজে কিছুটা তিরিক্ষেপনা ছিল এবং কখনো কখনো রসূল ﷺ -কে কড়া জবাব দিতেন। একদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) একথা জানতে পেরে হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি শুনেছি তুমি রসূল ﷺ -কে সমানে সমান জবাব দাও। এ কথা কি ঠিক?" হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) জবাব দিলেন ঃ "অবশ্যই আমি এ ধরনের করে থাকি।"

ওমর ফরুক (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন ঃ "মা, খবরদার! আমি তোমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছি। তুমি ঐ নারীর (আয়িশা) সমকক্ষ হতে চেষ্টা করো না। রসূল ﷺ -এর মহব্বতের কারণে তাঁর নিজের রূপের উপর গৌরব আছে।" হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) রসূলে কারীম ﷺ -কে সকল ধরনের মাসয়ালা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতেন। একবার নাবী ﷺ বললেন ঃ "বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো বলেন, "তোমাদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" নাবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু এও তো আছে, "অতঃপর আমরা পরহেজগারদেরকে নাজাত দেব এবং যালিমদেরকে হাটুর উপর উপুড় করে ছেড়ে দেব।"

মেজাজের তিরিক্ষেপনা সত্ত্বেও হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত আল্লাহভীতু ছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। হাফিজ ইবনে

আব্দুল বার (রহ.) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ একবার জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র প্রসঙ্গে এই শব্দাবলী রসূল ﷺ -এর সম্মুখে উল্লেখ করেন ঃ "সে খুব ইবাদতকারী, সিয়াম রাখনেওয়ালী। (হে মুহাম্মাদ) সে জান্নাতেও আপনার স্ত্রী।"

রসূলে কারীম ﷺ হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে আছে, রসূল ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী শাফা' (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে আব্দুল্লাহ অদবিয়া তাঁকে লিখা শিখিয়েছিলেন। জানা যায় প্রিয় নাবী ﷺ কুরআনে হাকিমের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট রেখে দিয়েছিলেন। এই সকল অংশ রসূল ﷺ -এর ওফাতের পর সারা জীবন তাঁর নিকট ছিল। এটা একটি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার ছিল।

হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) দাজ্জালকে খুব ভয় পেতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মদীনায় ইবনে ছাইয়াদ নামক এক ব্যক্তি ছিলো। তারমধ্যে দাজ্জালের কিছু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। একদিন সে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন ওমরকে (রাদিআল্লাহু আনহু) রাস্তায় পেল। তিনি তার কতিপয় কাজে ঘৃণা প্রকাশ করলেন। ইবনে ছাইয়াদ আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে রাস্তায় আটকে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে পেটানো শুরু করলেন। হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) খবর পেয়ে ভাইকে বলতে লাগলেন ঃ "তুমি তাকে কেন জড়িত কর। তোমার কি জানা নেই যে, প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন, ক্রোধই দাজ্জালের আগমনের হেতু হবে।"

হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মদীনার গভর্নর মারওয়ান জানাযা পড়ান এবং কিছুদূর পর্যন্ত মুর্দা কাঁধে করে নিয়ে যান। এরপর আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) জানাযা কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর উম্মুল মুমিনিনের (রাদিআল্লাহু আনহা) ভাই আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররা লাশ কবরে নামান।

মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে ওসিয়ত করেন যে, গাবায় অবস্থিত তাঁর সম্পত্তি সদাকা করে ওয়াকফ করে দিতে। রসূল ﷺ -এর ঔরসে কোন সন্তান তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি। জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকেও হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ ﷺ

নাম ফাতিমা। রসূলে কারীম ﷺ -এর চতুর্থ এবং সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। সাইয়িদাতুন নিসায়াল আলামীন, সাইয়িদাতুন নিসায়ি আহলিল জান্নাত, জাহরা, বতুল, তহিরাহ, মুতহিরাহ, রাজিয়াহ, মুরজিয়াহ এবং যাকিয়াহ তাঁর লকব বা উপাধি ছিলো।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্মকাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রাওয়ায়েত রয়েছে। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী নাবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এ সময় রসূল ﷺ -এর বয়স ৩৫ বছর ছিল। অন্য এক রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর জন্ম নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে হয়েছিল। আর এক রাওয়ায়েত আছে যে, তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং নির্জন প্রিয় ছিলেন। তিনি কোন সময় কোন খেলাধূলায় অংশ নেননি এবং ঘরের বাইরে পা রাখেননি। সব সময় মায়ের পাশেপাশে থাকতেন। তাঁর ও রসূল ﷺ -এর নিকট এমন প্রশ্ন করতেন যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। আত্মপ্রকাশ ও প্রদর্শনীতে ছিল প্রচন্ড অনীহা। খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র এক আত্মীয়ের ছিল বিয়ে। তিনি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য ভালো কাপড় ও গহনা বানালেন। বিয়েতে যোগদানের জন্য যখন বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এলো তখন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) এই মূল্যবান কাপড় এবং গহনা পড়তে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন এবং সাদা-সিধেভাবেই বিয়ের মাহফিলে অংশ নিলেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর সকল তৎপরতায় আল্লাহ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা) ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। একবার যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন শিশুটি জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মাজান! আল্লাহর অসংখ্য কুদরত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। আল্লাহ কি স্বয়ং দেখা দিতে পারেন না?"

খাদিজা উত্তর দিলেন, "মা আমার! যদি আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির হকদার হবো এবং সেখানেই আল্লাহর দর্শন লাভ ঘটবে।"

নবুয়তের দশম বছরে খাদিজার ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র উপর বিপদের পাহাড় নেমে এলো। তাঁর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য নাবী ﷺ সাওদাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করলেন। রসূল ﷺ -এর সমগ্র পবিত্র জীবন দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ ছিল। কিন্তু যখনই সময় পেতেন তখনই তিনি ফাতিমাকে সময় দিতেন এবং তাঁকে আদর ও মূল্যবান নসিহত প্রদান করতেন।

একাকীত্বের সময় হাফছা বিনতে ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহা), আয়িশা বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহা), আসমা বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং ফাতিমা বিনতে যোবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রমুখ তাঁর নিকট প্রায়ই আসতেন এবং দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করতেন। দ্বীনের দাওয়াতের অপরাধে মুশরিকরা প্রিয় নাবী ﷺ -কে খুব কষ্ট দিত। কখনো মাথায় মাটি ঢেলে দিত। রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। যখন নাবী ﷺ ঘরে আসতেন তখন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো স্বয়ং পিতার কষ্ট দেখে দুঃখিত হয়ে পড়তেন। সে সময় নাবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন, "প্রিয় মা আমার! ঘাবড়িয়ো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে একা ছেড়ে দেবেন না।"

একবার নাবী ﷺ কাবা শরীফে সলাত আদায় করছিলেন। কাফিররা অকাজে মেতে উঠলো। তারা উটের নাড়ি-ভুরি নিয়ে এলো এবং সিজদারত অবস্থায় রসূল ﷺ -এর ঘাড়ের উপর রেখে দিল। এই পাষন্ডদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উকবাহ বিন আবি মুঈত। জনৈক ব্যক্তি ফাতিমার নিকট এসে বললো যে, তোমার পিতার সঙ্গে পাষন্ডরা এই ব্যবহার করছে। একথা শুনতেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে কাবা গৃহে পৌঁছে ঘাড় থেকে নাড়ি-ভুরি সরালেন। এ সময় কাফিররা চারপাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল এবং তালি বাজাচ্ছিল। প্রিয় নাবীর কন্যা তাদের প্রতি রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "হতভাগারা! আহকামুল হাকিমিন তোমাদের এই অপকর্মের অবশ্যই শাস্তি দেবেন।" আল্লাহর কি কুদরত! কয়েক বছর পর এইসব কাফিররা বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে মারা গিয়েছিল।

এক সময় মক্কায় কাফির-মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহর তরফ থেকে রসূল ﷺ -এর প্রতি হিজরতের নির্দেশ দেয়া হলো। নবুয়তের ১৩ বছরে এক রাতে নাবী ﷺ আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে নিজের

বিছানায় শুইয়ে রেখে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মদীনা পৌঁছার কিছুদিন পর নাবী ﷺ পরিবার পরিজনকে আনার জন্য নিজের গোলাম আবু রাফে (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হারিছাকে মক্কা প্রেরণ করলেন। এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা), উম্মে কুলছুম (রাদিআল্লাহু আনহা), সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিন যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌঁছে সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) এবং অন্য কন্যারা রসূল ﷺ -এর নিকট নতুন ঘরে অবস্থান শুরু করেন।

মদীনায় হিজরতের সময় ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বয়োপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ এর নিকট ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু প্রিয় নাবী ﷺ চূপ রইলেন অথবা কতিপয় রাওয়ায়েত মুতাবেক বললেন, "যা আল্লাহর হুকুম হবে।" অতঃপর ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন খাত্তাব ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। নাবী ﷺ তাঁকেও একই জবাব দিলেন। কিছুদিন পর নাবী ﷺ ফাতিমার সম্পর্ক আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে স্থাপন করলেন। এই সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হলো সে ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম বর্ণনা হলো, একদিন আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু), ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং সায়াদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আবি ওকাস পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন, ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য রসূল ﷺ নিকট কয়েকটি পয়গাম এসেছে। কিন্তু তিনি কোন পয়গামই মঞ্জুর করেননি। এখন আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বাকী রয়েছেন। সেতো রসূল ﷺ -এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং অত্যন্ত প্রিয় ও চাচাতো ভাই। জানা যায় যে, দারিদ্রতা ও অস্বচ্ছলতার কারণেই সে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছেন না। তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হোক এবং প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্যও করা হোক। পরামর্শের পর এই তিন ব্যক্তি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে খুঁজতে বের হলেন। তিনি জঙ্গলে নিজের উট চরাচ্ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু সহায় সম্বলহীন হওয়ার কারণে তাঁর প্রস্তাব প্রেরণে চিন্তা হলো। তবে এই ব্যক্তিবর্গ বাধ্য করায় রাজি হলেন। এর পূর্বে অন্তরের আকাংখাওতো

তাঁর এই ছিল। স্বভাবজাত লজ্জার কারণে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেননি। একসময় সাহস করে রসূল ﷺ এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। নাবী ﷺ তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কাছে এ কথা বললেন। তিনিও চুপ থেকে নিজের সম্মতির কথা প্রকাশ করলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, আনসারদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) একটি দল আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র জন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণে অনুপ্রাণিত করলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে এ কথা বললেন। নাবী ﷺ তৎক্ষণাৎ বললেন, "আহলান ওয়া মারহাবা" অতঃপর চুপ থেকে গেলেন। আনসার দলটি বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁদেরকে রসূল ﷺ -এর জবাব শুনালেন। তাঁরা আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে মুবারকবাদ দিলেন। তাঁরা বললেন যে, নাবী ﷺ আপনার পয়গাম মঞ্জুর করেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা হলো, আলীর (রাদিআল্লাহু আনহা) আযাদকৃত একজন দাসী একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কেউ কি ফাতিমার (রাদিআল্লাহু আনহা) জন্য পয়গাম প্রেরণ করেছে?" আলী (রাদিআল্লাহু আনহা) জবাব দিলেন, "আমি জানি না।" সে বললো, "আপনি কেন পয়গাম প্রেরণ করেন না?" আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "আমার নিকট কি আছে যে, আমি বিয়ে করবো?"

এই নেকবখত নারী আলীকে (রাদিআল্লাহু আনহা) জোর করে রসূল ﷺ খিদমতে পাঠালেন। কিছুটা রসূল ﷺ -এর শান এবং কিছুটা নিজের স্বভাবজাত লজ্জার কারণে তিনি মুখ খুলে কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলেন।

নাবী ﷺ স্বয়ং দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী! কি ব্যাপার আজ যে নিয়ম ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ চুপচাপ রইলে, ফাতিমার (রাদিআল্লাহু আনহা) সঙ্গে বিয়ের আবেদন নিয়ে এসেছ নাকি?"

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) ব্যক্ত করলেন, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল"

নাবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে মোহর আদায় করার মত কিছু আছে কি?" আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) না সূচক জবাব দিলেন।

পুনরায় নাবী ﷺ বললেন, "আমি তোমাকে যে যেরাহ বা লৌহবর্ম দিয়েছিলাম, তাই মোহর হিসেবে দিয়ে দাও।"

এরপর আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্মটি বিক্রির জন্য বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সাথে দেখা হলো। তিনি চারশ' ৮০ দিরহাম দিয়ে বর্মটি কিনে নিলেন। অতঃপর তা আবার আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন।

লৌহবর্ম বিক্রির অর্থ আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এর তিনভাগের দু'ভাগ খোশবু ইত্যাদি ক্রয়ে খরচ কর এবং অবশিষ্ট একভাগ বিয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় কর।"

অতঃপর নাবী ﷺ আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে আবুবকর (রাদিআল্লাহু আনহু), ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু), আবদুর রহমান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আওফ ও অন্যান্য মুহাজির ও আনসার (রাদিআল্লাহু আনহুম)-দিগকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। যখন সবাই রসূল ﷺ -এর কাছে একত্রিত হলেন, তখন নাবী ﷺ মিম্বরের উপর উঠলেন এবং বললেন ঃ

"হে মুহাজির ও আনসারের দল! এক্ষণই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট এই খবর নিয়ে এসেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মা'মুরে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে মুহাম্মদ ﷺ -এর বিয়ে নিজে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন আবি তালিবের সঙ্গে দিয়েছেন এবং আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, নতুন করে বিয়ের আকদ করে সাক্ষীদের সামনে কবুল করাও।"

এরপর নাবী ﷺ বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন এবং মুচকি হেসে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে বললেন ঃ "আমি চারশ' মিসকাল রৌপ্য মোহরের বিনিময়ে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে তোমার সঙ্গে নিকাহ দিলাম। তুমি কি তা কবুল করছো?"

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন, "জ্বী, কবুল করলাম।" অতঃপর নাবী ﷺ দু'আ করলেন। সকলেই এই দু'আয় শরীক হলেন।

বিয়ের কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, এই বিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সুসম্পন্ন হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য এক রাওয়ায়েতে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বিয়ে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধের পর এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যা হোক, অধিকাংশ ইতিহাসদিদের মতে বিয়ের সময় ফাতিমার বয়স প্রায় ১৫ বছর ছিলো। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বয়স ছিল ২১ বছর।

নাবী ﷺ অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ফরয এবং অধিকার সম্পর্কে নসিহত করলেন এবং বিদায় জানানোর জন্য স্বয়ং দরজা পর্যন্ত এলেন। দরজায় আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) দুই বাহু ধরে দু'আ নিলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) ও ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) উভয়েই উটে সওয়ার হলেন। সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) ফারসী উটের রশি ধরলেন। আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে আমিম এবং অন্য কতিপয় রাওয়ায়েতে সালমা (রাদিআল্লাহু আনহা) উম্মে রাফে অথবা উম্মে আইমন (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

নাবী ﷺ নিজ মেয়েকে বিয়েতে যা উপহার দিয়েছিলেন তা হলো ঃ

১। উল ভরা মিসরী কাপড়ে প্রস্তুত বিছানা
২। নকশা করা একটি পালং
৩। খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ
৪। একটি মশক
৫। পানির জন্য দু'টি পাত্র
৬। একটি যাঁতা
৭। একটি পেয়ালা
৮। দু'টি চাদর
৯। দু'টি বাজুবন্দ
১০। একটি জায়নামায

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রিয় নাবী ﷺ এর বাসভবন থেকে কিছুদূরে ভাড়ায় একটি বাড়ী নিয়েছিলেন। বিয়ের পর নাবী ﷺ আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে ওয়ালিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে বললেন। মোহর আদায়ের পর যে অর্থ বেঁচে গিয়েছিল আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) সেই অর্থ দিয়ে ওয়ালিমার ব্যবস্থা করলেন। এতে পনির, খেজুর, জবের নান এবং গোশ্ত ছিল। আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন যুগে এটা ছিল সর্বোত্তম ওয়ালিমা।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) যখন নিজের নতুন গৃহে গেলেন তখন নাবী ﷺ তাঁর নিকট বেড়াতে আসলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করলেন। একটি পাত্রে পানি আনালেন। নিজের হাত তাতে রাখলেন এবং আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বুক ও বাহুতে পানি ছিটালেন। এরপর ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে নিজের কাছে ডাকলেন। তিনি লজ্জায় অবনত হয়ে রসূল ﷺ -এর সামনে এলেন। নাবী ﷺ তাঁর উপরও পানি ছিটালেন এবং বললেন ঃ "হে ফাতিমা! আমি তোমার বিয়ে স্ব-খান্দানের সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথে দিয়েছি।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র গৃহ রসূল ﷺ -এর বাসভবন থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। যাতায়াতে কষ্ট হতো। একদিন রসূলে কারীম ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বললেন, "মা! প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসতে হয়। তোমাকে আমি কাছে নিয়ে যেতে চাই।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "রসূল ﷺ -এর আশেপাশে হারিসা বিন নু'মানের অনেক বাড়ী আছে। আপনি তাঁকে কোন একটি বাড়ী খালি করে দেয়ার জন্য বলে দিন।"

হারিসা (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন নু'মান একজন ধনী আনসার এবং বেশ কয়েকটি বাড়ীর মালিক ছিলেন। নাবী ﷺ মদীনা আসার পর তিনি পর পর কয়েকটি বাড়ী ইতিমধ্যেই তাঁকে দিয়েছিলেন।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) যখন হারিসা (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বাড়ীর আকাংখা প্রকাশ করলেন তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ মা! হারিসার কোন বাড়ী চাইতে এখন আমার লজ্জা লাগে। কেননা সে প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য কয়েকটি বাড়ী দিয়ে দিয়েছে।"

এ কথা শুনে ফাতিমা চুপ হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে এ কথা হারিসা (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন নু'মানের কানে পৌঁছলো। তিনি জানতে পেলেন যে, নাবী ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে নিজের কাছে আনতে চান। কিন্তু বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তক্ষুণি রসূল ﷺ নিকট হাজির হয়ে ব্যক্ত করলেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আপনি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে নিকটবর্তী কোন বাড়ীতে আনতে চান। আপনার বাসগৃহের সন্নিহিত বাড়ীটি আমি খালি করিয়ে দিচ্ছি। আপনি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে ডেকে পাঠান। হে আমার প্রভু! আমার জীবন ও সম্পদ আপনার উপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম! নাবী ﷺ যে জিনিস আমার নিকট থেকে নেবেন তা আমার নিকট থাকার তুলনায় রসূলের নিকট থাকাটাই আমি বেশী পছন্দ করবো।" নাবী ﷺ বললেন ঃ "তুমি সত্যি বলেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন।" অতঃপর তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে হারিসা (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন নু'মানের বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চলনে রসূলে কারীম ﷺ -এর সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, ধৈর্যশীলা এবং দ্বীনদার নারী ছিলেন। গৃহের সকল কাজ স্বহস্তে করতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে হাত ফোস্কা পড়ে যেত। ঘর ঝাড়ু দেয়া এবং চুলা ফুঁকতে ফুঁকতে কাপড় ময়লা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এসব কাজ থেকে রেহাই ছিল না। গৃহের কাজ ছাড়া বেশী বেশী ইবাদত করতেন। ফাতিমা দারিদ্র ও বুভুক্ষায় তাঁকে পুরোপুরি সহযোগিতা করতেন। রসূল ﷺ তখনকার বাদশা ছিলেন কিন্তু জামাই ও কন্যা কয়েক বেলা অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকতেন। একদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আট প্রহর পর্যন্ত অনাহারে ছিলেন। কোন স্থানে মজুরির বিনিময়ে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) এক দিরহাম পেয়েছিলেন। তখন রাত হয়ে গেছে। কোন স্থান থেকে এক দিরহামের যব কিনে বাড়ী পৌঁছলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) হাসি-খুশীভাবে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর নিকট থেকে যব নিয়ে পিষলেন। রুটি বানালেন এবং আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সামনে তা রাখলেন। তাঁর খাওয়ার পর তিনি খেতে বসলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, সে সময় আমার রসূল ﷺ -এর এই কথা স্মরণে এলো যে, "ফাতিমা দুনিয়ার সর্বোত্তম নারী"।

এটা ছিল সেই যুগ যখন প্রতিদিন ইসলাম বিজয় ছড়িয়ে পড়ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় অধিক পরিমাণে গনিমতের মাল আসা শুরু হয়েছিল। একদিন আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) জানতে পেলেন যে, গনিমতের মালে কিছু দাসীও এসেছে। তিনি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বললেন, "ফাতিমা! যাঁতা পিষতে পিষতে তোমার হাতে ফোস্কা এবং চুলা জ্বালাতে জ্বালাতে তোমার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। রসূল ﷺ নিকট আজ গনিমতের মালের মধ্যে অনেক দাসী এসেছে। রসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে একটি দাসী চেয়ে নিয়ে এসো।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) নাবী কারীম ﷺ এর নিকট গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ দিয়ে কিছু চাইতে পারলেন না। কিছুক্ষণ রসূল ﷺ এর কাছে অবস্থান করে ফিরে এলেন এবং আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে বললেন যে, রসূল ﷺ -এর নিকট কোন দাসী চাওয়ার সাহস তাঁর হয়নি। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রসূল ﷺ নিকট গিয়ে হাজির হয়ে কাজের কষ্টের কথা উল্লেখ করে একটি দাসী প্রাপ্তির আবেদন জানালেন।

রসূলে কারীম ﷺ বললেন ঃ "আমি কোন কয়েদীকে তোমাদের খিদমতের জন্য দিতে পারি না"।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চুপচাপ ঘরে ফিরে গেলেন। ইব্নে সা'দ (রহ.) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন, রাতে নাবী ﷺ তাঁদের নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমারা যে বস্তুর অভিলাষী ছিলে তা থেকে উত্তম একটি বস্তু আমি তোমাদেরকে বলছি। প্রত্যেক সলাতের পরে এবং শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে নিও। এই আমল তোমাদের জন্য অতি উত্তম খাদেম হিসেবে পরিগণিত হবে।

একবার রসূলে কারীম ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র গৃহে গিয়ে দেখলেন যে, ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) উটের চামড়ার পোশাক পরে আছেন এবং তাতেও ১৩টি পট্টি মারা। তিনি আটা পিষছেন এবং মুখ দিয়ে আল্লাহর কালাম উচ্চারণ করে চলেছেন। নাবী ﷺ এই দৃশ্য দেখে বিহবল হয়ে বললেন, "ফাতিমা! সবরের মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট শেষ কর এবং আখিরাতের স্থায়ী খুশীর অপেক্ষা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে নেক পুরস্কার দেবেন।"

আবু যর গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, একবার নাবী ﷺ আমাকে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। আমি যখন তাঁর গৃহে পৌছলাম তখন দেখলাম যে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে কোলে নিয়ে যাঁতা পিষছেন।

বাস্তবত ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) প্রায়ই দু' বেলা অভুক্ত থাকতেন এবং সন্তানদের কোলে নিয়ে যাঁতা পিষতেন।

একবার ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) মসজিদে নববীতে আসলেন এবং রুটির একটি অংশ প্রিয় নাবী ﷺ -কে দিলেন। নাবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "এই রুটি কোথেকে এলো?" ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "আব্বাজান! সামান্য যব পিষে রুটি বানিয়েছিলাম। যখন বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম তখন খেয়াল এলো যে আপনাকেও কিছু খাইয়ে দিই। হে আল্লাহর রসূল! তৃতীয় বেলা অভুক্ত থাকার পর এই রুটি ভাগ্যে জুটেছে।" নাবী ﷺ রুটি খেলেন এবং বললেন ঃ "হে আমার কন্যা! চার বেলা অভুক্ত থাকার পর এই প্রথম রুটির টুকরা তোমার পিতার মুখে পৌঁছছে।"

একবার নাবী কারীম ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র গৃহে আসলেন দেখলেন যে, দরজায় রঙ্গীন পর্দা ঝুলছে এবং ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র হাতে দু'টো রূপোর চুরি। এদেখে তিনি ফিরে এলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) খুব মর্মাহত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ইত্যবসরে রসূল ﷺ -এর গোলাম আবু রাফে (রাদিআল্লাহু আনহা) এসে উপস্থিত হলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, নাবী ﷺ চুরি ও পর্দা পছন্দ করেননি। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) তৎক্ষণাৎ উভয় বস্তুকেই রসূল ﷺ কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তিনি এসব আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছেন। নাবী ﷺ খুব খুশী হলেন। নিজের কন্যার কল্যাণ ও বরকত কামনা করে দু'আ করলেন এবং তা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বীনের কাজে ব্যয় করে দিলেন।

একবার আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) ঘরে ফিরে কিছু খাবার চাইলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "অভুক্ত অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন চলছে। যবের একটি দানাও ঘরে নেই।" আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "হে ফাতিমা, আমাকে তুমি বলনি কেন?"

একবার দ্বিপ্রহরের সময় রসূলে কারীম ﷺ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং ওমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সাথে দেখা হলো। তাঁরাও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনজন আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বাগানে পৌঁছলেন। তিনি খেজুরের খোসা ছাড়িয়ে তাঁদের সামনে রাখলেন। এরপর একটি বকরী জবেহ করে তার গোশ্ত দিয়ে কাবাব এবং তরকারি পাকালেন। দস্তরখান বিছানো হলো। এ সময় নাবী ﷺ একটি রুটির উপর সামান্য গোশ্ত রেখে তা ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র নিকট প্রেরণের কথা বললেন। তিনি জানালেন যে, ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) কয়েকদিন অভুক্ত রয়েছে।

একবার বনু সলিম গোত্রের এক দুর্বল বৃদ্ধ মুসলিম হলেন। নাবী ﷺ তাঁকে দ্বীনের জরুরী আহকাম ও মাসায়েল বর্ণনা করলেন অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি কোন মাল আছে? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! বনি সলিমের তিন হাজার মানুষের মধ্যে আমিই সবচেয়ে গরীব ও ফকীর।" নাবী ﷺ সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে এই মিসকিনকে সাহায্য করবে?"

সায়াদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন উবাদাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমার একটি উটনী আছে। আমি তাঁকে তা দিচ্ছি।" নাবী ﷺ এরপর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছ যে, তার মাথা ঢেকে দেবে?"

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পাগড়ী খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন।

অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ "কে আছে যে তার খাবারের বন্দোবস্ত করবে?"

সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) সেই বৃদ্ধ আরাবীকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য বেরুলেন। কয়েকটি গৃহে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। অতঃপর ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র বাড়ীতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, "কে"? তিনি সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আশা প্রকাশ করে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কন্যা! এই মিসকিনের খাবারের বন্দোবস্ত করুন।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হে সালমান! আল্লাহর কসম। আজ আমরা তৃতীয় দিনের মত অভুক্ত রয়েছি। শিশু দু'টি ভূখা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। কিন্তু সায়েলকে খালি হাতে ফিরে যেতে দেবো না। আমার এই চাদর শামউন ইহুদীর নিকট নিয়ে যাও এবং বলো ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ -এর এই চাদর রেখে গরীব মানুষটিকে কিছু দাও।"

সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) আরাবীকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীর নিকট গেলেন এবং তাঁকে সকল বৃত্তান্ত বললেন। বৃত্তান্ত শুনে তিনি হয়রান হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, "হে সালমান! আল্লাহর কসম, এরা তাঁরা যাঁদের ব্যাপারে তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পিতার উপর ঈমান এনেছি।" এরপর কিছু খাদ্য সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে দিলেন এবং চাদরও ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) স্বহস্তে আনাজ পিষলেন এবং তাড়াতাড়ি আরাবীর জন্য রুটি বানিয়ে সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে দিলেন। তিনি বললেন, "এ থেকে বাচ্চাদের জন্য কিছু রেখে দিন।" ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) জবাব দিলেন, "সালমান! যা আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার বাচ্চাদের জন্য জায়িয নয়।"

সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) রুটি নিয়ে রসূল ﷺ কাছে হাজির হলেন। নাবী ﷺ সেই রুটি আরাবীকে দিলেন এবং ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র গৃহে গেলেন। তাঁর মাথায় নিজের স্নেহের হাত বুলালেন, আকাশের দিকে তাকালেন এবং দু'আ করলেনঃ "হে আমার আল্লাহ! ফাতিমা তোমার দাসী। তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো।"

একবার জনৈক ব্যক্তি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ উটের যাকাত কী হবে? ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "তোমার জন্য শুধু এক উট। আমার নিকট যদি চল্লিশটি উট থাকে তাহলে আমি সবই আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেব।"

ওহুদের যুদ্ধে প্রিয় নাবী ﷺ মারাত্মক আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের খবর রটে গিয়েছিল। মদীনায় এই খবর পৌছলে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) অন্যান্য নারীদের সঙ্গে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওহুদের ময়দানে পৌছলেন। নাবী ﷺ -কে জীবিত দেখে স্বস্তি পেলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতার অবস্থা দেখে অত্যন্ত

দুঃখিত হলেন। রসূল ﷺ -এর ক্ষত স্থানসমূহ বার বার ধৌত করতে লাগলেন। তবে, কপালের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে খেজুরের চাটাই জ্বালিয়ে ক্ষতের মধ্যে দেয়ায় রক্ত বেরুনো বন্ধ হলো।

একবার ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নাবী কারীম ﷺ সাহাবী ইমরান (রাদিআল্লাহু আনহু) বিন হাছিনকে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে সেবা শুশ্রুষার জন্য গেলেন। বাড়ীর দরজায় দিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "আসুন"। নাবী ﷺ বললেন, আমার সঙ্গে ইমরান বিন হাছিনও রয়েছেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) জবাব দিলেন ঃ "আব্বাজান! এক টুকরা ছাড়া পর্দা করার মত দ্বিতীয় কোন কাপড় আমার নিকট নেই।" নাবী ﷺ নিজের চাদর ভেতরে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ "মা! এদিয়ে পর্দা করো।"

এরপর নাবী ﷺ এবং ইমরান (রাদিআল্লাহু আনহু) ভেতরে গেলেন এবং তাঁকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "আব্বাজান! কঠিন ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি এবং ক্ষুধায় কাতর করে রেখেছে। কেননা ঘরে খাবার কিছুই নেই।"

নাবী ﷺ বললেন ঃ "হে আমার কন্যা! ধৈর্য ধর। আমিও আজ তিনদিন ধরে না খেয়ে রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি যাই চাই তা তিনি আমাকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি আখিরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি।"

অতঃপর তিনি ﷺ নিজের স্নেহমাখা হাত ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পিঠের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ "হে কলিজার টুকরা! দুনিয়ার মুসিবতে মন ভেঙ্গো না। তুমি জান্নাতের নারীদের নেত্রী।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) এই দারিদ্র ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পূর্ণ ইবাদতকারী ছিলেন। হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি আমার আম্মাকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত করতে এবং আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করতে দেখেছি। কিন্তু তিনি কখনো দু'আতে নিজের জন্য কোন কিছুর আবেদন জানাননি।

একবার ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ থেকেও সারা রাত ইবাদতে কাটালেন। সকালে আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) যখন সলাতের জন্য মসজিদে গেলেন, তখন তিনি সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সলাত শেষ করে যাঁতা পিষতে লাগলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিরে এসে তাঁকে যাঁতা পিষতে দেখে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূলের কন্যা! এতো পরিশ্রম কর না। কিছুক্ষণ আরাম কর। নচেত অসুখ বেশী হয়ে যেতে পারে।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহর ইবাদত এবং আপনার আনুগত্য অসুখের সর্বোত্তম চিকিৎসা। এরমধ্যে যদি কোনটি মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তারচেয়ে বেশী আমার জন্য আর সৌভাগ্যের কী হতে পারে।"

একবার নাবী ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "প্রিয় কন্যা! (মুসলিম) নারীর কী কী গুণ রয়েছে?"

তিনি বললেন ঃ "আব্বাজান! নারীদের উচিত আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ -এর আনুগত্য করা, সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হওয়া, নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজের রূপ গোপন রাখা, নিজে অপরকে না দেখা এবং অন্যও যাতে দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা।" নাবী ﷺ এই জবাব শুনে খুব খুশী হলেন।

প্রিয় নাবী ﷺ ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে সীমাহীন ভালোবাসতেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) আবু জাহিল কন্যা গোরাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) খুব দুঃখিত হলেন। রসূলে কারীম ﷺ তাঁর নিকট আসলেন তখন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) আমার উপর সতীন আনতে চায়।" এ কথা শুনে রসূল ﷺ -এর অন্তরে খুব আঘাত লাগলো। এদিকে গোরার অভিভাবকও রসূল ﷺ -এর নিকট এই বিয়ের অনুমতি নিতে এলো। নাবী ﷺ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"হিশামের বংশধররা আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে নিজের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না। অবশ্য আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দেয়। যে তাকে দুঃখ দেয় সে আমাকে দুঃখ দেয়। আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাই না। কিন্তু

আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা উভয়ে এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না।"

রসূল ﷺ -এর এই ভাষণের এমন প্রভাব হলো যে, আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) তৎক্ষণাৎ বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন এবং ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় অতঃপর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার চিন্তা আর অন্তরে কখনো আনেননি।

নাবী ﷺ নিজের কন্যাকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি নিজের জামাইদেরকেও সীমাহীন স্নেহ করতেন। তাঁদেরকে বলতেন ঃ "যাদের প্রতি তুমি নারাজ হয়ে গেছ, তাদের প্রতি আমিও অসন্তুষ্ট হবো। যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ, আমারও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ। যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি রয়েছে তাদের সঙ্গে আমারও সন্ধি রয়েছে।"

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে বলতেন ঃ "হে আলী! তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই।"

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র পুত্র হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে নাবী ﷺ নিজের কলিজার টুকরা মনে করতেন। অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে তাঁদেরকে আদর দিতেন এবং নিজের কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে বেড়াতেন।

প্রিয় নাবী ﷺ -এর ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) খবর নেয়ার জন্য আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ঘরে গেলেন। নাবী ﷺ অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন এবং কানে আস্তে আস্তে কিছু বললেন। এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নাবী ﷺ অন্য কোন কথা তাঁর কানে কানে বললেন। এ কথা শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। যখন তিনি ফিরে চললেন তখন আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ফাতিমা! তোমার কাঁদা এবং হাসার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে?" ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "যে কথা নাবী ﷺ গোপন রেখেছেন, আমি তা প্রকাশ করবো না।"

রসূলে কারীম ﷺ -এর বিদায়ের পর একদিন আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহু আনহা) ফাতিমা

(রাদিআল্লাহু আনহা)-কে সেই দিনের ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাইলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন ঃ "প্রথমবার নাবী ﷺ বলেছিলেন যে, প্রথমে জিবরীল আমীন (আলাইহিস সালাম) বছরে সব সময় একবার কুরআন মজিদ পাঠ করতেন। এই বছর নিয়ম ভঙ্গ করে দু'বার পাঠ করেছেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটে এসে গেছে।" এতে আমি কাঁদতে লাগলাম।

অতঃপর নাবী ﷺ বলেছিলেন ঃ "আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবে।" এ কথায় আমি খুব খুশী হলাম এবং হাসতে লাগলাম।

ইন্তিকালের পূর্বে রসূলে কারীম ﷺ যখন বার বার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন তখন ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র অন্তর টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, হায়! "আমার পিতার অশান্তি!"

নাবী ﷺ বলেছিলেন, "আজকের পর তোমার পিতা আর অশান্তিতে ভুগবেন না।"

প্রিয় নাবী ﷺ এর ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র উপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি বলে উঠলেন ঃ "প্রিয় পিতা ﷺ হকের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল হয়েছেন। আহ! জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর ইন্তিকালের খবর কে পৌঁছাতে পারে।"

এরপর দু'আ করলেন ঃ "ইলাহী আমার! ফাতিমার অন্তরকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর অন্তরের নিকট পৌঁছে দিন। হে আল্লাহ আমার! আমাকে রসূলে কারীম ﷺ -এর দীদার লাভ করিয়ে খুশী করে দিন। ইলাহী! হাশরের দিন মুহাম্মাদ ﷺ -এর শাফায়াত থেকে নিরাশ করো না।"

নাবী কারীম ﷺ -এর দাফনের পর সাহাবা (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও নারী সাহাবীরা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) শোক প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট এসেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন মতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। সকল স্কলাররাই এ ব্যাপারে একমত যে, রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের পর কেউ-ই ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে আর হাসতে দেখেননি।

রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তাঁর মিরাসের মাসয়ালা উত্থাপিত হলো। ফিদক নামক একটি মৌজা ছিল। নাবী ﷺ কতিপয় লোককে এই শর্তে তা দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক তারা রাখবে এবং বাকী অর্ধেক রসূল ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দেবে। নাবী ﷺ নিজের অংশ থেকে কিছু নিজের পরিবার-পরিজনের খরচের জন্য রাখতেন এবং অবশিষ্ট মুসাফির ও মিসকিনদের জন্য ব্যয় করতেন। কতিপয় ব্যক্তি ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে বললো, ফিদক নাবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি ছিল এবং আপনি তার ওয়ারিস। বস্তুত তিনি প্রথম খলিফা আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু)-র নিকট ফিদকের ওয়ারাসাতের দাবী জানালেন।

আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন ঃ "হে ফাতিমা! আমি রসূল ﷺ -এর নিকটাত্মীয়দেরকে আমার নিকটাত্মীয় থেকে বেশী ভালোবাসি। কিন্তু মুশকিল হলো নাবী (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর সময় যে সম্পদ রেখে যান তার সম্পূর্ণটাই সদাকা হয়ে যায় এবং তাতে ওয়ারাসাত জারি হয় না। এজন্য আমি সেই সম্পদ ভাগ করতে পারি না। অবশ্য রসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় আহলে বাইত তা থেকে যে উপকার নিতেন তা এখনো নিতে পারেন।"

এই জবাবে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) খুব দুঃখিত হলেন এবং তিনি আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু)-র উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি আজীবন তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আবুবকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) শুশ্রুষার জন্য উপস্থিত হলেন। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) তাঁকে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং এভাবে মনের দুঃখ দূর করেন।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীসকারদের মধ্যে রয়েছেন আলী, হাসান, হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহুম) এছাড়া আয়িশা সিদ্দিকাহ এবং উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহু আনহুমা)।

ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু), হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু), মুহসিন (রাদিআল্লাহু আনহু), উম্মে কুলছুম (রাদিআল্লাহু আনহা), রোকেয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) ও

যায়নাব (রাদিআল্লাহু আনহা)। মুহসিন (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং রোকেয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) শৈশবকালেই মারা যান।

হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু), হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং উম্মে কুলছুম (রাদিআল্লাহু আনহা) নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রসূল ﷺ -এর বংশধারা ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে দিয়েই অব্যাহত ছিল।

রসূলে কারীম ﷺ -এর বিচ্ছিন্নতামূলক দুঃখ সবচেয়ে বেশী বেজেছিল ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র অন্তরে। তিনি সব সময় দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। তাঁর অন্তর ভেঙ্গে গিয়েছিল। রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের ৬ মাস পরই ১১ হিজরীর রমাদান মাসে ২৯ বছর বয়সে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিনতে উমাইসকে ডেকে বলেছিলেন ঃ "আমার জানাযা দেয়ার সময় এবং দাফনের সময় পর্দার পুরো ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আপনি ও আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে গোসলের ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যাবে না। দাফনের সময় বেশী ভিড় হতে দেয়া যাবে না।"

আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, "হে রসূলের কন্যা! হাবশায় জানাযার উপর গাছের ডাল বেঁধে ডুলি আকৃতির বানানো হয় এবং তার উপর পর্দা দিয়ে দেয়া হয়।" অতঃপর তিনি খেজুরের কয়েকটি ডাল আনালেন এবং তা জোড়া দিলেন। অতঃপর তার উপর কাপড় টাঙিয়ে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে দেখালেন। তিনি তা পছন্দ করলেন। বস্তুত মৃত্যুর পর তাঁর জানাযা ঐভাবেই করা হলো। জানাযায় খুব কম সংখ্যক লোকেরই অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র ইন্তিকাল রাতে হয়েছিল এবং ওছিয়ত অনুযায়ী আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) রাতেই দাফন করেছিলেন। আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) জানাযা পড়ান এবং আলী, আব্বাস এবং ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁর লাশ কবরে নামান।

REFERENCES

- সহীহ বুখারী - তাওহীদ পাবলিকেশনস
- সহীহ মুসলিম - তাওহীদ পাবলিকেশনস
- ফাতওয়া - বিন বায (ইমাম - মসজিদুল হারাম)
- ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম - শায়েখ মুহম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.)
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম - শাইখ আব্দুর রাজ্জাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর
- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায - শায়েখ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
- আদর্শ নারী - শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ
- মুসলিম নারীর পর্দা - আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
- মুসলিম নারীর অধিকার ও দায়িত্ব ইসলামের ইশতিহার ও সনদ - ফায়সাল বিন খালেদ
- মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য - অধ্যাপক ড. ফালেহ ইবন মুহাম্মদ আস-সুগাইর
- পর্দার গুরুত্ব - খন্দকার আবুল খায়ের
- প্রিয় বোন পর্দা কি কেন পর্দা কর না? - শাইখ ডঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল
- নারীদের হিজাব কেন - আবু তাহের মুহাম্মদ শফিউদ্দীন
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয় - আধুনিক প্রকাশনী
- নারীর ভূষণ - মাহবুবা বেগম
- মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য - খাদিজা আখতার রেজায়ী
- পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন - শামসুন্নাহার
- পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় - সাইয়েদা পারভীন রেজভী
- মুসলিম বোন ও পর্দার হুকুম - মাওলানা মুহাম্মদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ
- ফতোয়া - ডঃ ইউসুফ আল কারজাভী
- ইসলামের জীবন-পদ্ধতি - আধুনিক প্রকাশনী
- পর্দা ও ইসলাম - আধুনিক প্রকাশনী
- পরিবার ও পারিবারিক জীবন - মাওলানা আব্দুর রহীম
- ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব - মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ।
- পুরুষ ও নারীদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র - এ. কে. এম. নাজির আহমদ
- মহিলা সাহাবী - তালেবুল হাসেমী
- লেকচার - শায়েখ নুমান আলী খান (আমেরিকা)
- www.islamhouse.com
- Women Rights - Dr. Zakir Naik Lecture
- Questions & Answers for the Muslim Women – Ibrahim M . Kunna, Darussalam Publications
- Selected Fatwa for Womwn – Muhammed bin Abdul-Aziz Al-Musnad, Darussalam Publications
- Rulings Pertaining to Muslim Women – Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, Darussalam Publicaitons

পারিবারিক গিফ্‌ট

আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই সেখানে সাধারণত দই-মিষ্টি, ক্রোকারিজ, শোপিস বা অন্য কোন গিফ্‌ট সামগ্রী নিয়ে যাই উপহার হিসেবে। যা একটি পরিবারের পারিবারিক ডেভেলপমেন্টে কোন ভূমিকা রাখে না। আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে এই উপহারের ধরণ একটু পরিবর্তন করলে আমরা উভয় পক্ষই অসীম উপকৃত হতে পারি? তাই আমরা যখন কোন পারিবারিক দাওয়াতে যাই তখন এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই সুন্দর র‍্যাপিং করে একটি সুন্দর গিফ্‌ট ব্যাগে গিফ্‌ট হিসেবে উপহার দিতে পারি। এতে দাওয়াত খাওয়াও হলো এবং ঐ পরিবারটিকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতও দেয়া হলো। এতে আল্লাহর রহমত নিহিত থাকবে দু'পক্ষের জন্যেই।

আত্মীয়-স্বজনদেরকে এই গিফ্‌ট দেয়ার উপযুক্ত সময় হচ্ছে রমাদান মাস। দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী উদ্দেশ্যে সকল আত্মীয়-স্বজনের একটি লিষ্ট করে ঈদ গিফ্‌ট হিসেবে সবাইকে একসেট বই উপহার দিতে পারি। আমাদেরকে ঠিকানা দিলে আমরাও ঐসকল ঠিকানায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই গিফ্‌ট ব্যাগ গ্রিটিংস কার্ডসহ পৌঁছে দিতে পারি।